সান্নিধ্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র



ত্রিবেণী প্রকাশন
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৬৬

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
চিন্তামণি কর

ব্লক
সিগনেট ফটোটাইপ

ব্লক মুদ্রণ
স্কোয়ার প্রিন্টার্স

বাঁধাই
ইণ্ডিয়ান বুক বাইণ্ডিং এজেন্সি

দাম : চার টাকা

ভূমিকা

সান্নিধ্যের ভূমিকা করা মুস্কিল কারণ এর সবটাই প্রায় একটা ক্রমোত্তর ভূমিকার মত। এরই দু' একটা কাহিনী মাঝে মাঝে কথায় কথায় যখনই যাকে বলেছি শ্রোতার কাছ থেকে অনুরোধ এসেছে সেগুলিকে লিখে ছাপানোর জন্য। সান্নিধ্যের কযেকজনকে ছাপার হরেফে পরিচয় দিলাম লেখকের দাবী নিযে নয় কাজেই যদি অনধিকার চর্চা করে থাকি তো সুধী সাহিত্যিকদের কাছে মাপ চেয়ে রাখছি।

বইখানা নানা টুকরো লেখায "সমকালীন" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এবং সমকালীনের সম্পাদক শ্রীআনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে লেখা সংগ্রহ না করলে সান্নিধ্যের আত্মপ্রকাশ ঘটত কিনা সন্দেহ। শ্রীমান আনন্দকে তার অসীম ধৈর্যের জন্যে ধন্যবাদ জানিযে লাভ কি, কারণ এ ভূতের বোঝা সে স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় চাপিয়েছে তার মাষ্টার মশাই-এর প্রতি ভালবাসায়। শ্রীকানাইলাল সরকার মহাশয় বইখানা লেখা অর্ধেক শেষ না হতেই ছাপানোর জন্য চেয়ে রেখেছিলেন এখন এর প্রকাশক হযে আশা করি দুর্বিপাকে পড়বেন না। পাঠক সান্নিধ্যের লোকজনদের সঙ্গে পরিচয় করে খুশী হলেই আমার কালি ও কলমের মেহনত সার্থক হবে।

কলিকাতা ১৩৬৬   চিন্তামণি কর

উৎসর্গ

সান্নিধ্যের নায়ক ও নায়িকাদের

স্মরণে

আমার লণ্ডনের স্ট্ডিয়োর দেওয়ালে লাগানো ছিল অনেক বছর ধরে একটি পোর্সেলিনের পুরনো চীনা-প্লেট। একদিন সেটার ধুলো ঝাড়তে গিয়ে অসাবধানে ঘা লেগে পেরেক খুলে প্লেটটা পড়ল মাটিতে, আর ভেঙে হল শত খণ্ড।

সেটা তো গেল কিন্তু রইল দেওয়ালে যেখানে সেটা লাগান ছিল, একটা আবছা গোল দাগ।

আমার অবর্তমানে তা আর বোধ হয় নেই। নতুন মালিকের দেওয়া ডিস্টেম্পারে গিয়েছে হয়তো ঢাকা পড়ে—মুছে হয়েছে নিশ্চিহ্ন। যতদিন দেওয়ালের গায়ে সে দাগটিকে দেখা যেত, মনে করিয়ে দিত হারানো জিনিসটির স্মৃতি।

কেবল ফ্যাকাশে একখানা গোল ছাপ, যার ওপর চোখ বুলিয়ে দেখতে পেতাম, চলে-যাওয়া সেই নক্শাদার পুরনো চীনা প্লেট— গোলাপী, নীল, সবুজ আর হাল্কা হল্দে ফুলপাতা, ঝক্ঝকে সাদা গোলের ওপর লুটোপুটি খাচ্ছে।

ওই ছোট স্থানটুকুর মধ্যে সে করে নিয়েছিল দেওয়ালের সঙ্গে পরম সান্নিধ্য।

তারা ছিল পাশাপাশি—গায়ে গায়ে অথচ হারিয়ে যায় নি একে অন্যতে। তাদের মধ্যে মিল ছিল, কিন্তু তারা মিশে যায় নি, আর সেই সান্নিধ্যের স্মারক হচ্ছে ওই ছাপটুকু—দেওয়ালের সব জায়গার রঙের চেয়ে একটু ফিকে সে—জল থেকে ঠিক্‌রে-পড়া আলোর মত জ্বলজ্বল করছে।

জীবনের দেওয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলে এমনি কত ছাপ—কেউবা স্পষ্ট, কেউবা আবছা—মূর্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে কত চলে-যাওয়া স্মৃতি, কিছুটা রঙে কিছুটা নক্শায়—কতগুলি হাইলাইটে ও কতগুলি শ্যাডোয়।

আতলিয়ে

ঝঁz্র ঝঁz্র।

সকাল ন'টা থেকে সওয়া ন'টা পর্যন্ত আতলিয়ে[1] ওই শব্দে সরগরম। ম্যাসিয়ের[2] স্টোভে লাগিয়েছে গন্‌গনে আগুন। সারা রাত্তিরের জমা ঠাণ্ডা, তাপের ঠেলা খেয়ে কোণে কোণে থেমে যাবে কি না যাবে ইতস্তত করছে।

কোট খুলে ওভারঅল পরবার সময় মুহূর্তের সুযোগে আগন্তুকের স্বল্প উন্মুক্ত শরীরে প্রস্থানোন্মুখ ঠাণ্ডা লাগায় দু একটা আচমকা খোঁচা।

থ্রোনের ওপর নগ্না মডেল, স্টোভের কাছে দাঁড়ানো থাকলেও তার গায়ে হংসচর্মবৎ গুটির বিস্তার দেখে বোঝা যায়, সেও এই প্রায়-বিতাড়িত ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পায় নি।

বাইরের ইয়ার্ডেতে চৌবাচ্চায় রাখা ভিজে মাটি জমে কালো বরফ হয়ে গেছে। হাত-কোদাল দিয়ে তারই কয়েক তাল প্রত্যেকে নিয়ে আসছে।

খানিক পরে আতলিয়েটা হয়ে যায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সেই নীরবতা ভাঙে, মডেল-থ্রোন ঘুরিয়ে দেবার শব্দে।

একঘণ্টা পরে ম্যাসিয়ের বলে "রোপ্যো"।[3] স্পন্দনহীনা মডেল, যে এতক্ষণ যেন যাদুতে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ম্যাসিয়েরের ওই মন্ত্রবাক্যে মায়াজাল ভাঙায় সে যেন ফিরে পেল তার নড়বার শক্তি। উঁচু করলো সে হাত দুখানা। হাত না হয়ে পাখা হলে মনে হতো সে যেন ডানা মেলে উড়ে যাবার প্রয়াসী। ঘাড়ের একদিকে মাথাটা হেলিয়ে তুলল একটা হাই। হাতের আড়াল দিয়ে হাই ঢাকবার ভান পর্যন্ত করল না। তারপর ধীরে তুলল একটি পা, নামালো অতি সন্তর্পণে থ্রোন থেকে। পাশে চেয়ারে রাখা একটি ঝোলা গাত্রাবাস উঠিয়ে ঢেকে নিল নগ্ন শরীরের খানিকটা।

১। আর্টিস্টের কর্মশালা ২। যেখানে ছাত্ররা কাজ করে তাদের তদারককারী।
৩। বিরাম।

একটু আগে সে ছিল রূপরাজ্যের সিংহাসন-আসীনা দেবী, যার আদল নিয়ে এতগুলি পিগ্‌মেলিয়ান গড়ছিল তাদের গ্যালাতিয়া।

ম্যাসিয়েরের ওই "রোপ্যো" শব্দেই সে পরিণত হল সাধারণ নগ্না নারীতে—তার এল লজ্জা, সে হয়ে গেল ঈভ্‌ আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকল তার উন্মুক্ত বক্ষ ও জঘন।

চেয়ারের উপরে রাখা কাপড়-স্তূপে হাত ডুবিয়ে বার করল একটি শাঁসালো অ্যাপেল। এক মুহূর্তে চলল লালাসক্ত জিহ্বা, দন্ত আর অ্যাপেলের কষাকষি।

যে সব নরনারীর দল এতক্ষণ নিবিষ্টমনে নীরবে গড়ছিল মূর্তি তারা হয়ে উঠল মুখর। আওয়াজে ভরে গেল সমস্ত আতলিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে জমিয়ে দিল কুয়াশা। চলল পরস্পরের মূর্তি নিরীক্ষণ, বিচার ও মীমাংসা। শোনা গেল শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য ও ভাস্কর-রথাদের নাম—আরকায়ক গ্রাক, এক্রুকান, বেনিন্‌; দোনাতেল্লো, ঘিবার্তী, রোদ্যাঁ, বুর্দেল, ব্রাঙ্কুসী এবং আরও কত কী।

পনেরো মিনিট যেতেই ম্যাসিয়ের বলল, "রোকমাসে সিল্‌ ভু প্লে"[১] আবার এসে গেল সেই নিস্তব্ধতা, প্রত্যেকে রত হল তাদের গ্যালাতিয়ার গঠনে।

ঈভ্‌ ফেলে দিল তার লজ্জাবসন—নগ্নারূপদেবী আরোহণ করলেন তাঁর বেদীতে।

একই মানুষ, একই চোখ, একই নগ্না নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখে বিভিন্ন ভাবে।

থ্রোনের ওপর দণ্ডায়মানা উলঙ্গ দেহের ওপর ওঠা-নামা করে চলেছে তাদের দৃষ্টি কিন্তু সে দৃষ্টি থেমে যায় না কোন স্থানে কামনার ভিড় দেখে।

নিস্পৃহ নিষ্কাম রূপ-তাপসের দৃষ্টি সে, কেবল দেখছে আর গড়ছে।

বারোটা বাজল। ম্যাসিয়ের আবার বলল, "রোপ্যো—ইল এ মিদি।"

১। আবার আরম্ভ কর।

দেবী পুনরায় হলেন ঈভ এবং ঈভ্ হল সাধারণ নারী। ঢিলে গাউনের আব্রু করে সে একে একে পরল ব্রাZিয়ের, স্লিপ প্যান্ট, ব্লাউZ, সাসপেণ্ডার, স্টকিং, স্কার্ট ও জুতো।

প্রত্যেকটি পরিধেয় তার সম্পর্কিত অঙ্গ ও তার ক্রিয়ার ইশারা যেন ব্যাখ্যা হতে লাগল তার গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

চিরুনি পড়ে চুল হল সুবিন্যস্ত, গালে চড়ল রঙ, ঠোঁটে পড়ল কৃত্রিম রক্তিমা ও চোখে টেনে দিল সুর্মা। কে এল, তার এক ছেলে বন্ধু। পরস্পরের বাহুতে বাহুবদ্ধ করে তারা চলে গেল। যাবার আগে সবাইকে বলে গেল "অরভোয়ার, আদেম্যা"।[৪]

দ্বার প্রান্তে অপেক্ষমান বা অপেক্ষমানা বন্ধু বা বান্ধবী, যে যার সঙ্গী নিয়ে উধাও হল কাফেতে নয় রোস্তরাঁয়। কারা বা গেল লুক্সাঁবুর্ উদ্যানে এবং বেঞ্চে বসে খেতে লাগল স্যাণ্ডুইচ্।

ছুটোর পর থেকে ফের শুরু হবে কাজ, আসবে এক মডেল। সকালে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ না কেউ হয়ত থাকবে কিন্তু আতলিয়ে চলবে সকালের মতই সেই একভাবে।

দারিদ্র্যেরও কৌলিন্য আছে।

যে সবচেয়ে গরীব, তার স্থান স্যাণ্ডুইচ্-খাওয়া-শ্রেণীরও নীচে। শুধু শুক্নো রুটি আর তাকে গলাধঃকরণ করতে যে রসনা-রসের প্রয়োজন তার উপায়ের চেষ্টা করে সে মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো চীZ কামড় দিয়ে।

এই ধরনের লাঞ্চ বা ডিনারের পরে এক কাপ কফি খেতেও তাকে করতে হয় হিসেব, কারণ এও মাঝে মাঝে হয়ে যায় শৌখিন খরচ।

বাগানের এক নিভৃত কোণে বসে সে ভাবে, অতুল ঐশ্বর্যে শোনা যায় অনেকে থাকে অসুখী, সেইজন্যে এই অসীম গরিবানায় তার হওয়া উচিত পরম আনন্দ।

৪। বিদায়, কাল দেখা হবে।

আতলিয়েতে কেউ যদি আসে পরিচিত হতে, সে তখনি তাকে করে নিরস্ত। ভয় হয় যদি এই পরিচয়ের সঙ্গে হয় কাফেতে নিমন্ত্রণ। ভদ্রতার খাতিরে, সে নিমন্ত্রণের প্রতি-নিমন্ত্রণ দেবার ক্ষমতা তার নেই। চায় না সে পরিচয়—চায় না সঙ্গী—বন্ধু বা বান্ধবী। একলা সে—স্বেচ্ছায় নয়, ঘটনাচক্রে।

গ্যগাঁ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণ ভাবে লোকের ধারণা যে, অন্তিম দারিদ্র্য দেয় শিল্পীকে মহাশিল্পের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু তারা ক'জন জানে যে দারিদ্র্যের অন্তিম পারে পা দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হয়ে যায় ঘোলা; আত্মাটাও ডুবে যায় অতল কালিমায়।

আতলিয়েতে সকলের পরিচিত আসল নামকে বিকৃত করে, ব্যঙ্গ নামকরণ করার একটা বাতিক ছিল অনেকের। একজন হোয়াইট রাশিয়ান ইহুদী, যার নাম ছিল পিটকিন্, সে ইংরেজী-বলা লোকেদের মহলে হয়ে গেল পিগ্স্কিন্। ইংরেজ মহিলা মাদাম মিউভিল, হলেন 'মাদাম্ মুভেz'।

যাদের নাম উচ্চারণে জিভের আড় ভাঙতে কষ্ট হতো, তারা তাদের দেশের নামেই খ্যাত হল।

আমাদের ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্ পোলাণ্ডের লোক বলে অভিহিত হল 'পোলনে' এবং সুইডিস ডাগারম্যান হয়ে গেল মঁসিয়ে সুইদোয়া।

আমি পেলাম খেতাবী নাম বুদা-সিলাঁসিউ—নির্বাক-বুদ্ধ। আমি ছাড়া আতলিয়েতে ছিল আরও একজন নির্বাক, যে চাইত না কারোর পরিচয় বা বন্ধুত্ব। আড়ালে সকলে তাকে বলত মুখ-বোজা-মার্থ।

আতলিয়েতে প্রায় সব ছেলেরা চেষ্টা করেছে মার্থের সঙ্গে মাখামাখির কিন্তু তার তর্জন ও তাচ্ছিল্যে হার মেনে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

তাকে যে সত্যি কেউ ভালবাসতে চেয়েছে, তা নয়। তাদের

সকলের প্রয়াস ছিল তাকে জয় করবার। তারা তার পিছু নিয়ে দেখেছে, তার কোন ছেলে বন্ধু আছে কি না। সে লেস্‌বিয়ান কি না, তাও আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণায়, মেয়েরা যদি ছেলেদের সাথে প্রেম না করে, তাহলে তাদের প্রণয় হবে মেয়েদের সঙ্গে। এ-দুয়ের একটি হওয়া চাই।

কিন্তু যখন তারা জানল যে মার্থ তাদের জানা কোন শ্রেণীতেই পড়ছে না তখন তাদের চেষ্টা চলল জানবার, মার্থ মেয়ে হিসাবে শারীরিক পরিপূর্ণ কি না। তাদের কৌতূহলী মন সব ভাবে তলিয়ে মার্থকে জানবার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে এখন হয়েছে নিরুৎসুক ও নিস্পৃহ।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পুকুরধারে দেখতাম জীবন্ত শামুক শুঁড় বার করে চলেছে। দিতুম একটা কাঠির ঘা, অমনি শুঁড়-বার-করা-মুখ উধাও হয়ে গেল, নিমেষে শামুকটা হল অজীব ও অচল। পা দিয়ে ঠেলা দিলাম, গেল সেটা গড়িয়ে। প্রাণের আর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নিস্তব্ধে লক্ষ্য করলাম, আবার বেরিয়ে এল শামুক থেকে খয়ের রঙের জিভ, যার ডগায় রয়েছে উঁচিয়ে দুটো শিং। আবার ধীরে ধীরে মাটির গায়ে লেপ্‌টে চলল সে।

মার্থকে দেখে আমার মনে হতো, সে যেন সেই শামুকের মত হঠাৎ ঘা খেয়ে একটা খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তাকে নাড়া দিলে আরও খোলের গভীরে নিজেকে সে তলিয়ে দেয়।

আমার পাশেই ছিল তার মডেলিং স্ট্যাণ্ড। একবার তাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আর সকলে আমায় দিল তাড়া, "ওর সঙ্গে কথা বলো না হে, কামড়ে দেবে! খেপা কুকুর দেখেছ? ও তার চেয়েও বেশী খেপা। কাজেই ওর ধার সামলে চলো।"

মার্থ এই কটূক্তিতে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চোখের ঘোর-নীল তারা দুটি একবার যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার সে দুটি পাথরের নকল চোখের মত নিরেট ও স্থির হয়ে গেল। সে করে চলল আপন কাজ।

ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ্-এর আর্থিক সঙ্গতি ছিল প্রায় আমার, পিটকিন, ডাগারম্যানের মত কিন্তু উদারতায় সে ছিল সবচেয়ে ধনী।

সে থাকত গত শতাব্দীর কোন ধনীর পাঁচমহলী বাড়ির প্রাঙ্গণ প্রান্তে জুড়িগাড়ির আস্তাবলের একটি কামরায়, যেখানে থাকত আগে ঘোড়ার ঘাস।

সে পাঁচমহলী বাড়ি এখন হোটেলে পরিণত আর আস্তাবলের প্রায় সবটাই ধোপার কাপড়-কাচাইখানা।

সেই আধ-অন্ধকার স্যাঁতসেতে, সিদ্ধকাপড়ের ও সাবানজলের ভ্যাপ্সা গন্ধে ভরা ঘরখানিই ছিল সিত্রিনোভিচের বসবার দালান, শয়ন কক্ষ ও কাজের স্টুডিয়ো এবং সেইখানেই বসে ছুটির দিনে চলতো আমাদের চারজনের শিল্পালাপ ও খোশগল্প।

পোলাণ্ডের ইহুদী সিত্রিনোভিচ ছিল বেঁটে-খাট মানুষটি, যার ছোট চোখ দুটোয় সর্বদা দেখা যেত যেন সদ্যঘুমভাঙা আঁখির জলেভরা চাউনি। তার প্রায় টাকপড়া মাথার পিছনে ছিল শণের মত জলুসহীন এক ঝুঁটি চুল, যা কয়েক বছর আগে হয়তো ছিল লাল্চে রঙের।

প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে কিছুটা অসাধারণের সম্ভাবনা যা যোগাযোগে হঠাৎ উছলে বেরিয়ে আসে, আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রে তার অভিব্যক্তি অঙ্কুরেই লুপ্ত হয়ে যায়।

সিত্রিনোভিচের ভাস্কর্যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যঞ্জনা ছিল। কিন্তু কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে তার ভাস্কর্যের উচ্চ শির অযথা মাথা নামিয়ে জানাতে চাইত না তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও মহত্ত্বের পরিমাপ।

সে ছিল উৎকট কম্যুনিস্ট্।

ডাগারম্যান তাকে ঠাট্টা করে বলত, "তোমার কম্যুনিস্ট হওয়া অত্যন্ত অশোভন, কারণ তাদের উগ্রতা অন্ধবিশ্বাস ও হিংস্রকঠিন স্বভাব তোমার মধ্যে একটুও নেই।"

সে একটুও না রেগে বলত, "ওটা রিঅ্যাকশ্যানারিদের কম্যুনিস্ট

সম্বন্ধে একটি মিথ্যা ধারণা। বন্ধু, আমরা উগ্র নই, কেবল আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতা তোমাদের চোখে লাগায় ধাঁধা, আমাদের একনিষ্ঠতা জাগায় তোমাদের মনে ও হৃদয়ে আশংকা। একবার আমাদের নীতি নিয়ে দেখ না, তোমার শতাব্দীর জমা পচনশীল ও প্রস্তরীভূত অচল ধারণা একটু তাজা ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে।"

একদিন সে তর্কে আমাকে বলেছিল, "আরে, এই যে পাথর কেটে মূর্তি গড়া সেটা কি কেবল ধ্বংস? এ কেবল অপ্রয়োজনীয়কে বাতিল করে আসল বক্তব্যকে সকলের সামনে পরিস্ফুট করবার একটি অবশ্য উপায় মাত্র। অনেকদিনের অবহেলিত ও নিবদ্ধ সমাজ ও রাষ্ট্রে ধরে যায় মর্‌চে, তাকে একটু ঘষে মেজে না নিলে ক্ষয় অগ্রসর হতে থাকে তার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে।"

আমরা যখন হেসে তাকে খেপাবার ছলে বলতাম, "বকে যাও গো কার্ল মার্ক্সের তোতাপাখী, স্টালিনের পাঁচালি গাও তো তোমাকে দেব আরও দানা।"

সেও তেমনি হেসে বলত, "ডেকাডেন্সের ডেলা সব তোমাদের প্রগেসিভ্‌ রোলারের চাপে দেব গুঁড়ো করে।"

তারপরই হাত ধরে টান্‌ত ক্যাফে দোমেতে যাবার জন্যে এবং তার শেষ কপর্দক খরচ করে আমাদের এক পেয়ালা কফি খাওয়াত।

মাঝে মাঝে চলত আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সম্বলের বিনিময়ে পরস্পরকে সাহায্য করার অক্ষম চেষ্টা।

সিত্রিনোভিচের জুতো জোড়া মেরামত হতে হতে শেষে তালির তালিতে আর যোগাযোগ রাখবার স্থান ছিল না। ফাটা চামড়ার পর্দা উচিয়ে প্রায়ই উঁকি মারত তার পায়ের বুড়ো অঙুল আর গোড়ালির কড়া।

ডাগারম্যান একদিন, পুরনো হলেও সেলাই খোলে নি এমন একজোড়া জুতো এনে তাকে উপহার দিল। বলল যে তার এক বন্ধু ভুলে তার হোটেলে জুতো জোড়া ফেলে গিয়েছে এবং তাকে লিখে

জানিয়েছে যে তার ওটার আর প্রয়োজন নেই, তাই সে দিয়েছে সিত্রিনোভিচকে।

আমরা সবাই মেনে নিলাম তার কাহিনী, কেবল জানতাম যে জুতো জোড়া ওর নিজেরই।

আতলিয়েতে একদিন সিত্রিনোভিচ এল অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে। সুসংবাদ যে তার ভাগ্যে একটি ভাস্কর্য রচনার কমিশন মিলেছে।

সে আমাদের তিনজনকে বললে যে, আমরা তাকে এ কাজে সাহায্য না করলে সে প্রতিশ্রুত সময়ে মূর্তিটি শেষ করতে পারবে না, অতএব আমাদের তার সঙ্গে হাত লাগানো চাই।

ভাবলাম বুঝি কোন এক বিরাট মূর্তি তৈরী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আড়াই ফুট উঁচু একটি বছর দশেক মেয়ের প্রতিমা, যা সিত্রিনোভিচ নির্দিষ্ট সময়ে একাই অনায়াসে শেষ করতে পারত। আমাদের তাকে সাহায্য করা ভান মাত্র দেখাল, কারণ আসলে সে একাই করল সব কিছু।

কয়েকদিন পরে সে এল আতলিয়েতে হাতে একতাড়া এক শো ফ্রাংকের নোট নিয়ে—ভাবটা যেন ন্যাশন্যাল লটারী জিতেছে। নোটগুলিকে ব্যাংকের কোষাধ্যক্ষের মত পারদর্শিতা দেখিয়ে গুণে, সে করল চারটি সমান ভাগ এবং আমাদের তিনজনের হাতে গুঁজে দিল তারই এক একটি। বলল, তাকে সাহায্য করার পারিশ্রমিক।

সিত্রিনোভিচকে আমরা চিনতাম ভাল করেই। এ অর্থ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ হতো না। সে পেয়েছিল তো মোটে পাঁচশো টাকার মত ফ্রাংক, তার আবার ভাগাভাগি! কিন্তু কে তাকে বোঝাবে একথা।

আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম ওই ওর পন্থাতেই দেব তাকে ফিরিয়ে, তার কষ্ট-লব্ধ পারিশ্রমিক।

পিট্‌কিন ভান করল একটি মূর্তি নির্মাণের কমিশন পেয়েছে এবং সে আমাদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে।

যখন তার মনগড়া একটি মূর্তি আমরা হাত লাগিয়ে শেষ করলাম, সিত্রিনোভিচকে আমাদের তিনজনকে দেওয়া ফ্রাংকগুলি তার পারিশ্রমিক বলে পিট্‌কিন তার হাতে দিল।

সজল চোখে সিত্রিনোভিচ বলল, "তোমরা আমার অপমান করছ। চালাকি করে তোমাদের পারিশ্রমিক আমাকে ফেরত দিচ্ছ, আর মনে কর—আমি এতই মূর্খ যে, এটা বুঝতে পারব না। আমি গরীব, সহানুভূতি দেখিও কিন্তু দয়া দেখাবার চেষ্টা করো না।"

ডাগারম্যান তার বিরাট দুই হাত সিত্রিনোভিচের প্রায়-দুম্‌ড়ে-পড়া-কাঁধের উপর সস্নেহে রেখে বললে, "বন্ধু, তুমি টাকাটাকে এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছ? কয়েকটা ফ্রাংককে উপলক্ষ করে তুমি আমাদের জানিয়েছিলে তোমার অপরিসীম বন্ধুপ্রীতি, দিয়েছিলে আমাদের তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা উজাড় করে। আজ যদি আমরা সে দানকে কত আদরে গ্রহণ করেছি তার একটা ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি দেখাবার চেষ্টা করি, নির্দয় না হলে তুমি তা প্রকাশ করতে বাধা দেবে না।"

ডাগারম্যানের বলবার ধরনে ছিল যেন এক কলাকুশলী সেক্‌স্‌পীয়েরিয়ান্ অভিনেতার সম্মোহনের ভঙ্গিমা। সে বাধ্য করল অভিভূত সিত্রিনোভিচকে ফ্রাংকগুলি নিতে।

সে নোটগুলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, "চল শয়তানের দল, আমার সঙ্গে এখুনি ক্যাফে দোমে। এই ছল-পারিশ্রমিকের কিছুটা খরচ করে আমার সঙ্গে একপাত্র মদিরা পান করলে তোমাদের বন্ধুপ্রীতি আশা করি শুক্‌নো হয়ে উঠবে না।"

এরপর চলে গেল কয়েকটা বছর ধ্বংস ও মৃত্যুর লীলাতাণ্ডবে ভরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে। পারী ছাড়ার আগে আমার সামান্য সংগ্রহ ও সম্বলের পুঁজি রেখে এলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়েতে।

বিদায় নেবার সময় সে বলল, "জান আমাদের দেশে একটি চলিত

কথা আছে যে, প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায়কালে আমরা দিয়ে দিই একখানা করে বুকের হাড়।"

বললাম, "বন্ধু আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমার ওই হাড়খানা অনুসরণ করে সর্বদা পৌঁছবে তোমার সবটাই আমার মনে।"

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রলয়বিধ্বস্ত ইয়োরোপের ঘটনা পুরনো কথায় দাঁড়িয়েছে।

ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তন করে ভয়সঙ্কুল মনে খুঁজে বেড়িয়েছি হারানো বন্ধুত্বের স্রোতগুলি। কিন্তু সেগুলি কতক গেছে লুপ্ত হয়ে যুদ্ধাগ্নির শিখায় এবং কতকগুলি হারিয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত অজানা সংখ্যাহীন বিতাড়িতের গড্ডলিকায়।

গেলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়ের ঠিকানায়, কিন্তু পৌঁছে দেখি সেখানে সে বাড়ির কোন চিহ্নই নেই। পড়ে আছে একফালি ফাঁকা জমি, যার বুকের উপর কয়েকটা পুড়ে যাওয়া ভাঙা ইঁটের গাঁথুনি জানাচ্ছে এককালে সেইখানে হয়তো ছিল ঘর।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সামনের হোটেলের দরজা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকল এক বৃদ্ধা কঁশিয়ার্জ। কাছে গেলে বলল, "কী খুঁজছ ওখানে?"

জিজ্ঞাসা করলাম সিত্রিনোভিচ ও তার ঘরের খবর।

বৃদ্ধা জানাল যে সিত্রিনোভিচ আর নেই এ জগতে। হীন বশ্-রা তাকে হত্যা করেছে। এই পাড়ায় একটি জার্মান সৈন্যের কে গুপ্তভাবে প্রাণ নেয়, তার প্রতিশোধ নিতে নাৎসী শাসক গ্রেপ্তার করে এক শো নিরপরাধ অসহায় নাগরিককে। তার মধ্যে ছিল বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে। সিত্রিনোভিচ ছিল তাদের একজন। তারা সকলেই হারিয়েছিল প্রাণ, কেবল সিত্রিনোভিচের মৃত্যু হয়েছিল একটু স্বতন্ত্রভাবে। বন্দীদের মধ্যে একটি যুবতীকে এক জার্মান সৈন্য ধর্ষণ শুরু করায় সিত্রিনোভিচ যায়

এগিয়ে, তাকে রুখ্‌তে। কিন্তু সে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি, সেই সৈন্যের আগ্নেয় অস্ত্র মুহূর্তের মধ্যে শত গুলিতে তার দেহখানা করে দিয়েছিল ঝাঁঝরা। শুধু তাই নয়, গেস্টাপোরা এসে ভাঙল তার আতলিয়ে আর সেই ভগ্নস্তূপে লাগিয়ে দিলে আগুন, তার অস্তিত্বকে ধরার বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে।

ডাগারম্যান ও পিট্রকিন আজ কোথায় তা জানি না।

সিত্রিনোভিচের সংক্ষিপ্ত জীবনী ক'জনেই বা জানে, বা জানবার তাদের প্রয়োজন কী! আমার কাছে রয়ে গেছে তার স্মৃতির একটা ছাপ, যা মুছে দিতে চাইলেও যাবে না মুছে।

আজও যেন শুনতে পাই তার স্বর, দেখতেও পাই যেন তার স্বরূপটা—একটি সাধারণ মানুষ, যাকে আরও দশজনে জানবার সুযোগ পেলে সে হতো অসাধারণ।

সিত্রিনোভিচকে কে বলবে না বীর? নিজের সামনে অসহায়া একটি যুবতীর পাশব ধর্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা তার পৌরুষে সহ্য হয় নি বলেই জেনে শুনেই সে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় মৃত্যুকেও সে মনে করেছিল তুচ্ছ।

এই পুরুষকার হয়তো সাময়িক, কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলের মধ্যে থেকেই এটা ফুটে বেরোয় না। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় আর এক কাহিনী।

দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন পুরোদমে চলেছে। দলে দলে শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ করে খদ্দরের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নেমেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠায়।

তাঁদের অনেকেই দু একবার কারাবাস করে ফিরে এসেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন হরিপদদা। তাঁকে কোন্‌ কারণে মাস্টার মশাই বা পদবী দিয়ে অভিহিত না করে কেন যে হরিপদদা বলা হত তা জানি না।

তিনি ছিলেন আমাদের দাদা-স্থানীয় বন্ধুদের শিক্ষক। একহারা কাঁচা সোনার রঙের চেহারা ছিল তাঁর। কদম ছাঁটাই কালো চুল আর কালো এক জোড়া ভুরু ও কালো জ্বলজ্বলে চোখের বাহার মিলিয়ে তাঁকে সুপুরুষ বলা গেলেও, বীরোচিত কিছু ছিল না তাঁর চেহারায়। বরং ক্ষীণ বপু সামর্থহীনদের দলে তাঁকে পংক্তিভুক্ত করলে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না।

তাঁর মুখে সর্বদাই হাসি লেগে থাকত কিন্তু মাঝে মাঝে সে হাসির পিছনে উঁকি ঝুঁকি মারত দারুণ রাগের ছায়া, যা কোন সময়ে ফেটে বেরুলেই ঝাঁঝিয়ে দিত রুদ্র তাণ্ডবের ডঙ্কা।

হরিপদদা আমাদের ছোটদের সঙ্গে কানামাছি খেলতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং আমাদের উপর কোনদিনই তাঁর রাগের উত্তাপ এসে পৌঁছয় নি। সেটা বরাদ্দ ছিল কেবল প্রাপ্ত বয়সীদের জন্যে।

একবার তিনি দুটি ছাত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন জু-গার্ডেনে।

গার্ডেন থেকে তিনি স-ছাত্র শিয়ালদা স্টেশনে চলেছেন বালিগঞ্জের গাড়ি ধরতে।

দু একদিন আগে বর্ষা আসবে জানিয়ে দু এক পসলা বৃষ্টি ফেলে গেছে। পথে সস্তায় সওদা করেছেন একজোড়া মরসুমী ইলিশ মাছ।

স্টেশনে তিনি উপস্থিত হলেন, এক হাতে ছাতি অপর হাতে মৎস্যদ্বয়, আর তাঁর ঝোলা খদ্দরের পাঞ্জাবির দুই খেই ধরে তাঁর নাবালক সঙ্গী দুটি।

টিকিট চেকারদের অন্যপাশে দাঁড়িয়েছিল দুটি গোরা পল্টন্। তাদের কোমরে রিভলবার, হাতে ছোট ছড়ি। গেট পেরিয়ে যেমন বাড়িমুখো কেরানীকুল প্লাটফর্মে ঢুকছে, অমনি তারা তাদের পিঠে সপাং করে এক ঘা বেত লাগিয়ে খিল্ খিল্ করে হাসছিল। যেন কত মজার ব্যাপার।

হরিপদদা একবার ভাল করে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন,

"তোরা ঠিক আমার পিছনে থাকিস"—বলে বুকটাকে যতদূর সম্ভব সামনে চিতিয়ে তিনি গেট্ পেরুতে শুরু করলেন। সপাং করে পড়ল চাবুক তাঁর পিঠে। যেমন আরও বহু লোকের উপর তা পড়েছিল।

কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁর বাঁ হাতের ইলিশ জোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে বাঁ দিকের গোরার মুখমণ্ডলে আছাড় খেতে লাগল আর সেই তালে তাঁর ডান হাতের ছাতির শেষাগ্র ডানদিকের পল্টন্ সাহেবের উদরে বিশেষ উত্তেজনা সহকারে নৃত্য শুরু করল।

হরিপদদা যে সব্যসাচীর মত এক সঙ্গে এমন দু হাত চালাতে পারেন, এ দেখলে তাঁর পরিচিত অনেকেই হতভম্ব হয়ে যেত। ছাত্ররা তো ভয়ে আড়ষ্ট। এই বোধ হয় হরিপদদার শেষ আস্ফালন। পল্টন্‌রা এখুনি রিভলবার বের করে তাঁকে গুলি করে দেবে দফারফা করে। কিন্তু এই ভাবনা তাদের মাথায় ভাল ভাবে কায়েমি হবার আগেই যে নিঃসহায় কাপুরুষ কেরানীকুল বেত খেয়ে নীরবে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন কার মায়া-আহ্বানে জেগে উঠে মার্ মার্ শব্দে পল্টন্ দুটিকে ঘিরে ফেলল। কেউ তাদের হাতদুটি ধরল মুচড়ে পিছনে। একটু আগে এরা বীরত্বের দম্ভে হেসে মারছিল বেত, এখন ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গলার সুর মিহি করে চ্যাঁচাতে লাগল, 'হেল্প হেল্প'।

রেলওয়ে পুলিস কয়েকজন সত্বর এসে পড়ায় তারা কোনমতে উদ্ধার পেল মারমুখা জনতার পীড়ন থেকে। হরিপদদা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ছোট সঙ্গী দুটির সঙ্গে। তিনি পুলিসদের বললেন, 'ও দুটোকেও গ্রেপ্তার কর, ওরাই প্রথম মেরেছে।

ইতস্তত করে পুলিসরা খুব অমায়িকভাবে পল্টন্ দুজনকে যেতে বলল। তারা বাধ্য শিশুর মত চলল তাদের নির্দেশ অনুযায়ী।

স্টেশনেই একটি ছোট কোর্টের মত আদালত বসল।

যিনি জজিয়তি করছিলেন তিনি খুব আম্‌তা আম্‌তা করে টমি দুটিকে বললেন যে বাবুটির এই অভদ্র আচরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত,

তাঁর মারফত এই আদালতের সবাই তোমাদের এবং সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

এইবার হরিপদদার রাগের বম্ ফেটে পড়ল। যিনি জজয়তি করছিলেন তাঁর দিকে না তাকিয়েই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন টমি ছুটিকে উদ্দেশ্য করে, "বীরের সন্তানদের কি উচিত আচরণ, নিরস্ত্র জনতা যারা তোমাদের কোন ক্ষতি করে নি তাদের বেত মেরে বেইজ্জত করা? কোমরে রিভলবার আর পল্টনের ইউনিফর্ম পরে বড় দম্ভ তোমাদের—মনে করছ নিজেদের শাসক, আর আমরা তোমাদের গোলাম। আমি লিখব তোমাদের কমানড্যাণ্ট-এর কাছে, তোমাদের এই নির্লজ্জ তামাশার কথা আর তাতে সই থাকবে এই জনতার প্রত্যেকটি লোকের।"

জজ সাহেব তখন বলছেন, "মশাই চুপ করুন, এরকম বেয়াদপি করলে জেলে যাবেন।"

তাকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, "চুপ কর মোসাহেব—ইংরাজের কেনা দাস। নিজের মানসম্ভ্রম ওদের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছ, এখন চাও আমরাও তোমার মত ওদের নিষ্ঠীবন ভক্ষণ করি।"

ইতিমধ্যে পল্টন্ ছুটি এগিয়ে হরিপদদার ছুটি হাত ধরে বলতে শুরু করেছে, "বাবু আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা তোমার এবং সকলের কাছে মাপ চাচ্ছি, আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা এরকম অভদ্র আচরণ আর কোনদিন করব না।"

জনতা তাদের এত নরম হতে দেখে চ্যাচাঁতে লাগল, "মার্ বেটাদের, খুন কর" ইত্যাদি।

কিন্তু হরিপদদা হঠাৎ শান্ত হয়ে বললেন, "ছেড়ে দাও ওদের, আমরা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা ভদ্র জাত। কুকুরে কামড়ালে তাকে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আশা করি এই শিক্ষা যেন ওরা মনে রাখে।"

তারপর জজ আর পুলিসের অপেক্ষা না করেই তিনি ছাত্র

ছুটিকে বললেন, "চল এখন বাড়ি। কিছুটা যুদ্ধাহত অবস্থায় মাছছুটি তখনও তাঁর হাতে। সদর্পে ছাতি বগলে বুক চিতিয়ে চলেছেন একটি ক্ষুদ্রবপু বাঙালী, যাঁর মনে প্রাণে জীবনীশক্তি টগ্‌বগ করে ফুটছে।

মডেল

রোপ্যো, অর্‌ভোয়ার্‌ আদেম্যাঁ[১] —সকলেই চলে গেছে।

আমার আর মার্থের কাজ কিছু বাকি পড়ে যাওয়ায় আমরা আতলিয়েতে সেদিন রয়ে গেছি।

হঠাৎ আকস্মিক প্রশ্ন এল, "তোমার দুঃখটা কিসের?" ভাবছি কথাটা মার্থ না আর কেউ বললে। এর আগে তার গলার আওয়াজ চেনবার সুযোগ আমার হয় নি। আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার ওই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে।

জবাব দিলাম, "না মাদ্‌ম্যয়জেল্‌, আমার কোন দুঃখ নেই।"

সে বললে, "তবে তুমি এত চুপ চাপ কেন?"

জানালাম—কথা বললে হবে পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে হবে নিমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই বলে থাকি চুপচাপ। "কিন্তু তুমি যে চুপ করে থাক তা নিশ্চয়ই কোথাও ঘা খেয়েছ বলে।"

সে বললে, "আমি ঘা খেয়ে নির্বাক হয়েছি তা তোমাকে জানিয়েছে কোন্‌ পণ্ডিতে?'

বললাম, "পণ্ডিতে বলে নি—তুমি এইমাত্র বললে যে আমি চুপচাপ থাকি, আমার দুঃখটা কিসের? কাজেই বোঝা যাচ্ছে তোমার ধারণায় দুঃখ না পেলে কেউ হয় না পরিচয়-নিসক্ত—নীরব।"

১। বিদায়কালে দেখা হবে।

তার জবাব এল, 'পরিচয় চাও না, তা হলে নিজেকে নিয়ে কাজের ফাঁকে কর কী ?'

উত্তর দিলাম, 'স্যেন্ নদীর পারে ঘুরি আর হাওয়া খাই। আর রবিবার যাই লুভর্-এ। এ ছুটোই পাওয়া যায় বিনামূল্য।'

সে বলল, 'বেশ বেশ, আমিও যাই লুভর্ এ আর স্যেন্-এর ধারে, হাওয়া খাওয়া আমারও অভ্যাস আছে। এ ছুটোর কোনটায় যদি তোমাকে কোনদিন নিমন্ত্রণ করি তা হলে তার প্রতিনিমন্ত্রণ দিতে বোধ হয় তোমার পকেট খালি হবে না।'

চমকে গেলাম। ভাবলাম এই কি সেই—খেপা কুকুরের চেয়ে যার বিষ বেশী ?

সে বলে চলল, 'কিন্তু এই নিমন্ত্রণের একটি শর্ত আছে। সেটা হচ্ছে যে, আমরা কেবল পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে রেখে দেব এই আমন্ত্রণ। তার বাইরে যেন যেতে চেষ্টা কোর না এবং সেই ইঙ্গিত কোনদিন পেলেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ ও প্রতিনিমন্ত্রণের হবে সমাপ্তি।'

বেশ অব্যাহত ভাবেই বললাম, 'ভয় নেই মাদ্‌ময়াজেল্, আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চুক্তিহীন নিমন্ত্রণ ঘটে ওঠে না। তাই তোমার দেওয়া গণ্ডিকে ডিঙিয়ে যাবার প্রচেষ্টা আমার দিক থেকে হবে না। কারণ এতে হবে আমার সংকোচ ও ভয়।'

শর্ত রইল যে আতলিয়েতে আর-কাউকে আমরা জানাব না এই নিমন্ত্রণের কথা, কারণ তারা জানলেই করবে কানাকানি, হবে নির্লজ্জ রহস্য।

এর পর কয়েকদিন ধরে আতলিয়েতে এক গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় আমরা প্রায় ভুলে গেলাম একসঙ্গে বেড়ানোর নিমন্ত্রণ।

ডাগারম্যান মোমার্ত-এ দেখেছিল ছুটি জিপ্‌সী মেয়েকে। তারা পথচারীদের হাত দেখে পয়সা ভিক্ষে করছিল, ডাগারম্যান তাদের

একজনকে কাজ দেবে বলে এনেছে [illegible]। যখন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হল যে সে থ্রোনের উপর দাঁড়াবে সম্পূর্ণ নগ্না এবং তাকে দেখে আমরা গড়ব মূর্তি, তার হাতের রেশমী রুমালখানা অস্ত্রের মত আমাদের সামনে নেড়ে, রুমানী ভাষায় অনর্গল কত কী বলল। ভঙ্গি আর আওয়াজে আমরা বুঝলাম যে সে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। সজোরে মাটিতে পা দু-একবার ঠুকে সে চলল দরজার দিকে।

সেই মুহূর্তে ডাগারম্যান ছুটে মেয়েটির সামনে গিয়ে তার বিরাট বাহুদ্বয় প্রসারিত করে হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে এবং অভিনয়-কেতাদুরস্ত চালে বলল, 'মাদ্‌ম্যয়জেল্, যাচ্ছ, কিন্তু যাবার আগে আমার বুকে একটা ছুরি মেরে আমাকে শেষ করে দিয়ে চলে যাও।'

মেয়েটি তাকে ঠেলে সরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেই বপুর পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা তার ভুজলতায় ছিল না।

ডাগারম্যান বলে চলেছে, 'যবে থেকে তোমায় দেখেছি মোমার্ত-এ, আমার চোখে ভাসছে আধুনিক ভেনাসের মূর্তির ছবি এবং সে মূর্তি হচ্ছ তুমি। আমরা বেশী তো কিছু চাই না তোমার কাছ থেকে মাদ্‌ম্যয়জেল্, কেবল চেয়েছি একটু তোমার অনবদ্য রূপের একটা আদল। ভেবে দেখ, আজ কত শত বৎসর ধরে লোকে মিলোর ভেনাস্‌কে অর্পণ করে রূপদৃষ্টির অর্ঘ্য ও মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি। তোমায় দেখে আমি যে মূর্তি গড়ব, আশা করি যখন তুমি থাকবে না বা আমিও থাকব না, এ জগতে থেকে যাবে শুধু আমার সাধনা ও তোমার রূপের মিলন, যা তৃপ্ত করবে কত শত বৎসরের কত সহস্র রূপপিপাসুদের। দেখ না আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী। আমরা শুধু পুরুষের দল হলে না হয় তোমার বলবার কিছু কারণ থাকত, কিন্তু ওই দেখ না আমাদের মধ্যে মেয়েরাও একসঙ্গে একই কাজ করছে।' বলে ডাগারম্যান মার্থ-এর দিকে হাত দেখাল এবং সেই সঙ্গে তার চোখ যেন মার্থকে বলল, 'দোহাই তোমার, বেয়াড়া একটা কিছু বলে সব পণ্ড করে দিও না।'

সকলকে অবাক করে নির্বাক মার্থ বললে, 'ডাগারম্যান ঠিকই বলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল রূপের সৃষ্টি করা এবং তার আয়োজনে সমাজগত শ্লীলতা ও আচারের সংকীর্ণ গণ্ডিকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে তাদের—যাদের আদল থেকে চয়ন করে পরিস্ফুট হবে শিল্প।'

সে আরও বলে চলল, 'এই ধর না গোয়্ য়ার তৈরী নগ্না এল্‌বার ডাচেস্‌। যাদের সামাজিক রুচি তুলে ধরে নিষেধের যষ্টি, তাদের মতেই প্রমাণের চেষ্টা চলে, এ ছবির নায়িকা ডাচেস্‌ নয়। আমি বলি গোয়্ য়ার সঙ্গে গুপ্ত প্রেমকে চরিতার্থ করাবার জন্যে ডাচেস্‌ গোপনে দেখান নি শিল্পীকে তাঁর নগ্ন দেহ। তিনি চেয়েছিলেন বহুযুগ ধরে বহুজন দেখবে, শিল্পীর চোখে ধরা তাঁর নগ্ন দেহের মাধুরী।'

'ব্রাভো!' ডাগারম্যান তার দিকে এগিয়ে গেল তার অভ্যাসমত বক্তার পিঠে বিরাশী সিক্কার চাপড় দিয়ে তারিফ জানাতে, কিন্তু মার্থ-এর উদ্যত তর্জনী যেন তাকে ধাক্কা মেরে থামিয়ে দিল।

'থাক্‌ মঁ্যসিয়ো, আমার যা বিশ্বাস তাই বলেছি, তোমার তারিফ দিতে হলে অন্যকে দিও।'

মেয়েটি এসব নাটকীয় কথা বুঝল কি না জানি না। সে হঠাৎ ফিরে এল।

থ্রোনের উপর লাফিয়ে চড়ে ক্ষিপ্র হস্তে তার সব কাপড় খুলে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর দু হাতের আঙুল চালিয়ে খোঁপা দিল এলিয়ে এবং সজোরে থ্রোনের উপর পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলল, 'নাও, কর শিগ্‌গির তোমার ভেনাস্‌।'

তারপর প্রায় অস্ফুটস্বরে বলল, 'যদি ফ্লোরিয়ান্‌ জানতে পারে যে আমি এতগুলি পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছি ভেনাস্‌ হয়ে—যে ছুরি তোমার বুকে বসাতে বলেছিলে মঁ্যসিয়ো, সে তা আমার বুকে হাতল পর্যন্ত বসিয়ে দেবে।'

সেদিন আতলিয়ে বন্ধ হবার সময়ে মার্থকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা মাদ্‌ম্যয়জেল, তুমি ডাচেস্ এল্‌বা হলে কী করতে ?'

সে বললে, 'আমি গোয়্‌য়াকে আঁকতে বলতাম আমার নগ্নরূপ এবং ছবি শেষ হলে আমার ভৃত্যদের হুকুম দিতাম আমার সামনে শিল্পীকে অন্ধ করে দিতে, যাতে সে যতদিন বেঁচে থাকে তার চোখের সামনে ভাসবে কেবল আমার রূপ এবং জগতও জানবে যে গোয়্‌য়ার আমি শেষ ও একমাত্র নায়িকা।'

মনে মনে বললাম, 'ভাগ্যিস্ তুমি ডাচেস্ হও নি, বেচারী গোয়্‌য়া খুব বেঁচে গিয়েছেন।'

আতলিয়েতে আন্তর্জাতিক মডেলদের সুন্দরের হাটে জিপ্‌সী আদেলিতার দেহের গঠন ও লালিত্যের আভা আর-সকলের রূপকে ম্লান করে দিয়েছিল। তার মাথায় এক ঝিনুক জল ঢাললে নিম্নগামী সে জলের ধারা বহমান রেখায় দেখাত উচ্চ অনুচ্চ দেহের সকল গঠনের অতুলনীয় আদর্শ সমন্বয়। অনতিরিক্ত মেদ, ঋজু ও সুঠাম এই দেহের কোথাও কাঠিন্যের আভাস মাত্র ছিল না। বেতসের মত নমনীয়তা থাকলেও এ শরীরে তেজ ও শক্তি যেন উপচে উঠছিল। এ হেন দেহবল্লরীতে বৃন্তের ফুলের মত তার মুখখানা, সুগঠন চোখ নাক ও ওষ্ঠ বিম্বাধর লালিত্যের টলটলে মধু ক্ষরণ করত। তার আদর্শে মূর্তি গড়া পিগ্‌মেলিয়ানের কেবল গ্যালাটিয়াকে প্রাণ দেওয়া নয় ; এ যেন তার রূপের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে পিগ্‌মেলিয়ান চাইছে অন্তরে সুপ্ত রাজপুত্তুর ও পক্ষিরাজকে জাগিয়ে রূপকন্যার মালা পেতে, সাগর-জঙ্গমে পাড়ি দিতে।

ভাগারম্যান অনেক সময় কাজ থামিয়ে মুগ্ধ নয়নে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

মার্থ একদিন ঠাট্টা করে তাকে বলল, 'অত করে ওর দিকে চেয়ে থাকলে তোমার দৃষ্টির তাপে একদিন বেচারী গলে যাবে।'

আতলিয়েতে স্কেচিং ও পেন্টিং-এর জন্য যত মডেলের প্রয়োজন তারা প্রতি সোমবার আমাদের আতলিয়েতে আসত মনোনীত হতে।

আদেলিতাকে নিয়ে আমরা দু সপ্তাহ কাজ করেছি মাত্র। তারপর সোমবার আবার সকাল আটটা থেকে কর্মপ্রত্যাশী পুরুষ ও মেয়ে মডেলদের ভিড় লেগে গেছে।

হঠাৎ সুষ্ঠু সবল ও রোদে-পোড়া তামাটে রঙের একটি যুবক ঝোলা নীল রেশমের শার্ট পরে হাজির হল। তার কালো তেল-চুপচুপে চুলে টেরি কাটা, লম্বা জুল্‌পি ও ইস্পাতের ফলার মত ধারাল চাহনি দেখে কারোর বুঝতে বাকী রইল না যে, সেও জিপ্‌সী।

আদেলিতা তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে এক লাফে তার পাশে গিয়ে তার হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'আদেলিতা, এখানে কী করছিস?' সে জবাব দিল, 'যাই করি না, তুমি এখানে কেন?'

লোকটি একবার সবাইয়ের দিকে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে বলল, 'বুঝেছি, তুই এখানে মডেল হয়েছিস। গত দু সপ্তাহ ধরে মনোলিতা একা মোমার্ত-এ হাত দেখে বেড়াচ্ছে, আর তোর কথা জিগ্যেস করলেই সে বলে, তুই মোঁপারনাস্‌-এ কাজ নিয়েছিস। লজ্জা করে না তোর এতগুলো লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে? তুই যখন আমার স্ত্রী হবি এবং তোর ছেলেরা যখন শুনবে যে তাদের মা নির্লজ্জের মত বস্ত্রহীনা হয়ে বাজারে দাঁড়াত, তখন কোথায় আমি মুখ দেখাব?'

আদেলিতা তখন গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে আরম্ভ করেছে, 'আমার ছেলেরা কী ভাববে, সে খোঁজে তোর দরকার নেই—আর তোকে যে আমি তাদের পিতার অধিকার দেব—এ তোকে কে বলেছে? আমায় দেখে এরা গড়ছে ভেনাস্‌, আর তোকে দেখে এরা কী গড়বে?—বোধ হয় চোরের সর্দার।'

আমরা সবাই বুঝলাম ইনি ফ্লোরিয়ান্। ততক্ষণে রাগে তার মাথায় রক্ত চড়েছে। সে আদেলিতাকে ঝাপটে ধরে তার নিতম্ব-দেশে দ্রুত চপেটাঘাত বর্ষণ শুরু করল।

হট্টগোল চারিদিক মুখর করে তুলল এবং সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছিল ফ্লোরিয়ানের গর্জন ও আদেলিতার গালি: অ্যাম্বেশিল্, শালো, সোভাz ইত্যাদি।

সায়া আতলিয়ের তত্ত্বাবধায়িকা মাদাম রোz চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সিলাঁস্ সিলাঁস্—মঁসিয়ো হেলেবরিক আসছেন।'

ভিড়-করা পুরুষ-মেয়েরা দু পাশে সরে রাস্তা করে দিল, আগত প্রফেসার হেলেবরিককে।

তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত গোলমাল কিসের?'

ফ্লোরিয়ান্ ও আদেলিতা ঝগড়া থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখিয়ে স্বল্প কথায় তাঁকে জানানো হল যে তারাই এই অস্বাভাবিক গোলমালের জন্য দায়ী।

তিনি তাদের সদর দরজা দেখিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও এখনি কর্ক্যারা, এ কি মোমার্ত-এর খুনে গলি পেয়েছ?'

তারপর মাদাম রোzকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এসব ছুট্‌কো বাজারে-মডেলদের যেন আর আতলিয়েতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।'

প্রফেসার হেলেবরিকের কথায় ফ্লোরিয়ান্-এর রোষ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু তার উত্তাপ পেল কেবল আদেলিতা। সে প্রায় তাকে কাঁধের উপর ফেলে বলতে বলতে চলল, 'শয়তানী, তোর জিব কেটে দেব, যাতে আর কোনদিন না বলতে পারিস্, তোর সন্তানরা কোন্ পিতার জিম্মায় থাকবে।'

আমরা সকলেই মনঃক্ষুণ্ণ হলাম। যে আশা ও উদ্যমে আরম্ভ করেছিলাম আদেলিতার মূর্তি, তাকে অসমাপ্ত ও ব্যাহত করে সে চলে গেল।

আমরা সকলেই ভাবলাম, বেচারা ডাগারম্যান বোধ হয় তার

বিচ্ছেদে মুষড়ে পড়বে। কিন্তু সে হঠাৎ সারা আতলিয়েকে অট্টহাসে কাঁপিয়ে দিল।

হাসির গমক থামলে সে বলল, 'আমাদের ভেনাস্ গড়া শেষ হল না, কিন্তু নানেৎ যে আমাকে ধম্‌কে শাসিয়ে কর্তৃত্ব ফলায়, এই উপলক্ষ্যে তার প্রতিকারের একটা পথ আজ জানলাম।'

মডেলদের সম্বন্ধে যে চলিত ধারণা আছে, আমারও তাই ছিল যে—তারা সমাজ-বর্জিত অখ্যাত শ্রেণী থেকে আসে শিল্পকর্মশালায়, অর্থলুব্ধ হয়ে। তাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর রুচির ও কৃষ্টির তফাত আছে তা আতলিয়েতে যোগদান করবার আগে আমার ধারণা ছিল না।

যাদের উদ্দেশ্যে প্রফেসার হ্লেবরিক 'ছুট্‌কো' মডেল বলে তাঁর বিরাগ প্রকাশ করলেন, তাদের মধ্যেই দেখা যায় জিপ্‌সী, রাস্তার বারাঙ্গনা, উঞ্ছবৃত্তিজীবী ট্রাম্প্‌ ও রেফুজিরা যারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় সুযোগ পেলে হয় মডেল। কিন্তু বেশীর ভাগ আতলিয়েতে ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত কর্মশালায় পেশাদারী মডেলরাই কাজ পেয়ে থাকে। এদের অনেকে মডেল হয়েছে বোধ হয় প্রথমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পরে শিল্পসৃষ্টির মজায় মজে আতলিয়ের আবহাওয়া ও রূপচর্চার আনন্দটাই তাদের জীবনে বেশী প্রাধান্য এনে দিয়েছে। অনেকে শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে তার অনুরাগে হয়েছে মডেল।

চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্রা ফিলিপো লিপ্পি ও নান্ বুত্তির মত প্রেমাভিনয় আজও চলেছে ইয়োরোপে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

ফ্রান্সের কোন অখ্যাত গ্রাম থেকে তরুণী সুজান্ ভালাদঁ ভাগ্যান্বেষণে শহরে এসে পড়েছিল সার্কাসের ট্রাপিz খেলোয়াড় হিসাবে, কেবল দৈবক্রমে মাটিতে পড়ে ভগ্নাঙ্গ হওয়ায় ভালাদঁ সে পেশা ছেড়ে হল মডেল। তাও অর্থের কারণে নয়, কোন এক শিল্পীর প্রেমে পড়ে। তারপর তার আদলকে নিয়ে [illegible] উৎসুক হল প্রায়

ডগেন খানেক উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য শিল্পরথী। পিসারো রোনোয়া, ভোগারও নাম সেই তালিকায় দেখা যায়।

তরুণী ভালাদঁর হল সন্তান এবং কোন্ শিল্পী যে তার পিতা তা কেউ জানে না।

শিল্পী উত্রিল্লো তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করায়, সে আজ মরিস উত্রিল্লো নামে পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী।

ভালাদঁ শুধু শিল্পীদের মডেল হয়েই জীবন কাটান নি। তাদের দেখাদেখি তিনিও করেছিলেন শিল্পের প্রচেষ্টা এবং তাঁর করা ছবি আজ প্যারীর বিখ্যাত আধুনিক শিল্প-সংগ্রহশালা মুজে দার মদার্ন্-এর একটি বিশেষ কক্ষে অন্য বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের মহলে দক্ষতার সঙ্গে পড়শী হয়েছে।

ভালাদঁ ছন্নছাড়া মদ্যপ ও অর্ধ-উন্মত্ত মরিস্‌কে ঘরে তালাবদ্ধ করে শিল্পে নিযুক্ত না করলে আজ জগৎ পেত না এই শিল্পীর দান।

পিতৃদত্ত সামান্য ধন নিয়ে পোলিশ মহিলা জেন্‌ভিয়েভ সোফি ব্রেzকা এলেন বৃটেনে লেখাপড়া করতে। তিনিই কেবল দেখলেন ভাগ্যভ্রষ্ট ফরাসী যুবক অঁরি গোদিয়ের-এর মধ্যে বিরাট শিল্পীর উন্মেষ।

তিনি একাধারে মাতা, সঙ্গিনী, পেট্রোন্, প্রণয়িনী ও মডেল হয়ে চাইলেন যাতে শিল্পী গোদিয়ের-এর শিল্পসাধনা হয় সম্পূর্ণ। গোদিয়ের প্রণয়ে কি কৃতজ্ঞতায় নিল ব্রেzকার নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে। সে যদি অকালে নিজ দেশপ্রেমে মেতে প্রথম মহাযুদ্ধে মাত্র তেইশ বছর বয়সে প্রাণ না হারাত, তা হলে জগৎ আজ পেত বিংশ শতাব্দীর এক সেরা শিল্পীর সম্পূর্ণ দান। ব্রেzকা তার প্রতিভা ঠিকই ধরে ছিলেন।

গোদিয়ের-এর মধ্যে যে শিল্পী ছিল তার বিরহে কিংবা প্রণয়ীর বিচ্ছেদে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে আমৃত্যু জীবন কাটালেন ব্রেzকা। কিন্তু যে কয়েকটি মূর্তি ও ছবি গোদিয়ের-এর নাম বহন করেছে,

সেগুলি চিরকাল কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো ব্রেZকারও নাম বহন করবে।

কত শিল্পীর স্ত্রী, স্বামীর পেশাকে ভালবেসে অসংকোচে হয়েছেন তাঁর মডেল। আবার কত মহাশিল্পী মডেলকে ভালবেসে করেছেন গৃহিণী।

রুবেন্‌স-এর দুই স্ত্রী, রেম্‌ব্রাণ্ট-এর সাসকিয়া ও হেন্‌ড্রিখিয়ে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

অনেক দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীও মডেল হয়ে রোজগার করে তাদের পড়াশুনোর খরচ জুগিয়ে নেয়। বিশেষ করে যারা বিদেশী তাদের পক্ষে এত সহজে অন্য কোন কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য সব পেশায় বিদেশীদের সরকারী অনুমতি লাগে এবং সে অনুমতি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বহু শিল্পীর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে তাদের মনের শিল্পাদর্শকে জাগায় মডেলবিশেষের শরীর ও রূপের ধাঁচ। অনেক সময় পুরনো শিল্পীর নাম-না-লেখা ছবিতে তাঁর প্রিয় মডেলের আদর্শের সাদৃশ্য দেখে ধরে ফেলা যায়, সে কার হাতের কাজ।

আতলিয়েতে কতবার প্রফেসার ও শিক্ষার্থীদের শুনেছি, কোন মডেলকে দেখিয়ে বলতে—রুবেন্‌স্, অ্যাগ্‌র বা ভাস্কর মাইয়ল্‌-এর টাইপ।

মাইয়ল্‌ যখন তাঁর আদৃতা মডেল 'দীনা'র সন্ধান পান, তখন তাঁকে লেখেন 'মাদ্‌ম্যয়জেল, শুনলাম তুমি নাকি একটি মাইয়ল্‌-এর ভাস্কর্য। যদি তাই হও, তা হলে আমার আতলিয়েতে এসে ভাস্কর্য রচনায় সাহায্য করলে বিশেষ সুখী হব।'

তিনি আমৃত্যু এই দীনাকে সামনে রেখে গড়ে ছিলেন তাঁর সেরা ভাস্কর্যগুলি এবং তার আদর্শে গড়া একটি বিরাট 'টরসো'র উপর সারাজীবন কাজ করেও তিনি মনে করেন নি যে, তাঁর চোখে উদ্ভাসিত দীনার গঠনের সবটা রূপ তিনি দিতে পেরেছিলেন এই মূর্তিতে।

পেশাদারী মডেল ছাড়াও অনেক শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির কৌতূহল নিয়ে আসেন শখের মডেল হতে। শিল্প-ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে প্রচুর।

একবার সুবিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন্‌ এক প্রৌঢ়ার নগ্না মূর্তির ভাস্কর্য দেখিয়ে আমায় বললেন, 'জান এ কে?' 'না' বলায় বললেন, একদিন এই মহিলাটি আমার স্টুডিয়োতে উপস্থিত হয়ে জানালেন, তিনি রাজকুমারী ব্র্যাগান্‌জা এবং তাঁর একটি নগ্ন মূর্তি গড়তে অনুরোধ করলেন।

তিনি বললেন, 'তোমার করা ভাস্কর্য কেনবার সামর্থ্য আমার বর্তমানে নেই। কিন্তু আমার অনেক দিনের ইচ্ছে যে নিজের চেহারার আদলে তোমার গড়া ভাস্কর্য কেমন হয় দেখব।'

ভাবলাম সে পাগল এবং কোন অজুহাতে তাকে বিদায় করলাম, কিন্তু বার বার আসতে লাগল সে। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, সত্যিই মহিলাটির জন্ম শেষ পর্তুগীজ রাজার পরিবারে। কী জানি, কেমন তার প্রতি একটা মায়া হল এবং গড়লাম এই বিগলিতা বিশীর্ণা প্রৌঢ়ার দেহ। মনে করলাম, মস্তিষ্কের বিকৃতিতে সে বোধ হয় এখনও মনে করে নিজেকে সুগঠিতদেহ সুন্দরী যুবতী এবং আমার করা তার বর্তমান রূপ দেখে হয়তো স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবে।

কিন্তু সে নিজেই বলল, 'মনে ভেবো না যে আমার জরাময় দেহের কুরূপ সম্বন্ধে আমি অচেতন। কিন্তু জান, আমি এক সময় ছিলাম সুরূপা সুন্দরী। সে সময় এ-রকম করে যেচে মডেল হতে চাইলে, তোমরা—শিল্পীরা আমায় পাবার জন্যে লাগিয়ে দিতে লড়াই। কিন্তু কেবল যৌবনের জোয়ারকে মূর্ত করে কেন হবে সেরা ভাস্কর? তুমি যদি জীবনের অপরাহ্নের ক্ষীণ স্রোত ছবিতে জাগিয়ে তুলতে পার চলে-যাওয়া সে ভরা জোয়ারের স্মৃতি, তবেই তোমাকে বলব—কৃতী শিল্পী।'

এপ্‌স্টাইন্‌ আমায় বললেন, 'ভাল করে দেখ, সত্যিই লোলচর্মের

রেখা ধরে ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে উন্নতবক্ষা ক্ষীণকটি যৌবনগর্বিতার ছবি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাজকুমারী ব্রাগানৃৎ্রা এখনও কি আসেন এই মূর্তি দেখতে আপনার স্টুডিওতে?'

এপ্‌স্টাইন্ বললেন, 'না। এই মূর্তিটা শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি একটা উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।'

মডেলদের মধ্যে রাশিয়ান ইয়ানিনার একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রথমত অন্যান্য স্লাভ্ মেয়েদের মত সে মেদবহুল প্রশস্তবক্ষা ও জঘনা ছিল না। তাদের মত ছিল না তার পদদ্বয় ভাঁজা মুগুরের মত। তাদের যেমন চৌকশ মুখে মোটা নাক ও ঠোঁট দেখা যায়, ইয়ানিনার মুখ ছিল তার ঠিক বিপরীত। অণ্ডাকৃতি মিহি মুখশ্রীতে ছিল সূক্ষ্ম নাসাপুটে সাজানো সোজা নাক, জ্বলজ্বলে ভাসা ছুটো কালো কালো চোখ, আর ছোট বিম্বোষ্ঠ অধরে মানানো বক্ত্র। এই সুশ্রী মুখমণ্ডলকে সগর্বে উন্নত রাখত তার মৃণালগ্রীবা। আর তার নীচে যেমন আমাদের চোখ নামত, দেখতাম তার নাতিপ্রশস্ত পীনোন্নত স্তনশোভিত বক্ষ, কৃশোদর, সুপুষ্ট ও মসৃণ শ্রোণীদেশ এবং তার ভারবহনকারী সুগঠিত ক্রমদীর্ঘ পদযুগল।

সে নাকি ছিল কাউণ্ট-কন্যা। রাশিয়ান বিপ্লবে বিতাড়িতা হয়ে এখন হয়েছে প্যারিসের শিল্পশালার মডেল। এক সময়ে খ্যাতনামা শিল্পীরা নিযুক্ত হত তার শিল্প-শিক্ষকের কাজে, আর এখন সে হয়ে গেছে শিল্প-অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর শিল্পসাধনার উপলক্ষ্য মাত্র। তার স্বভাবজাত আভিজাত্যকে অন্য মডেলরা সমীহ করে তফাতে চলত। যখন সে বুল্‌ভার্ মোঁপার্নাস্ দিয়ে হেঁটে চলত, পাশের ক্যাফেতে বসা শিল্পীরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। এমন কি প্রফেসার হেলেবরিকও [illegible] তাকে ভঙ্গির নির্দেশ দিতেন বেশ সম্মান-সহকারে।

একদিন সে খুব উৎফুল্ল হয়ে এল আত্তলিয়েতে। বলল, 'তোমরা আমাকে ফেলিসিতাসিয়ঁ[২] জানাও, কারণ আমি কন্‌সের্ভাতোয়ার্‌-এর[৩] শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছি।'

জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে কন্‌সের্ভাতোয়ার-এর খরচ চালিয়েছে মডেলের পারিশ্রমিক দিয়ে। ক্ষুণ্ণ হলাম সবাই, যখন সে বলল যে, তাকে আর মডেল হিসাবে পাব না।

আমাদের যেন একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল, 'অবশ্য এত পরিশ্রমের পর যদি অপেরায় গাইবার সুযোগ না পেয়ে আমাকে ক্যাফের গায়িকা হতে হয় তা হলে ফিরে আসব আবার তোমাদের মাঝে।' তারপর সে আমাদের সকলকে অনুরোধ করল কোন ক্যাফেতে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ শুভকামনা করে আমরা তার সঙ্গে কিছু পান করি।

গেলাম তার সঙ্গে মোঁপারনাস্‌-এর একটি অতি সাধারণ ক্যাফেতে। এর এক দিকে রেস্তোরাঁ। সেখানে মধ্যাহ্নভোজন ও রাতের আহারে বেশী লোক সমাগম হয়। বাকী অংশে দিবারাত্র লোক আসে, খায় কফি, বা মদিরা পান করে খোশগল্প জমাতে। দু-এক কোণে ছবি ও রঙ-বেরঙের বাতি দেওয়া জুয়াখেলার বাক্স। তাতে পয়সা ফেলে স্প্রিং-এর ঘায়ে বল গড়িয়ে হাজার বা দশ হাজার নম্বরগুলি ছুঁয়ে, পূর্বে অপারগ লোকেদের দেওয়া জমা পয়সা তোলবার চেষ্টা করে চলে অনেকে। কেউ বাজি মাত করলেই ক্রিং করে ঘণ্টা যায় বেজে। উপস্থিত সকলের একটু টনক নড়ে বাক্স ও খেলোয়াড়ের প্রতি। গার্সঁ এসে চাবি খুলে দেয় বাক্সর আধারে জমা পয়সার থোক। আবার চলে নতুন উদ্যমে বাজিজেতা খেলোয়াড়ের স্প্রিং ও বলের ঠোকাঠুকি।

আমরা সদলবলে হৈচৈ করে ক্যাফেতে বসলাম যেন ইয়ানিনার বাজি জেতার উপলক্ষে।

---

২. শুভকামনা। ৩. শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিক্ষালয়।

আমাদের গল্প বেশ জমে গেল। এমন কি ক্যাফের অধিকারিণী মাদাম্‌ও এসে আমাদের আসরে ভিড়ে গেলেন।

ইয়ানিনা বলে চলেছে, 'জান, প্যারিস্‌র এটি অতি সাধারণ ক্যাফে অনভিজ্ঞের কাছে, কিন্তু বিশ বছর আগে যাদের সঙ্গে এই ক্যাফের যোগাযোগ ছিল তারাই জানে, শিল্প-ইতিহাসের কয়েকটি পাতা এখানে লেখা হয়ে গেছে।

এইখানেই এসে বসে থাকত মদিগ্‌লিয়ানি। নিঃস্ব সে, ক্ষুধার তাড়নায় মাদামকে অনুনয় করত এক বাটি সুপ বা এক টুকরো রুটি মাংস দিতে, এই দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতিদানে শিল্পী মাদামকে দিত মাঝে মাঝে তার দু-একটি স্কেচ বা ছবি। কিন্তু সেগুলিকে মাদাম অখ্যাত শিল্পীর কৃতজ্ঞতার স্মারক—কাগজ ও ক্যান্‌ভ্যাস্‌-এর অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয় ভেবে একটি কাবার্ড-এ রেখে দিত। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, অনেক স্কেচ আর ছবি জমা হলে, একদিন সের-দরে সেগুলিকে পুরনো কাগজবিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেবে।

অনাহার-পীড়িত শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির ক্রমে হল যক্ষ্মা এবং অকালে হল তার মৃত্যু। কিন্তু জীবিতকালে যে মদিগ্‌লিয়ানির কেউ করে নি সমাদর, কেউ দেয় নি তাঁর শিল্পের মূল্য, তাঁর জীবনান্তে হঠাৎ সাড়া পড়ে গেল সারা শিক্ষিত শিল্পরসিকমহলে, তাঁর এই অকালমৃত্যুতে উঠল হাহাকার।

তাঁর শব-শোভাযাত্রার পিছনে চলল মাইলের অধিক দীর্ঘ প্যারিস্‌র নাগরিকরা। তার মধ্যে শোকাবনত মস্তকে চলেছিলেন পিকাসো, বোনার্‌, বাস্কুসি প্রভৃতি পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পীরা।

খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হল তাঁর মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস, তাঁর প্রতিভা ও জীবনকাহিনী।

মদিগ্‌লিয়ানির ছবি নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে পড়ে গেল

কাড়াকাড়ি এবং যাঁর জীবিতকালে তাঁর ছবির জন্য অনেকেই দিতে চায় নি এক কানাকড়ি, তাদেরই হাত বদলে সেই ছবিরই মূল্য উঠতে লাগল ক্রমপর্যায়ে বিরাট সংখ্যায়।

সেই সব পড়ে দেখে ক্যাকের মাদাম ভাবলেন, তিনি আজ অতুল সম্পদের অধিকারিণী, কারণ তাঁর কাবার্ড ভরে আছে মদিগ্‌লিয়ানির দেওয়া কত ছবি ও স্কেচ। সেগুলিকে বিক্রি করলে তাঁর যে অর্থ লাভ হবে তা শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানি যদি পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে চর্বচোষ্য খেয়ে যেতেন, তা হলেও তার খরচ এই ছবির মূল্যের এক-দশমাংশও হত না।

এ কাবার্ড-এর উপর রাখত রেস্তোরাঁর পরিচারিকারা আহারান্তে উচ্ছিষ্ট প্লেটের সারি। কাঠের ফাটল বেয়ে নামত সুপ ও খাদ্যের তরল চোয়ানি।

মাদাম শিল্পীর কাছ থেকে স্কেচ বা ছবি পেলেই কাবার্ড-এর দরজা একটু ফাঁক করে সেগুলিকে ভিতরে ফেলে দিতেন। তারপর কোনদিনই সেগুলির উপর দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেন নি। সুপ ও খাদ্যের রসসিঞ্চিত সেই স্কেচ ও ক্যান্‌ভ্যাস্‌-এর তাড়া মজে হয়েছিল মুষিকের মুখরোচক খাদ্য। যেখানে মাদাম আশা করেছিলেন দেখবেন বহুদিনের সঞ্চিত শিল্পসম্পদের রাশি যেন সোনার বুলিয়ান-এ রূপান্তরিত হয়ে আছে, সেখানে দেখা গেল কেবল মুষিকভুক্তাবশিষ্ট কাগজ ও ক্যান্‌ভাস্‌-এর স্তূপীকৃত টুকরোগুলি।

নৈরাশ্য যেন সজোরে একটা চপেটাঘাত করে মাদামকে বসিয়ে দিল। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছিঁড়তে লাগলেন চুল ও মাথা কুটলেন মাটিতে।

চারিপাশ থেকে সবাই এল তাঁকে শান্ত করতে এই ভেবে যে, মাদামের শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির প্রতি পড়ে ছিল অসীম মায়া ও স্নেহ এবং এবং তাঁর বিয়োগে তিনি এখন শোকে মুহ্যমান হয়েছেন।

কয়েকজন ক্যাকের পরিচারিকা ছাড়া কেউ জানল না মাদাম কাতর হয়েছেন কিসের বিয়োগে।

বর্তমান ক্যাফের মাদাম জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ানিনাকে, 'সে কাবার্ডটি কোন্ জায়গায় ছিল? কারণ মদিগ্লিয়ানির সময় থেকে ক্যাফেটির স্বত্বাধিকার বদল হয়েছে কয়েকবার এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

সে বলল, 'আমি কী করে বলব? কারণ মাদাম্, যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার বয়স সাত বৎসর মাত্র। এ কাহিনী আমি শুনেছি আমার পিতা কাউন্টের কাছে। তিনি স্বদেশ-বিতাড়িত হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় প্যারিতে এসে কাজ নিয়েছিলেন এই ক্যাফেতে।'

আমাদের অলক্ষ্যে এতক্ষণ শ্মশ্রুগুম্ফবিনিন্দিত মুখ, উসকোখুসকো কেশ-বেশবিশিষ্ট একটি যুবক, ইয়ানিনার একটি স্কেচ করতে ব্যস্ত ছিল। তার চেহারার একটা অক্ষম আদলে কাগজ ভরে তার সামনে রেখে সে বলল, 'মাদ্ম্যয়জেল্, আমার ছবিটা কিনে নাও। বলা যায় না ভাল করে রেখে দিলে দু-দশ বছরে মদিগ্লিয়ানির ছবির মত এ অনেক মূল্যবান হতে পারে।'

ইয়ানিনার সঙ্গী আর এক ভদ্রলোক, কাগজে এই যুবকের একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে তাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। এটা রেখে দিও। হয়তো সময়ে এর মূল্যে যে পয়সা পাবে তাতে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা মহা উপায় হয়ে যাবে।'

যুবকটি রেগে বলল, 'ও, বুঝি নি যে, তোমরা আতলিয়েরর লোক। তোমাদের মধ্যে নানান দেশীয়দের দেখে মনে হয়েছিল যে, তোমরা টুরিস্ট্।'

তারপর ইয়ানিনার হাত থেকে স্কেচখানা একরকম ছিনিয়ে নিয়ে বিড় বিড় করে বকতে বকতে সে চলে গেল।

ইয়ানিনা, যে ভদ্রলোকটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছিল তাকে, কপট ভৎর্সনা করে বলল, 'মার্কো, তুমি অত্যন্ত ইতর। না হয় কয়েক ফ্রাঙ্ক দিয়ে বেচারীকে একটু সাহায্যই করতে! তার গরিবানায় এমন উপহাসের কী প্রয়োজন ছিল?'

মিরকো বলল, 'সে শুধু ছবিটি এঁকে পয়সা ভিক্ষা চাইলে দিতাম। কিন্তু নিজেকে মদিগ্লিয়ানির সমান তুলনা করবার স্পর্ধা দেখানোতে তাকে সাজা দেবার লোভ সামলাতে পারি নি।'

মিরকো প্রাচ্য ইউরোপের একটি দেশের লোক। প্যারিতে সরকারী-বৃত্তি পেয়ে এসেছে চিত্রাঙ্কনের অভিজ্ঞতা পেতে। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার দু-একদিন পরে সে আমাকে একটি আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের ক্লাবে নিমন্ত্রণ করল, সেখানে তার নিজের দেশের অনেকগুলি ছাত্র ছিল। এবং তারা প্রায় সকলেই সরকারীবৃত্তিধারী।

মিরকো তাদের একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সে মুষ্টিবদ্ধ হাত উপরে তুলে কমিউনিস্ট প্রথায় আমায় অভিবাদন জানাল।

আমি 'আঁশাতে' বলে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করলে সে বলল, 'ম্যঁসিয়ো, তুমি দেখছি কমিউনিস্টবিরোধী।'

বললাম, 'না ম্যঁসিয়ো, আমি কারুরই বিরোধী নই। আমাদের মধ্যে হাত উঁচু কি হাতজোড় করে অভিবাদন করার পার্থক্য থাকলেও এর উদ্দেশ্যে আশা করি কোন গরমিল নেই।'

সে বলল, 'মিরকো আমাকে জানিয়েছে যে তুমি ভাস্কর ও চিত্র-শিল্পী, এবং প্যারিতে লেখক ও শিল্পীরা সকলেই কমিউনিস্ট। যদিও সব কমিউনিস্ট এখানে লেখক ও শিল্পী হয় না।' বলে একটা মৌলিক রহস্য করে ফেলেছে ভেবে খুব হেসে নিল।

হাসি থামলে বলল, 'অবশ্য মিরকোর বন্ধুরা সকলে যে কমিউনিস্ট নয় তা আমার জানা উচিত ছিল। বন্ধু মিরকোর মাঝে মাঝে চেপে যায় বুর্জোয়া খেয়াল। এই দেখ না একটা হোয়াইট্ রাশিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। যাই হোক, তুমি যে কমিউনিস্ট নও তা বুঝেছি। এখন তুমি কোন্ রাজনৈতিক দলভুক্ত [illegible] জানাও।'

আমার মনে পড়ল আতলিয়েতে প্রথম পরিচয়ে, সিত্রিনোভিচও প্রশ্ন করেছিল, আমি কমিউনিস্ট, স্যোসালিস্ট বা ফ্যাসিস্ট কি না?

কিন্তু আমি এর কোনটাই নয় বলায় হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কোন্ গ্রহ থেকে খসে পড়লাম এই পৃথিবীতে!

যেন এর বাইরে কেউ থাকতে পারে তা তার ধারণার অতীত।

বললাম, 'আমি মনুষ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত। এবং আশা করি সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।'

সে বলল, 'তোমার কথাবার্তা ও রাজনৈতিক ধারণার আভাস দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কুল্যাক্-সম্ভূত। শুনেছি তোমাদের দেশে ইংরাজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের খুব তোয়াজ করে থাকে। তোমরা রেখেছ প্রোলেতারিয়াত্‌দের ক্রীতদাস করে। শোনা যায় তোমাদের শ্রেণীর লোকেরা চাকরদের গোড়ালির বন্ধন কেটে দেয়, যাতে তারা দৌড়ে পালাতে না পারে।'

হেসে বললাম, 'ম্যঁসিয়ো, কুল্যাক্‌দের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে দেখছি ঐতিহাসিক সত্যকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছ। আমরা চাকর রাখি ঠিক, কিন্তু, তারা ক্রীতদাস নয়, আর গোড়ালির বন্ধন কাটতে উদ্যোক্তারা ছিলেন হয়ত তোমারই পূর্বপুরুষদের কেউ, যদি তাঁদের কেউ আমেরিকায় গিয়ে থাকেন সেট্‌লার হয়ে। আমেরিকান সেট্‌লার্‌রা এই কাজে দড় ছিলেন—নিগ্রো ক্রীতদাসদের অধীন ও বন্দী রাখতে। আমি কুল্যাক্-সম্ভূত কিনা বলতে পারি না, তবে পৈত্রিক ভিটে একটা আছে। এবং সাধারণ মজুরের মতই খেটে দিন চালাই। এতে আমি তোমার রাজনৈতিক মতে মানুষের কোন পর্যায়ে পড়ব সে তুমিই জান।'

মির্‌কো আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এইলাস্-এর কথায় কান দিও না, বা কিছু মনে কোর না। ও ওই রকম উৎকট অন্ধভাবে সাম্যবাদী।'

এইলাস্ চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার মির্‌কো, ওকে তুমি তোমার রাজনৈতিক [illegible] দিও না। ও আমার শিকার। এমন একটা পিওর ডেকাডেন্ট মাল পেয়েছি, ওর শুদ্ধিকরণ (Purification) একটা চমৎকার এক্‌স্‌পেরিমেন্ট হবে।'

সে ফের শুরু করল, 'মার্কসের মতে, যে শ্রেণী যত বেশি ডেকাডেণ্ট, বিশুদ্ধিকরণের সুযোগ পেলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সে তত বেশী দ্রুত। ম্যঁসিয়ো নিশ্চয়ই জান, মানবসমাজে আছে ক্যাপিতালিস্ত্, বুর্জোয়া, পেতিবুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়াত্ শ্রেণী। এই প্রোলে-তারিয়াত্‌রা ক্যাপিতালিস্ত্‌দের দেশে ধনীদের দ্বারা শোষিত ও পীড়িত হয়ে পিষে মরছে। এদের উদ্ধার করতে হবে। উপরে এনে এদের হাতে তুলে দিতে হবে ন্যায্য পাওনা রুটি।'

বললাম, 'ম্যঁসিয়ো, আমি তোমার সঙ্গে একমত যে দেশের লোকের ও সরকারের কর্তব্য, যাতে প্রত্যেকের পরিধেয়, অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হয়। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ কেবল কি রুটি-প্রাপ্তির সংগ্রাম ও জয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে? যে রুটি পায় না তার জীবন কি একেবারে নিষ্ফল? বহু শিল্পী, লেখক, কবি ও দার্শনিকরা ভোগ করেছিলেন অসীম দারিদ্র্যের তাড়না এবং তাঁদের অনাহারগ্রস্ত জীবন, মানব-ইতিহাসে রেখে গেছে লজ্জা ও কলঙ্কের ছাপ। কিন্তু আমার মনে হয় এই দারিদ্র্য ও দুঃখ ভোগ সত্ত্বেও, সৃষ্টির আনন্দের ক্ষণগুলিতে হয়ত পার্থিব নিঃস্বতার আঘাত দাগ বসাতে পারে নি তাঁদের মনে ও দেহে।'

এইলাসের উত্তর এল যেন ষ্টেন্‌গানের গুলি-বৃষ্টি। 'আরে তাদের পেট যদি ভরা হত তাহলে তারা যে শিল্প ও সাহিত্যের সম্পদ এনে দিত তার তুলনায়, তাদের দেওয়া দান অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাছাড়া তারা তো কেবল বুর্জোয়া ও কাপিতালিস্ত্‌দের দাসত্ব করায়, সৃষ্টি করেছে তাদেরই তাঁবেদারী-মোহাচ্ছন্ন শিল্প। শিল্প সাহিত্যকে এই কাপিতালিস্ত্ ও বুর্জোয়াসেবী ভ্রান্তি ও মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাদের বর্তমান সংগ্রাম।'

বললাম, 'যারা শিল্প ও সাহিত্যের সমঝদার, তারা এই দানকেই দেখে মহান ও সম্পূর্ণ। এরই রসে রাঙান তাদের মনের কোন অংশটা যে খালি তা তো মনে হয় না। আর এই সংগ্রামেই তো জন্ম হচ্ছে

বড় শিল্প ও সাহিত্যের। যখন সবাই ন্যায্য পাওনা রুটি পেয়ে যাবে, তখন সংগ্রামের কারণ শেষ হয়ে যাওয়ায়, বলবার আর বোধহয় কিছু থাকবে না। এবং পরিপূর্ণ উদর আনবে সর্বজনীন ঘুম, মানসিক আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা।'

সে বলল, 'এ শিল্পরসের অধিকারী কেবল একটি ছোট সমঝ্‌দারের সমষ্টি। আমরা এরই বিরুদ্ধে লড়াই করে সুবিধাভোগীদের নিপাত করে এমন শিল্প ও সাহিত্যের জন্মের সুযোগ এনে দেব, যা আনন্দ দেবে প্রত্যেকটি 'কামারাদ্‌কে'।'

বললাম, 'ম্যঁসিয়ো আমার মোহাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক বলে শিল্প ও সাহিত্যে ক্রমোত্তর উচ্চাঙ্গের সন্ধানে নূতনতর কলা ও কাহিনীর সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টা ও রসগ্রাহীর সংখ্যা যত চেষ্টাই কর না, থেকে যাবে সংক্ষিপ্ত। তোমার ভাবধারায় তৈরী শিল্প ও সাহিত্যের রচনা-প্রকাশ মাত্রেই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে, তোমার কথায় প্রোলেতারিয়াত্‌-কৃষ্টির আদর্শ রূপায়ণ হবে কিন্তু তাতে উচ্চাঙ্গ ও অভিনব কথাটা কেটে বাদ দিতে হবে।

'তোমরা তো পিকাসোকে কমিউনিস্টদের বন্ধু বলে খুব খাতির কর কিন্তু তাঁর রচনা তো বহুজনগ্রাহ্য নয় কাজেই তাঁর শিল্পকে তোমার নবতন্ত্রের রাষ্ট্রে স্থান দেবে কি?'

সে বলল, 'পিকাসোর কাজ আমরা রেখে দেব সংগ্রহশালায়, ঘুণধরা ক্যাপিতালিস্ত রাষ্ট্র-উদ্ভূত অপকৃষ্টির চরম নিদর্শন হিসাবে। পিকাসো তাঁর কাজে দেখাচ্ছেন ঐতিহাসিক সত্যকে। তাঁর রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতিতে পরিচালিত সমাজের পচনশীল ও গলিত রূপ।'

জিজ্ঞাসা করলাম, পিকাসোকে তাঁর শিল্পের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা কেউ জানিয়েছে কিনা এবং তিনি এ-মতকে সমর্থন করেন কিনা।

সে বলল, 'তাঁকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি। তিনি যে ডেকাডেন্স-প্রসূত, তাঁর মোহবিস্তৃত জালের বাইরে যে জ্ঞানের পুঞ্জ তৈরী হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাবেন কিনা সন্দেহ।'

বললাম, 'একই মস্তিষ্ক কমিউনিজমকে বুঝে পছন্দ করবে, অথচ শিল্প প্রকাশের বেলায় তাকে আড়াল করে ডেকাডেন্টের পচনক্রিয়ার রূপ দেখাতেই কেবল মত্ত থাকবে এ কি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা? অবশ্য পিকাসোর চিত্রকে নিয়ে যতগুলি ব্যাখ্যা শুনেছি তার কোনটারই খুব পরিস্কার ও বোধগম্য ভাষা নয়। অনেক সময়ে ব্যাখ্যাকারীরা তাঁর রচনাকে উপলব্ধি করেছেন কিনা সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ হয়। মনে পড়ে একবার পিকাসো-বিশেষজ্ঞ এক শিল্প-সমালোচককে প্রাইভেট কালেক্শনের একটি অপরিচিত পিকাসো-চিত্রের প্রতিলিপি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ ছবি তাঁর কেমন লাগে। তাঁর স্বাক্ষরটীকে ঢেকে রেখে চেয়েছিলাম জানতে তিনি পিকাসোকে কতখানি চিনতে পারেন নাম না দেখে। তিনি বললেন, এটি কোন পিকাসোর নকলকারী অপারগ শিল্পীর অক্ষম শিল্পপ্রচেষ্টা। ছবিটির রঙের ও অবয়ব সমন্বয়ের শত ত্রুটী দেখিয়ে তার শ্রাদ্ধ করে যখন তিনি আপন শিল্পজ্ঞানের কসরতে উৎফুল্ল, তাঁকে পিকাসোর স্বাক্ষরটি দেখালাম। ইন্ধনে ঘৃত নিক্ষেপে আগুন যেমন সহসা লেলিহান হয়ে ওঠে, তিনি একযোগে, শ্লেষের খরতা আক্রোশের দহন ও ঘৃণার বিষকে উদগার করে বললেন, 'ম্যঁসিয়ো এটি অতি নিম্নস্তরের উপহাস' তারপর একটি দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ আমার উপর নিক্ষেপ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

'পিকাসোর চিত্র সম্বন্ধে একটি চলিত অভিমত হচ্ছে যে তিনি আজকের জগতের কপট রসজ্ঞদের উপহাস করবার জন্যে এই আপাত-গূঢ় চিন্তামূলক দুর্জ্ঞেয় শিল্পসৃষ্টির ছলনা করেছেন। বোধহয় একদিন তিনি এই মূঢ়দের ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন তাদের জানিয়ে যে, এ পর্যন্ত তারা তাঁর যে ছবি থেকে আবিষ্কার করেছে যে-সব সাধারণের অবোধ্য নিগূঢ় অর্থ সেগুলি আসলে অর্থহীন নকশার হিজিবিজি মাত্র। অবশ্য তখন তাঁর এই মত প্রকাশে হয়ত তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে গারদে পঠিয়ে দেবে।'

এইলাস বলল, 'আচ্ছা আমার মত না হয় তোমার পছন্দসই হল

না তোমার নিশ্চয়ই পিকাসো সম্বন্ধে একটা অভিমত আছে, সেটা আমাকে শুনিয়ে দাও, তুলনা করে দেখি কোনটা গ্রহণযোগ্য।'

বললাম, 'পিকাসোর সঠিক ধারণা ও সার্থকতা হবে আজ নয়, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী দিনে যখন তাঁর শিল্পের সামনে পড়ে যাবে অনেকখানি জমি যেখানে দাঁড়িয়ে দূরে থেকে কেবল নজরে পড়বে তাঁর রচনাসম্ভারের সারাংশটুকু। আমার ভাস্কর-বন্ধু সেবাস্তিয়াঁ তাঁর সম্বন্ধে একটা ঘটনা সেদিন বলল যার থেকে পিকাসোর সত্য স্বরূপের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া গেল।

'সেবাস্তিয়াঁ দক্ষিণ ফ্রান্সে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকাকালীন পিকাসো এসে হলেন সেখানে অতিথি। সকালে প্রাতরাশের টেবিলে কফি পাত্রে ভরবার আগে পিকাসো পেয়ালাটা নিয়ে হেলিয়ে কাত করে, উল্টে নানাভাবে ছেলেখেলা করছিলেন হঠাৎ উঠে নিয়ে এলেন এক তাড়া ড্রয়িং কাগজ, এবং আঁকতে শুরু করলেন পেয়ালাটা।

'প্রথম স্কেচে পেয়ালাটার ঠিক স্বরূপ ধরা পড়ল কিন্তু যেমন তিনি আরও শীটের পর শীটে নতুন নতুন নকশা করতে লাগলেন পেয়ালার বাস্তব রূপ ক্রমান্বয়ে বদলাতে লাগল। শেষে যেন সেটা মানবীয় সত্তা পেতে আরম্ভ করল। তার পরিবর্তিত আকৃতিতে উঁকি মারতে লাগল মানুষের মুখ; ফুটে উঠল নারীর একটি সুপুষ্ট পয়োধর ও উরুস্থান ও তার কেন্দ্রে একটি অনিমীলিত চোখের বিস্তার; দেখাল সেটা যেন মুখব্যাদান করে কফি পানার্থে উদগ্রীব।

'এরপর তিনি সব ড্রয়িংগুলিকে তাল পাকিয়ে ফেলে দিয়ে কফি পানে রত হলেন।

'সেবাস্তিয়াঁ অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল পিকাসোর এই শিল্প-ব্যায়াম। তার মনে হল যে, যেমন অনেক মানুষ মস্তিষ্কের কোন স্থান আলগা হওয়ায় ক্রম-চলমান ও বিবর্তিত মনের চিন্তাধারাকে অবিরাম মুখে বলে চলে তিনি যেন তাদেরই মত মুখে না বলে তা চিত্রের রূপে প্রকাশ করে গেলেন।

'পেয়ালাটার আকৃতি ও তার উপরের আলো ও ছায়ার খেলা তাঁর মনে এনেছিল এক শিল্পধারণা এবং তাকে রূপ দিয়ে সে ধারণাকে পূর্ণ না করতে করতে তাঁর মন ছুটেছিল আরও কত স্মৃতির খাতায় জমা নানা মানুষ, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও রঙ-বেরঙের কুহেলিকার হট্টগোলের পিছনে।

'এই জন্যই বোধ হয় তাঁর রচনাগুলিকে দেখায় না দীর্ঘচিন্তা ও বিচারনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে। প্রায় অসংলগ্ন—স্রোতে ভাসা খড় কুটো যেমন কিনারায় ভেসে জড়ো হয় তেমনি তাঁর মনে, না-থেমে যাওয়া নানা ছাপের অসংস্কোচ ভিড়, তাঁর ছবিতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

'কেউ কেউ হয়ত বলবে যে, এ ব্যাখ্যা একটু নুন জল সমেত গিলে ফেলা সহজ কিন্তু তোমার পিকাসো সম্বন্ধে অভিমত কারুর গলা দিয়ে নামবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

'বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় শিল্পীরা তাঁদের দৃষ্টিকে বাস্তব বাহ্য স্বরূপের খাঁচায় বেঁধে তারই আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন মনের রাজ্যের মুক্ত সীমানাবিহীন—ইচ্ছামত সংকোচিত ও সম্প্রসারিত করা চলে এমন বন প্রান্তর ও প্রাঙ্গণকে; সোনা রুপো হীরে মাণিকের ফুলপাতাভরা গাছকে; অভিনব মানুষ ও জীবকুলকে, যাদের কোনদিন দেখতে পাওয়া যাবে না চর্মচোখের দেখা পৃথিবীতে।

'বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাহ্যদৃষ্টির চশমা যেন ভেঙে যাওয়ায়, শিল্পীরা উদ্দাম পাড়ি দিয়েছেন সেই মনের মুক্ত জগতে এবং বাস্তব জগত যেন সরে গেছে বহুদূরে ও দৃষ্টির বাইরে। এই পথে অভিযাত্রী শিল্পীদের রথের পুরোভাগে চড়ে বসেছেন পিকাসো। তাঁর পিছনে তাঁর আবিষ্কৃত যে কল্পনা পড়ে রইল তাকে মনে ধরতে, ছুঁতে হলে, সামনে দেখা বাস্তবের অতি নির্দিষ্ট আকারগুলিকে ভুলে অন্তরের বিস্তারে খেয়ালের ঘোড়ায় চড়ে তাঁরই পথে কদম চালিয়ে দিতে হবে।'

এইলাস বলল, 'তোমার পিকাসো সম্বন্ধে প্রতি কথাটিই প্রমাণ করছে যে তিনি পচনশীল ডেকাডেন্টের প্রস্তুকসিয় (production)। প্রত্যেক শিল্পীর কর্তব্য হচ্ছে সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করবার মত শিল্পের রূপ-প্রচেষ্টা। তুমি কি বল যে, যারা আজকের রাষ্ট্রে নিম্নস্তরে বাস করে তাদের জীবনে শিল্পের স্থান নেই বা তাদের উন্নততর শিল্পবোধকে জাগ্রত করার প্রয়োজন নেই ?'

বললাম, 'বন্ধু, তোমার নিজের মতকেই সমর্থন করে পূর্বেই বলেছি এই নবতন্ত্রের শিল্পপ্রচেষ্টায় 'উন্নততর' কথাটা আজকের মাপকাঠিতে ব্যবহার করা চলবে না।'

সে বললে, 'তা হলে তোমার এই আইভরি টাওয়ারের অধিবাসী শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে কাপিতালিস্ত্ ফ্যাসিস্তদের সমর্থন করে চালাবে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি অত্যাচার লুণ্ঠন ও অবিচার।'

বললাম, 'না বন্ধু, আমি সমাজের ও রাষ্ট্রের কোন অবিচারী ও অত্যাচারীকে সমর্থন করি না। কিন্তু এও আমি মানতে রাজী নই যে তোমার ভাগ করা শ্রেণীর একটি বাদে আর বাকি ক'টায় কেবল আছে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারীরা।

'যাদের তুমি বল আজকের সমাজে নিম্নস্তরের লোক, তাদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগান বা তাদের শিল্পরসের অংশীদারী করা, তা কি বাকি স্তরের লোকগুলিকে জাহান্নামে না পাঠিয়ে সম্ভব হবে না ? আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে তাদের সকলের সঙ্গে সমান সৌন্দর্য-ভোগের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রবিধির উৎসন্ন চেষ্টার চেয়ে কার্যকরী উপায় হবে প্রত্যেক নগরে নগরে সাধারণ শিল্প-সংগ্রহশালার ব্যবস্থা ও প্রত্যেক বিদ্যায়তনে শিল্পদর্শন ও উপলব্ধির সুযোগ ও শিক্ষার ব্যবস্থা। তুমি এ স্বীকার করতে বাধ্য যে ফ্রান্সে এ সম্বন্ধে লোকেরা বেশী সুযোগ পাওয়ায় এ দেশে শিল্পে রসগ্রাহীর সংখ্যা সর্বস্তরে এমন কি শ্রমিক চাষীদের মধ্যেও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী।'

এইলাস আমার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে জানাল যে ক্যাপিটালিস্ত ও বুর্জোয়ারা জন্মগত স্বার্থপর এক্‌স্‌প্লয়টার। তারা নিম্নস্তরের শ্রেণীকে কোনদিন নিজেদের সুখভোগের ও বিত্তার একরত্তিও ভাগ দেবে না। উচ্চাঙ্গ শিল্পের রসাস্বাদ কেবল তাদের শ্রেণীর মধ্যেই রেখে দেবে।

বললাম, 'তোমার মতবাদে এইবার গোলমাল এসে যাচ্ছে ভ্রাতা। সাধারণগ্রাহ্য অথচ উচ্চতর শিল্প এ তোমার নবতন্ত্রী দেশেও হওয়া কঠিন!

'আরও বলি যে, তোমার এই ব্যাপক কয়টি শ্রেণীবিভাগে বেশ কিছু খুঁত রয়ে গেছে। কারণ দেশ অনুযায়ী ধনী ও দরিদ্রের স্তরে মনোবৃত্তিতে ও আচরণে বেশ কিছু তফাৎ দেখা যায়। আরও তোমায় বলি যে, আমাদের দেশে একশ্রেণীর লোক আছে, তারা রুটি পাবার জন্যে লড়াই করে না, তাকে ত্যাগ করার জন্যে তৈরী করে তাদের দেহ ও মনকে। তাদের অস্তিত্ব হয়ত রুটি-সন্ধানী লোক-সমুদ্রে খুঁজে দেখতে গেলে লাগে দূরবীণ, কিন্তু তাদের আদর্শ ও বাণী যেন বহু বাহু বিস্তার করে জনগণকে বেষ্টন করে আছে। তাদের অনেকে নিজের সুখ ও পার্থিব সম্পদকে ত্যাগ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে।

'তুমি বোধহয় রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শোন নি, এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' নীতিকে মুখ্য করে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, পল্লী-উন্নয়ন, ধর্মপুস্তক-প্রকাশ প্রভৃতি মানব কল্যাণের প্রতিষ্ঠানগুলি। তোমার রাজনৈতিক আখ্যার কোন্ তালিকায় তাঁদের ফেলবে?'

সে বলল, 'তারা প্যারাসাইট্‌ ও এক্‌স্‌প্লয়টার—অনধিকার চর্চা করছে। তাদের পরোপকারের অছিলায় ধর্মভণ্ডামীর প্রচার চেষ্টার জন্য, সত্বর তাদের নিপাতের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে সে ব্যবস্থা করার আগে তাদের এই সংঘকে সাম্যবাদ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত

করা যায় কিনা তার একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। তোমার কথায় মনে হচ্ছে, এই ধর্মান্ধদের খানিকটা সংগঠন করবার সামর্থ আছে। তাদের প্রচারের দ্বারা প্রোলেতারিয়াত্ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কী, তা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে দু একজন যারা উচিত-রাষ্ট্রবিধির জ্ঞানে সহজে সচেতন হতে পারে তাদের সে ভাবে তৈরি করে, বাকি জ্ঞানহীনগুলোকে তাদের জিম্মায় মানুষ করবার ব্যবস্থা করতে হবে*।'

হেসে বললাম, 'কি প্রচার করে ও কি বলে, তুমি ভাঙবে তাঁদের বিশ্বাস ও সৎকর্মের ধারণা? পরের মঙ্গলে সর্বত্যাগী তাঁরা, কোন্ যুক্তি দিয়ে প্রলুব্ধ করবে তাঁদের, তোমার সাম্যবাদ গ্রহণ করতে? তাঁরা প্যারাসাইট্ হলেন কি করে? তাঁরা তো কেবল ধনীর অর্থ সংগ্রহ করে বিলিয়ে দিচ্ছেন গরীবদেব হাতে, তাদের জীবন উন্নয়নে।'

সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি বলি, এটা তাদের অনধিকার চর্চা। এ কাজ করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রনিয়ন্তা দলের, ভগবান-বেচা লোকেদের নয়, এরা সব ভগবানে বিশ্বাসী লোকদের ধর্মের নেশায় বিহ্বল করে সফল করছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি।'

বুঝলাম এইলাসের ধারণায়, তার মত ও যুক্তি ছাড়া আর কোন পথ প্রণালী শোনবার বা গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয়।

তবুও বললাম, 'আমি সে—ভগবানে বিশ্বাস করি না যাকে প্রার্থনার ঘুষ দিয়ে সুখ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু অশ্রদ্ধাও করি না, যারা এইভাবে ভগবানে বিশ্বাস করে, মানুষের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করে। ভগবানই বল, আর মার্কসের রাষ্ট্রনীতিই বল, আপন জীবন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে দৃঢ় বিশ্বাস, যার উপর নির্ভর করে বিনা বিচার ও প্রশ্নে গ্রহণ করা যেতে পারে কতকগুলি নীতিকে, জীবন-সমস্যার প্রয়োজনে একান্ত উপায় হিসাবে। তাই হয়ে যায় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও বা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত ভগবানের বাণী, দার্শনিকের গভীর চিন্তা, বিচার ও মীমাংসাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র

পরিচালনা: দক্ষ নেতার অনুশাসন বাণী। অনেক যুগ ধরেই মানুষ জেনে ফেলেছে মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্বরূপকে। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ, ন্যায় ও অন্যায়ের উপলব্ধি; কেবল ব্যবহারিক জগতে তার সঠিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের বাঁধন ও রাষ্ট্রের নিয়ম। প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতির বা সমাজনীতির উদ্ভবে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও সাধারণের মঙ্গল কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত আত্মাভিমান ও স্বার্থ সাধারণের মঙ্গলার্থে উচিত নীতি ও পথকে করে দিল বিকৃত। কি করলে সকলের মঙ্গল ও শান্তি হবে তা বোধহয় বলা খুব কঠিন নয়, কেবল তার কার্যকরী প্রয়োগপন্থা খুঁজতেই ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি উঠছে ও নামছে যুগে যুগে। বর্তমানের সাম্যবাদ সেই তরঙ্গভঙ্গেরই একটা ঢেউ। এবং এটাকে শেষ ও একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ পথ বলে মেনে নেওয়া যাবে কিনা, মানব সমাজে এর ব্যবহারের মেয়াদই তার প্রমাণ দেবে। আমার মনে হয়, মানব সমাজের মনের হাসি ও কান্না, রাগ, দ্বেষ-ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা, প্রেম ও বিরহ প্রভৃতি আদিম অনুভূতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের বন্ধনে কিছু না কিছু ফাঁক থেকে যাবেই। সমাজ ও রাষ্ট্রে যাতে বিশৃঙ্খলতা না আসে তার জন্য অতীত ও বর্তমানের চেয়েও উন্নততর পথ মানুষ অবশ্য খুঁজতেই থাকবে এবং এ বিষয়ে তোমার ও আমার মধ্যে কোন মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।'

এইলাস যেন আমার সব কথা ভাল করে শুনল না। তার জবাব এল, 'যখন দেখলেই এসব ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক পন্থায় সন্তোষজনক রাষ্ট্র বা সমাজ গড়ে উঠল না এত যুগ ধরে, তখন সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া উচিত। যখন মূল খুঁটিতেই ঘুণ ধরে, কুটিরের চালে নতুন খড় দিয়ে লাভ কি? তাকে ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া উচিত দৃঢ় ভিত্তি ও শক্তিময় খুঁটিতে ভর করা নতুন আশ্রয়।'

আমি বললাম, 'তোমার প্রণালী গ্রহণ করলে, ইতিহাস বলে আর

কিছু থাকবে না। ধ্বংস-হস্তের মার্জনায় অতীতের কৃষ্টি ও জীবনের স্মৃতির যা-কিছু অস্তিত্ব আছে তাকে ঘুণ-ধরা বলে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করেই কি নতুনের বোধন হওয়া উচিত ?'

তার মতে শুনলাম যে যাকে আমরা জানি ইতিহাস হিসাবে তার কিছুটা ছেঁটে বাদ দিয়ে বদলে কিছু আধুনিক মতবাদের প্রলেপ দিয়ে নতুন না করে নিলে সাম্যবাদী সমাজে তা গ্রহণীয় নয়।

ইতিমধ্যেই ইয়ানিনা আসায়, আমাদের আলোচনাকে ওইখানেই ইতি করতে হল। সে বলল, 'কি এইলাস, তোমার রাজনৈতিক তর্কজালে এ বেচারীর মাথা বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টায় আছ? মিরকো আমাকে এইমাত্র জানাল, তুমি নাকি ওকে বলেছ, ওদের সেণ্ট আর ইয়োগীদের সব লিকুইডেট করা উচিত! তুমি তো স্টেট্‌-এর লিডার্‌সিপ্‌ চাও। এই ভারতীয় সাধুদের লিকুইডেট করবার পন্থা না খুঁজে তোমার উচিত ওদেশে গিয়ে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। ভেবে দেখ, সুবিধা হবে যৌবনকে বহুকাল ধরে রাখতে, আগুন খেতে পারবে জলের মত, মাটিতে কবরস্থ হলেও একমাস পরে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসতে পারবে—সুখশয্যায় একরাত সুনিদ্রা দিয়ে আসার মত। তারপরে বিষ এ্যাসিড, ভাঙা কাঁচ, পেরেক খেতে পারবে মিঠাই খাওয়ার মত সহজে কিংবা বিনা আহারেও বিষাক্ত সরীসৃপের সান্নিধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে ছেলেখেলা হবে।'

এইলাস্‌ একেই বিরক্ত হয়েছিল, বেশ-জমে-ওঠা বাক্যালাপে বাধা পাওয়ায়, তার এই বক্রোক্তিতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, 'কুল্যাক্‌-এর মেয়ের আর কত বুদ্ধিই বা হবে! চিরকালই তো তোমরা গরীব শ্রমিক ও চাষীদের রক্ত শুষে অলস বেলা কাটিয়েছ, এই সব গাঁজাখুরি গল্প করে।'

বড় আহত হল ইয়ানিনা। তাকে এত তীব্র আক্রমণের কোন কারণই দেখলাম না। সে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে বেশ হালকা ভাবে হেসে আমায় বললে, 'তোমাদের দেশে সকলেই তো

একটু আধটু ইয়োগী। তুমি ওকে সম্মোহন করে, ওর সপ্তমে চড়া মেজাজটা একটু নামিয়ে দিতে পার না?'

তাকে জানালাম, 'আমাদের সাধুরা ইয়োগ করলেও, তাদের উদ্দেশ্য নয় এই রকম ভেলকি দেখিয়ে বেড়ান।'

সে জিজ্ঞাসা করল 'তবে তারা করে কি?'

এইলাস বলল, 'আমার বন্ধু এইমাত্র জানালেন, তারা আগে করত ধর্মের ভণ্ডামী, আর এখন তারা লোকসেবার অছিলায় রাষ্ট্র শাসনের খেলার অভিনয় করছেন।'

ইয়ানিনা তার মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, 'তোমাদের ইয়োগীদের সম্বন্ধে আমার ভাল করে জানবার অনেকদিনের ইচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই তাদের সংস্পর্শে এসেছ? আমাকে বলবে তাদের কথা?'

বললাম, 'মাদ্‌ম্যয়জেল, জীবনে একটি ইয়োগীর কথাই আমার বিশেষ করে মনে আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে—

'কৈশোর থেকে যৌবনে আসার মাঝপথে আমাদের মনে হয়ে যায় একটা বিভ্রাট। রাজপুত্তুর রাজকন্যার সাততলা প্রাসাদের আনাচে কানাচে খুঁজত যে মন, ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগাবার সোনার কাঠিটিকে, কিংবা পাতালের গোপন কুঠুরী আবিষ্কার করে দৈত্যদানোর প্রাণ-রাখা শুক পাখীর গলা টিপে, বন্দী রাজকুমারীকে মুক্তি দেওয়ার বাহাদুরী, সেই মিঠে স্বপ্নগুলিকে খান খান করে আসে বাস্তবের বার্তা। এই সময় আমাদের কারোর বা মন হয়ে যায় উদাস, কারোর বা তিক্ত ও ক্ষিপ্ত। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমি উদাসীন হয়ে একবার চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতে মাইশোরের রামকৃষ্ণ মিশনে। এই আশ্রমে আমার কাজ ছিল আগন্তুক অতিথিদের সুখ সুবিধার তত্ত্বাবধান।

'তখন শীতকাল। স্থানটি অধিত্যকার উচ্চতায় বেশ কিছু ঠাণ্ডা। আশ্রমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রাঙ্গণ শুভ উচ্চারণে মন্ত্রিত করে উপস্থিত হলেন এক সাধু। প্রায় ছ ফুটের উপর লম্বা এক বিরাট

পুরুষ। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে পরিধানের বালাই ছিল না। কেবল একটি ব্যাঘ্রচর্ম বাঁ কাঁধ থেকে সামনে ঝোলান থাকায় লজ্জা নিবারণ হচ্ছিল। কারণ দিগম্বর সাধুজী যে লজ্জা ও শরমের বহু ঊর্দ্ধে পৌঁছেছেন তাতে আর কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি অনুমতি চাইলেন আমাদের আশ্রমে তিনদিন কাটাবার। আমাদের আশ্রমের অধিনায়ক স্বামীজীকে সাধুজীর উপস্থিতি সংবাদ দিলে, তিনি নির্দেশ দিলেন যে অতিথিদের থাকবার একটি ঘর পরিষ্কার করে তাঁকে থাকতে দেওয়া হোক। সাধুজীকে ঘরের কথা বলতেই তিনি জানালেন যে তাঁর কোন সাধারণ আবাসগৃহ আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। উন্মুক্ত আকাশই তাঁর আবাসের আচ্ছাদন। সামনে প্রাঙ্গণে একটি নাগ-কেশর গাছের তলা দেখিয়ে বললেন, 'ওইখানেই তিনরাত্রি আমাকে থাকতে দিলে আমি খুব খুশী হব'।

'স্বামীজীকে এ সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বিপদ! এখন তাঁকে দিতে হবে আধ ডজন কম্বল এবং তাঁর সামনে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবারও ব্যবস্থা করতে হবে'।

'সাধুজীকে এ বিষয়ে জানাতেই শশব্যস্তে আমাদের নিরস্ত করলেন তাঁর সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় অযথা উদ্ব্যস্ত হতে। কারণ তাঁর কম্বল কিংবা আগুনের কোন প্রয়োজন নেই। আহারের কথায় বললেন যে, সে রাত্রে তারও প্রয়োজন নেই কারণ তিনি একাহারী, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাঁর দৈনিক একান্নভোজন সম্পন্ন হয়ে গেছে।

'এইবার আশ্রমের স্বামীজী বেরিয়ে এলেন সাধুজীকে স্বাগত জানাতে। আশ্রমের দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তার সুবিধা নিয়ে বহু ভণ্ড সাধুই মাঝে মাঝে আশ্রমে থাকবার চেষ্টা করত। স্বামীজী প্রথমে ভেবেছিলেন, ইনি বোধহয় তাদেরই একজন। স্বামীজী ও সাধুজীর স্বাগত পরিচয় হল শুদ্ধ সংস্কৃতে। যদিও স্বামীজী সংস্কৃতে নামকরা পণ্ডিত তবুও সাধুজীর ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে তিনি প্রতিহত হয়ে গেলেন।

'পরদিন সকালে সাধুজীর পরিচর্যায় আমি হাজির হলে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে যদি আমি শহরটি দেখিয়ে দি। পথে চলতে আমাকে সাধুজী প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এই অল্প বয়স, এই বৈরাগীদের মাঝে এসে তুমি কি করছ'?

বললাম, 'হঠাৎ মনে কিছু আর ভাল লাগল না, তাই চলে এসেছি এদের মধ্যে। এদের জীবনধারাকেই মনে হয় সবচেয়ে শ্রেয়।'

সাধুজী নিষেধের তর্জনী নেড়ে বললেন, 'কখনও এ কাজ কোর না। তুমি জান, তোমার আশ্রমের অধিবাসীরা কেন সাধু হয়েছে?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'কারণ এরা সাংসারিক জীবনে ঘা খেয়ে, পরাস্ত হয়ে হয়েছে বৈরাগী। তুমি তো বালক মাত্র। সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই তোমার হয় নি। তবে তুমি কেন শখ করে এদের মধ্যে আসবে? গেরুয়া দেখেই মনে কোর না, এদের মনে আছে কোন রঙ। বেরঙা জীবন এদের সব সুরহীন ও বিস্বাদ।'

সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তিনি কেন হয়েছেন সাধু?

বললেন, 'ভেইয়া সংসারে হার মেনে দুঃখ পেয়ে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাহলে আপনিও কি এখন এদেরই মত বেরঙা সুরহীন ও বিস্বাদ?'

সাধুজী বললেন, 'না, তা ঠিক নয়। বৈরাগ্য নেওয়ার পর অনেক বছরই ওই অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু ক্রমে দেখতে পেলাম, জগতের চারিদিকে রঙের ছড়াছড়ি, শুনতে পেলাম বহুবিধ সুর, আস্বাদন করলাম বহু মিঠে স্বাদ। তারপর এই দেহের খোলটা সেইরূপ শব্দ ও স্বাদের রত্ন দিয়ে ভরতে শুরু করেছি।'

বললাম, 'এরাও যে সে রঙ সে সুর ও মিঠে স্বাদের সন্ধান পায় নি, তা আপনি জানলেন কেমন করে?'

তিনি বললেন, 'একটা রঙিন কাপড়ের আড়াল দিয়ে ওরা সে সবের থেকে নিজেদের তফাৎ করে রেখেছে। ওদের জীবনের

যে উদ্দেশ্য তাকে অর্জন করতে গেরুয়া ও সাদা কাপড়ের তফাৎ করবার দরকার হয় না। তুই যদি সমাজ সেবাই করতে চাস্ তো, বাড়ি ফিরে যা। আর যতক্ষণ সংসার তোকে মেরে ঘায়েল করে না দেয়, কাজ করে যা আপন মনে। জানিস, একটা টক আমের আঁটি যদি সার-ওলা জমিতে পুঁতে গাছ বানাস, তাতে বড় বড় শাঁসাল সুপুষ্ট ফল হলেও কেউ তা খেতে চাইবে না। কিন্তু মিঠে আমের আঁটির গাছ, সারহীন জমিতে পড়ে অনাদরে বর্দ্ধিত হলেও যখন ফলাবে ফল, ছোট হলেও লোকে আসবে লুট করে নিতে। ওই আমেরই মত যদি তোর আঁটিতে টক থাকে, তাহলে এই সাধুদের মধ্যে থাকলেও তুই হবি না মিষ্টি, উলটে তোর সঙ্গ পেয়ে এদের কেউ কেউ টকে যেতে পারে। আর তুই যদি মিঠে আঁটিরই আদমি হোস, তাহলে তুই যেখানে যেমন করেই থাকিস, সবাই পাবে তোর মিষ্টত্ব।'

'বেশ লাগল তাঁর কথাগুলি। সাধুজী চলে যাবার পরের দিন, আশ্রমের স্বামীজীকে বিদায় জানিয়ে আমিও ফিরে গেলাম বাড়িতে। তারপর এমন কোন সাধুসঙ্গ লাভ জীবনে ঘটে নি, যা আমার মনে এমন ভাবে দাগ বসাতে পেরেছে। তিনি আমাকে ইয়োগ করতে বলেন নি যৌবনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখবার উদ্দেশ্যে, অথবা আগুন বিষ কাঁচ ও পেরেক খাওয়ার অমানুষিক ক্ষমতা অর্জনের পথও বলেন নি। শুধু বলেছিলেন, 'জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, সাচ্চা ও ভাল হওয়া।'

এইলাস একটা বিদ্রূপসূচক শব্দ করে বলল, 'যত সব বুজরুকি। এই অমানুষিক ক্ষমতা সমাজে অর্জনের প্রয়োজন হলে আমাদের সাইন্স শিগগিরই এর সহজ উপায় আবিষ্কার করে দেবে।'

বললাম, 'কামারাদ্, সবই পারবে হয়ত সাইন্সের দ্বারায় আয়ত্ব করতে কিন্তু টক আঁটির গাছে মিষ্টি আম ফলাতে পারবে কি না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এক হতে পারে যে সাইন্সের দ্বারায়

আমাদের মিষ্টিকে ভাল-লাগা বদলিয়ে হয়ত টকের অনুরক্ত করতে পারে।'

ইয়ানিনা যাবার জন্যে উঠে পড়ায় আমরা সকলে বিদায় নিলাম সেদিনের মত। রাস্তায় যেতে যেতে ইয়ানিনা বলল, 'তোমার কাছে আশা করেছিলাম, ইয়োগীদের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনব কিন্তু তুমি যেন চার্চ-এর পুলপিট্ দেখিয়ে আমাদের নিরাশ করে দিলে। আর সবচেয়ে খারাপ লাগল যে এইলাস্ এখন দয়া মায়া ও সহানুভূতিহীন এক ম্যানিফেষ্টোতে পরিণত হয়েছে।'

স্টেফান

এই ছাত্রদলের মধ্যে সবচেয়ে চুপচাপ থাকত স্টেফান। অথচ তাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রোলেতারিয়েতের দাবীর সে-ই ছিল একমাত্র অধিকারী।

তার জন্ম এক পাদুকানির্মাতার পরিবারে। স্কুলে পড়াশুনায় উচ্চস্থান পাওয়ায় সরকারীবৃত্তি দিয়ে তাকে পারীতে পাঠান হয়েছে এঞ্জিনিয়ারিং শিখবার জন্য।

স্কুলে পড়ার সময় তার পিতাকে জুতো তৈরীর কাজে সাহায্য করার কাজেও স্টেফান বেশ নিপুণ ছিল।

একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম, 'যখন অন্যেরা তার শ্রেণীর দাবি জানিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেয় সে কেন তার মতামত না জানিয়ে চুপ করে শুনে যায়।'

সে বলল, 'দেখ আমি পাদুকা-নির্মাতার সন্তান। সরকার আমার প্রতিভা দেখে বৃত্তি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে। আমি কোন মুখে তাকে জাহান্নামে পাঠাবার প্রস্তাবকে সমর্থন করব? এইলাস বলে যে, আমাদের শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলেকে এই সুযোগ

দেওয়া হোক। আমি স্বীকার করি যে, সকল শ্রমিক-সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু বিশেষ প্রতিভাবানকে পরিপূর্ণতা অর্জ্জন করতে বৃত্তি দেওয়া উচিত কেবল তার যোগ্য অধিকারীকে—সে সাম্যবাদী রাষ্ট্রেই হোক বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেই হোক।

'এইলাস গলাবাজি করে আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে শ্রেণীবিহীন শ্রমিকদের এক সুখের রাষ্ট্র গড়তে তার জীবন উৎসর্গ করেছে কিন্তু এই সব আপাতবিশুদ্ধ সাম্যবাদীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আপন অভিসন্ধিতে ব্যর্থ স্বার্থান্বেষীদের ছদ্মবেশ। এদের মুখ থেকে শুনতে পাবে যে মিড্‌ল-ক্লাস থেকে তৈরী হয় রেভলিউশনের নেতারা। কাজেই এইলাস বা তার শ্রেণীর লোকেরা ধরে নেয় যে এই নবতন্ত্রের যজ্ঞে তারাই নিয়মক্রমে স্বনির্বাচিত পুরোহিত।

'আমি সাম্যবাদকে স্বীকার করি কিন্তু এই মোড়লদের দেওয়া ব্যাখ্যাকে সব সময় গ্রহণ করতে পারি না। আমার মনে হয় খ্রাইষ্ট কেবল এইটে বলতে চেয়েছিলেন যে সকলে মানব-সমাজে সদিচ্ছা ও সৎ আচরণে প্রবৃত্ত হোক। কিন্তু তাঁর উপদেশ-অবলম্বীরা আপন মত ও পথের ভেজাল মিশিয়ে গির্জা বানিয়ে লোকের সামনে তুলে ধরেছে চিরস্বর্গবাসের সুখস্বপ্নের এক মরীচিকা এবং তাই দিয়ে কত শতাব্দী ধরে ভুলিয়েছে কত কোটি কোটি লোকদের এবং এখনও ভোলাচ্ছে। নবরাষ্ট্রবোধনের সুযোগ পেয়ে বহুজন সেজেছেন সাম্যবাদের খ্রাইষ্ট এবং তাঁরা সশিষ্য শ্রমিকদের সুখরাজ্যের এক স্বপ্ন দেখিয়ে চান যাতে আমরা তাঁদের কথামত বসি ও দাঁড়াই। এইলাস বলে, শ্রেণীহীন শ্রমিকরাষ্ট্রের কথা কিন্তু তার কথামত শ্রেণীহীনরাষ্ট্র হওয়া অসম্ভব। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন শাসন-নিয়ন্তা ও শাসন-নিয়ন্ত্রিতদের বিশেষ স্তর এবং সেই স্তরভেদে উদ্ভব হবে বিভিন্ন শ্রেণীর। তার নামে ও ব্যবহারে হয়ত কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু শ্রেণী বহুলতা সমাজে থাকবেই।

'আর সে যে বলে ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী-প্রবৃত্তিকে নাশ করতে হবে তাও অসম্ভব চেষ্টা, কারণ একজনের অধিকারের যে প্রবৃত্তি বহুজন অধিকারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে নিজেকে অংশভাগী মনে করবে। কাজেই আপন অধিকারের পরিমাপ হয়ত কমবেশী হতে পারে কিন্তু ধনসম্পদ করায়ত্ত করার প্রবৃত্তি স্বতঃজাত, তাকে বদলাতে গেলে আমাদের মানব প্রকৃতিকে অন্যরকম করতে হবে। যারা শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের বিজ্ঞাপন দেয় বা সম্পত্তি নিরভিলাষী নাগরিকের গুণকীর্তন করে তাদেরই মধ্যে আমি দেখতে পাই প্রচ্ছন্ন শ্রেণীর দাবি ও গুপ্ত স্বত্বাধিকারীর লালসা।

'এইলাসকেই ধর না। সে এসেছে পেতি-বুর্জোয়া পরিবার থেকে। সে এক সর্দারি ছাড়া অন্য পেশা নিতে প্রস্তুত হবে কি! সে বেছে নিয়েছে এমন কাজ যাতে তার শারীরিক শ্রম-প্রয়োজনকারী কর্মের প্রয়োজন না হয়। আমাদের মধ্যে কেবল একজনকে জানি, যে এই নবরাষ্ট্রের বোধনে যে-কোন কাজ করতে প্রস্তুত এবং যে কোন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভয় পায় না, এমন কি প্রয়োজন হলে মৃত্যুকেও একপাত্র মদিরাপানের মত সহজে বরণ করে নেবে, যদি তা তার জীবনাদর্শের পরিপূর্ণতায় প্রয়োজন হয়। সে হচ্ছে মিরকো। কিন্তু তার মত আদর্শ কর্মে দৃঢ়কল্প কর্মিদের গলা টিপে সরিয়ে দেয় নেতৃস্থানাভিলাষী শাসকের প্রচ্ছন্ন পদপ্রার্থীরা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, সে কি এইলাসের পার্টি সম্বন্ধে একনিষ্ঠতায় সন্দেহ করে বা তাকে কি সে মনে করে না সত্যিকারের সাম্যবাদপন্থী?

সে বলল, 'এইলাসের পার্টি বা সাম্যবাদের অনুরাগে কোন খাদ বা ভেজাল নেই কিন্তু কি উদ্দেশ্যে পার্টিকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং তার ভাবাদর্শ ও প্রণালীতে কোন ত্রুটি থেকে গেছে কিনা তার বিচার এবং প্রয়োজনানুসারে তার নীতির পরিবর্তনের কথায় এইলাসের মত অন্ধ ডকট্রিনেয়াররা মাথা ঘামায় না বা প্রশ্ন করে না।

'আজ সমাজে ও রাষ্ট্রে যে ডেকাডেন্সের থিসিস উপস্থিত হয়েছে তার ফলে এর পরিবর্তনের জন্য যে অ্যান্টিথিসিসের উদ্ভব হওয়া উচিত তার প্রতীক এরা নয়। এরা আর এক সুবিধাবাদী ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত কিন্তু গড়বার দায়িত্ব বা ক্ষমতা এদের নেই।

'এদের মধ্যে পার্টির সংগ্রামে বাঁচা মরার পিছনে উঁকি মারে অভিলাষ যে মরলে এদের নাম লেখা থাকবে শহিদদের তালিকার সর্বোচ্চে আর বেঁচে থাকলে এরা পাবে রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তাদের আসন।

'এদের মধ্যে অনেকেই পিতামাতা বা স্টেটের দেওয়া সহজলভ্য অর্থে হয়েছে আর্মচেয়ার পলিটিশিয়ান্। জীবনে দারিদ্র্য দুঃখের সম্মুখীন এরা হয় নি যে ভাবে আমরা—শ্রমিকশ্রেণী, তার পীড়ন সহ্য করে থাকি। দায়িত্বহীন ছাত্রজীবনে পলিটিকস এদের একটা অ্যাডভেন্চার্ মাত্র।

'এদের পার্টির অধিবেশন যেন সিনেমা বা ক্যাফেতে গিয়ে চিত্তবিনোদনের মত। এরা যদি সত্যিকারের অ্যান্টিথিসিসের অঙ্গ হয় তা হলে এদের উচিত বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখা এবং অযথা বাক্য ব্যয় না করে যতদূর সাধ্য নিজেদের স্ব স্ব বিদ্যায় নিপুণ হওয়া যাতে আজকের অর্জন-করা জ্ঞান আগামী দিনের নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় কাজে লাগে।

'আদর্শ প্রোলেতারিয়েত-রাষ্ট্র তখনই হবে সম্পূর্ণ যখন এই সব বুর্জোয়া-প্রসূত নেতৃবর্গকে সরিয়ে আমাদের শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নিয়ে নেবে। শ্রমিক রাষ্ট্রের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে হলে শুধুই যে ক্যাপিতালিস্তদের লিক্যুইডেট্ করার প্রয়োজন তা নয়, বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দিতে হবে। এইলাস যেমন বলে, কাঁটা-জঙ্গল কেটে সাফ করার মত তাদের সমাজ থেকে নির্মূল করতে হবে।

'তবে আমার ও এইলাসের এই লিকুইডেশনের পন্থায় বেশ কিছু মতদ্বৈধ আছে। তার লিকুইডেশনের ধারায় শুধু যে পরধন-শোষক,

শ্রমিক-উৎপীড়ক ও তাদের নায্য পারিশ্রমিক অপহরণকারীরা বিনষ্ট হবে তা নয় সেই সঙ্গে ওই কূলে জন্মে ও বর্ধিত হয়েও যারা উচিত কর্ম ও কর্তব্য পরাঙ্মুখ নয় এমন বহুজনও বিনষ্ট হবে। আলস্যে ও সম্পদে বর্ধিতদের জোর করে শ্রমিকজীবন অবলম্বন করান যেতে পারে না কারণ তারা হবে অকেজো শ্রমিক। কাজেই সবচেয়ে ভাল পন্থা হচ্ছে যে, যেমন তাদের প্রাসাদ ও সুখ-ঐশ্বর্যের নিদর্শনগুলিকে আমরা রেখে দিতে চাই মিউজিয়াম করে, তেমনি এদেরও বেঁচে থাকতে পারে এমন সঙ্গতি দিয়ে গত ঘুণধরা ডেকাডেন্ট রাষ্ট্রের দ্রষ্টব্য হিসাবে আমৃত্যু স্বতন্ত্র রেখে দেওয়া চলবে। এদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বংশধরদের শ্রমিক শ্রেণীতে এনে বিলুপ্ত করে দিতে হবে এদের পূর্ব অস্তিত্বকে।'

বললাম, 'অর্থাৎ বয়স্কদের জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও ছোটদের জন্য কারখানার ব্যবস্থা হবে।'

সে বলল, 'তা তুমি এ প্রস্তাবকে যে আখ্যাই দাও এদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না করলে শ্রমিকদের হিতকারী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে না। আমি দেখেছি এদের অনেকে আপন দুর্বুদ্ধিতে সব সম্পদ হারিয়ে যখন নিঃস্ব হয়ে পড়ে তখন এদের চেতনা হয় এবং দেখতে পায় ঐশ্বর্য আলস্যময় জীবনের অসারতা।

'আমার পিতার তৈরী জুতোর পুরনো ক্রেতা ছিল এক কাউন্ট। এককালে হয়ত তাঁর মত সম্ভ্রান্তের জুতো-তৈরী কর্মশালায় পদার্পণ স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে অপব্যয়ে ধনসম্পদ বঞ্চিত হয়ে কেবলমাত্র পৈতৃক আবাস ও পদবীর অধিকারী কাউন্টকে পয়সার হিসাব রেখে চলতে, পূর্ব আদব-কায়দাকে ছোট করে ফেলতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী একবার ভিয়েনায় গিয়ে কোন ধনী ব্যবসাদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে স্বামীর কাছে আর ফিরে আসেন নি।

'বেচারী কাউন্ট আমাদের কাজের ঘরে বসে আমার পিতার সঙ্গে পারিবারিক সব কথা স্বচ্ছন্দে বলে যেতেন যেন তিনি ও পিতা সমাজের সমান স্তরের লোক।

'কাউন্ট পিতাকে অনেক সময় বলতেন, কারেল, তোমার গৃহিণী-ভাগ্য ও সুখের পরিবার দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আমি এত অক্ষম না হয়ে যদি তোমার মত নিপুণ জুতোর মিস্ত্রী হতাম তা হলে আমার জীবন হয়ত তোমারই মত সুখ ও শান্তিময় হত।

'কাউন্টের একটিমাত্র আট বছর বয়সের ছেলে ছিল তাঁর নয়নের মণি। একবার তাকে আমাদের কর্মশালায় এনে পিতাকে বায়না দিলেন তার জন্য একজোড়া রাইডিং বুট তৈরীর।

'তিনি অবশ্য জানতেন তাঁর পূর্বপুরুষের বাছাই-ঘোড়াভরা আস্তাবল এখন শূন্য এবং তহবিলের ক্রম-সঙ্কুচিত অবস্থায় তাঁর' বংশধরের একমাত্র অন্নসংস্থান ছাড়া শিকার বা অন্য শৌখিন-খরচ করবার সঙ্গতি থাকবে না। কিন্তু ঘোড়ায় চড়বার সুযোগ হোক বা না হোক, পোশাক পরিচ্ছদে খানিকটা আভিজাত্য তো বজায় রাখতে হবে।

'কাউন্ট-পুত্রকে পিতা আপন পুত্রের মত স্নেহ করতেন। তাঁর সকল নৈপুণ্য দিয়ে তৈরী করলেন একজোড়া অপূর্ব রাইডিং বুট। বুট তৈরীর খবর পাঠান হলেও কাউন্ট আমাদের কর্মশালায় এলেন না বহুকাল। তাঁর কোন সংবাদ না পেয়ে শেষে আমার পিতা নিজে একদিন নিয়ে গেলেন জুতাজোড়া কাউন্টের বাড়িতে।

'কাউন্টের সাথে দেখা হতে তিনি তাঁর বিশীর্ণ ও বেদনাকাতর মুখ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, কাউন্ট আবার কোন চরম দুর্গতির কবলে পড়লেন।

'পিতার হাতে বুটজোড়া দেখে শোকরুদ্ধস্বরে তিনি বললেন, বন্ধু, আমার পিটারকে ওই জুতো পরাতে হলে তোমাকে স্বর্গ পর্যন্ত দৌড়তে হবে। তোমার মতন সজ্জন ব্যক্তি স্বর্গে যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু দেবদূতেরা মর্তের ওই বুট সমেত তোমায় সেখানে প্রবেশ করতে দেবে কিনা সন্দেহ।

'পিটারের মৃত্যুর সঙ্গে কাউন্টের প্রায় মৃত্যুতুল্য অবস্থা হয়েছিল এবং এই ঘটনা মর্মাঘাত করে আমার পিতাকেও করেছিল মুহ্যমান।

কাউন্ট বহু চেষ্টা করেও পিতাকে বুটের দাম গ্রহণ করাতে পারেন নি।

আমাদের কর্মশালার জানলার আলসেতে সে বুটজোড়া রাখা আছে, গির্জার কুলুঙ্গিতে রাখা সেন্টদের মূর্তির মত। রোজ সকালে আমার পিতা নিজহাতে সেটিকে পালিশ দিয়ে পরিষ্কার করে তোলেন—কাঁচের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। বাগানের ফুল এনে বুটজোড়াকে ফুলদানি করে সাজিয়ে দেন প্রত্যহ।'

ষ্টেফান ও মিরকো

ক্লাবের বাইরে স্বল্পভাষী স্টেফানের সঙ্গে একবার কথা আরম্ভ হলে যেন সদাপ্রবাহিত উৎসধারার মত তার কাহিনীগুলি বেরিয়ে আসত।

সে বলত, 'কর্মজীবনে নিষ্ঠাই সবচেয়ে বড় জিনিস। যা কিছু সফল করে তুলতে চাও, তার পিছনে নিষ্ঠাকে না ঢাললে, সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। নিষ্ঠাকে জীবনে আনতে হলে চাই সংকল্প আর এই সংকল্পের যাচাই হয় শ্রম ও দুঃখ কষ্টের সহনশীলতায়।'

এ বিষয়ে সে একদিন বলল, 'জান, আমি এ নিষ্ঠাকে দেখেছি আমার পিতার কর্মে। প্রত্যেকটি জুতোকে তিনি যে-রকম প্রাণ ঢেলে গড়তেন তাতে মনে হত যেন সেগুলি তৈরী হলে জীবন্ত হয়ে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আপনা থেকে চলতে শুরু করবে।

'তুমি হাসছ, কিন্তু আমি মনে করি তোমার একটা ভাস্কর্য গড়ায় যতখানি নিষ্ঠা দিয়ে থাক, আমার পিতা জুতো তৈরিতে প্রায় ততখানিই নিষ্ঠা ঢেলে দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষের মত জুতোরও জীবনী লেখা যায়। মানুষের পদাশ্রয় হলেই জুতো হয় জীবিত এবং মানুষেরই মত চলে তার সুখ দুঃখের জীবন। প্রাণবায়ু

বেরিয়ে গেলে আমাদের শরীরের যে অবস্থা, শেষবারের মত মানুষের পর্দ-বিচ্ছিন্ন হলে, জুতোরও সেই অবস্থা।

'এই জুতোগুলি কেউ বা আসে সৌভাগ্য নিয়ে কেউ আসে মন্দ ভাগ্য নিয়ে। শ্রমিক চাষী ও ফিরিওয়ালা জুতো কিনবে বেশ মজবুত দেখে এবং তারপর থেকেই শুরু হয়ে যাবে সে জুতোর দুর্ভাগ্য। জলে কাদায় বালিতে পাথরে সেই যে তার মশমশ করে ঘর্ষণ ও মর্দন আরম্ভ হল, তার আর বিশ্রাম হবে না—যতদিন না তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার আগে তার ধূল্যায় ধূসরিত দেহে উঠবে অনেক তালির অপমান।

'ধনীর পায়ের জুতো, দোকান ছাড়লেই শুরু করে আনন্দের জীবন। প্রচুর বিরামের মাঝে মাঝে মখমল-গালিচার সঙ্গে মাখামাখি করে গর্বে হয় ভরপুর। শৌখিন মহিলার পায়ের জুতোর যত সোহাগ আর সম্মান, তত স্বল্পস্থায়ী তার এই সৌভাগ্যের জীবন কারণ একটু জৌলুষ কমলেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে পরিচারিকার চরণে। তখন না থাকবে তার আগের যত্ন ও আদর না থাকবে সে অলস-চরণের সুখস্পর্শ। তার বুক দলতে থাকবে কড়া-পড়া ভারী পায়ের কর্ত্রীর আজ্ঞাবহনকারী অবিরাম পদক্ষেপ।'

আমি অবাক হয়ে শুনছি স্টেফানের কথা।

সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে তার বংশগত পেশা, আর এসব কথা বিনা দ্বিধায় সে বোধহয় স্বদেশী বন্ধুদের বলবার সুযোগ পায় নি।

সে বলে চলেছে, 'শহরতলীতে আমাদের বাড়ি। আমরা গরীব হলেও আমাদের সংসারে অভিযোগ আর ঈর্ষার কথা শুনতে পাবে না। আমার পিতা একবার বলেছিলেন যে, এক ধনীর কর্মচারী জুতো কিনতে এসে তার মনিবের দুর্ভাবনা ও দুর্ভোগের যা লম্বা ফর্দ দিল তাতে মনে হয়, আমরা গরীব হলেও তার চেয়ে অনেক সুখে আছি। আনন্দ ও সুখ জীবনে কদাচিৎই অর্থের অনুমানে মাপা যায়।

'আমরা সন্ধ্যেবেলায় যে যার কাজ সেরে যখন নৈশাহারে বসতাম, আমার পিতা বাড়ির তৈরী গরম মোটা রুটির টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে সকলের হাতে দিতেন। তারপর স্যুপ্ প্লেটে পড়লেই, তিনি চোখ বুজে স্বল্প কথায় ঈশ্বরকে আমাদের এই আহার্য অর্জনের উপায় দেবার প্রার্থনা ও প্রণতি জানাতেন। তারপরে আমরা সব হুসহুস করে খেতে শুরু করতাম'।

'খাওয়ার শেষে শীতের দিনে আগুনের ধারে বসে কে কত মজার গল্প ও ঘটনা বলে বাহাদুরি পেতে পারে আমাদের মধ্যে তার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।

'আমার একটি ছোট ভগ্নী ছিল, সে যখন কয়েকদিনের অসুখে মারা গেল, তার শোকে আমাদের বুক ফেটে যেত, মনে হত যেন আমরাও শীঘ্রই তার সঙ্গী হব। আমার পিতার নয়নের মণি ছিল সে, কিন্তু আশ্চর্য তিনি কোন অনুযোগ না করে আমার মাকে নিয়ে যেতেন গির্জায়। তার স্মরণে দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে যখন ঘরে ফিরতেন, তাঁদের মুখ দেখে বুঝতাম যে, এই তীব্র শোক ও বেদনার কিছুটা লাঘব হয়েছে।

'আমি নতুন জগতের দীক্ষায় মানুষ, আমার মনে নেই ভগবানে বিশ্বাস। গির্জায় প্রার্থনা আমার কাছে বুজরুকি। কিন্তু এই বুজরুকিতেই তো আমার বয়োবৃদ্ধরা শোকে পাচ্ছেন শান্তি। আমাকে শোক লাঘবের পন্থা খুঁজতে হবে, আমার সহ্যশক্তিতে আমার ব্যক্তিত্বে।

'যদিও জানি প্রার্থনা দিয়ে নিজেকে আমরা ছলনা করে থাকি তবুও সেই ছলনা অন্তত হৃদয়ের বেদনাকে খানিকটা লঘু করে দিতে পারে। কাজেই ছলনায় শোকের লাঘব আর তার ত্যাগে শোকের তীব্র বেদনাকে জয় করবার অক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যে কোন্‌টা গ্রহণীয় বলা শক্ত।'

'আমাদের পাড়ার শ্রমিকদের নিরভিমানী গৃহগুলিতে আধুনিক

সভ্যতার সুখসুবিধার কোন উপাদান নেই। দারিদ্র্যময় এই গৃহগুলির গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের মত, একটা বিশেষ পরিচয় আছে—যাকে রাতের অন্ধকারে আকাশের গায়ে-পড়া কালো স্মিলুয়েট-য়ে চেনা যায়।

'আগামী দিনে আমরা যখন গড়ব নতুন রাষ্ট্র তখন এই ডেকাডেণ্ট সভ্যতার নিদর্শনগুলি মুছে যাবে। নতুন ইমারত উঠবে শ্রমিক চাষীদের জন্যে বিজ্ঞান সম্মতভাবে আধুনিক আবিষ্কারের সুখ-সুবিধার আওতায় ভরা। সেখানে ব্যক্তিগত রুচির জন্য বিশেষ ঢঙয়ে গড়া বাড়ি থাকবে কিনা সন্দেহ। এক ধাঁচে সারি সারি বাড়ির মধ্যে বিশেষ পরিচয় কেবল থাকবে একটা নম্বরে। ঠিক এমনি ভাবেই হয়ত, আজ যাদের গ্রামের জ্যেঠা খুড়ো বলে জানি, যাদের ছেঁড়া কোট আর ঝোলা পাতলুনের নকশা দেখে দূর থেকে চিনতে পারি, তারাও সব হারিয়ে যাবে টেঁকসই শ্রমিক-চাষীদের স্মার্ট ইউনিফরম্‌য়ে।'

তাকে বললাম, 'স্টেফান, তুমি প্রলেতারিয়েত পরিবার থেকে এলেও তোমার মনোভাব অত্যন্ত রিঅ্যাকশনারি মনে হচ্ছে।'

সে বললে, 'সে আমি জানি। একটা ডেকাডেণ্ট ও ক্যাপিতালিস্ত সমাজের অংশ আমি, শ্রমিক হলেও। তাই আমার পক্ষে রিঅ্যাকশনারি ধারণা কিছু অসঙ্গত নয়। আমি চাই নতুন রাষ্ট্র, তার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু সত্যি বলতে কি ডেকাডেন্সের এই চিহ্নগুলিকে আমি ভুলতে পারব না।

'আমার পরে যারা আসবে নতুন সমাজে ও রাষ্ট্রে জন্ম নিয়ে, এ সম্বন্ধে অজ্ঞাত তারা, এগুলির অভাব কোনদিন বোধ করবে না। তোমাকে আমার অনুরোধ যে, তুমি এইলাস বা অন্য কাউকে এই কাহিনীগুলির কিছু বলো না, যারা ক্যাপিতালিস্ত বা বুর্জোয়া থেকে হয়েছে কমিউনিস্ট, তাদের রিঅ্যাকশনারি হওয়া স্বাভাবিক বলে পদস্খলনে পায় ক্ষমা কিন্তু প্রলেতারিয়েত কমিউনিস্টের যদি হয় অধঃপতন তাহলে তার ক্ষমা নেই এবং সে পায় চরম দণ্ড।'

জিজ্ঞাসা করলাম, সে কোন সাহসে আমায় বিশ্বাস করে বলল এ কথাগুলি।

সে বলল, 'সব বলবার কথা বুকে জমে যখন আমাদের প্রায় শ্বাসরোধের মত অবস্থা হয়, তখন বিশ্বাস করে কাউকে বলে ফেলি। এ সাধারণ ভুল সকলেরই হয়ে থাকে। নিজের মনের কথা যদি অযোগ্যকে বিশ্বাস করে বলে ফেলি, তখনই আমরা পড়ে যাই লিকুইডেশানের তালিকায়।

'প্রত্যেকটি জিনিসের জন্মের সঙ্গে জড়িত আছে ক্লেশ ও সংগ্রাম। স্যোসালিজমের পরিপূর্ণভাবে জন্ম হতে প্রয়োজন হবে বহু কষ্টের ও সংগ্রামের, প্রচুর অদল বদল ও ভালমন্দ যাচাই-এর। তবেই প্রতিষ্ঠা হবে আগামী দিনের আদর্শ রাষ্ট্রের।

'এইলাসের মতন লোকেরাই মনে করে, গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে নরম মনের লোকদের নিজ-মতবাদে বিশ্বাস করিয়ে, নিজের মতন করে তাদের চালিয়ে, ছলে বলে কৌশলে এনে দেবে আদর্শ স্যোসালিস্ট ষ্টেট। যেন গাছ থেকে পেড়ে দেওয়া একটি পরিপক্ব আপেলের মত, লোকের হাতে তুলে দেবে তার এই অপূর্ব সৃষ্টি।

'এই সব গরম কথায় ও আস্ফালনে যে-সব লোকের মনে টোল পর্যন্ত পড়ে না, তারাই কেবল জানে কত সময় কত সংগ্রাম ও কত আহুতি লাগবে এই স্যোসালিজমের প্রতিষ্ঠায়। এই অভিযানের যোগ্য নায়ক হচ্ছে মিরকোর মত লোকেরা।

'তুমি বোধহয় জান না, মিরকো ছিল আমাদের লীডার। তার অধিনায়কত্বে পার্টিতে আমরা নির্ভয়ে জানাতে পারতাম স্ব স্ব মতামত, তাকে প্রতিবাদ করবার সুযোগ সে দিত এবং আলোচনার পর আমরা সকলে একটা সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। তারপর এল এইলাস, আইন পড়ার বৃত্তি নিয়ে এখানে।

'দেশে ছিল সে মিরকোর প্রাণের বন্ধু। ইয়ানিনা মিরকো আর এইলাসের মাঝে পড়ায় সে বন্ধুত্বে চিড় খেল।

'ইয়ানিনার প্রথম পরিচয় হয় এইলাসের সঙ্গে এবং একদিন সে ক্লাবের সকলের সঙ্গে ইয়ানিনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এসে বললে, বন্ধুরা, ইয়ানিনা আমার সঙ্গিনী কিন্তু তোমাদের আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে এক দেশদ্রোহী পলাতক হোয়াইট রাশিয়ান কাউন্টের মেয়ে। আমার পার্টি যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অনুমোদন না করে তাহলে আমাদের সম্পর্ককে এখুনি শেষ করে দেব।

'অবমানিতা ও রুষ্টা ইয়ানিনা চলে যাচ্ছিল কিন্তু মিরকো ছুটে তার পথ রোধ করে বলেছিল—মাদ্‌ম্যয়জেল, তুমি একজনের অভদ্রতার কালি আমাদের সকলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে, এ আমি সহ্য করব না। বন্ধু এইলাসের জানা উচিত যে, জন্মগতভাবে কেউ ক্যুলাক, প্রলেতারিয়েত বা বুর্জোয়া হয় না। তাদের বিশিষ্ট পরিচয় হয় মনোবৃত্তিতে, আচারে ও ব্যবহারে। আমাদের পার্টি কারোর ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের উপর খোদকারি করে না। পার্টির সদস্যের ব্যক্তিগত উপযুক্ত বন্ধু নির্বাচন, তার একারই দায়িত্ব। আমরা স্যোসালিজমের বিরুদ্ধবাদী দলকে তফাতে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে দলভুক্ত কেউ যদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে আমরা সামাজিক শিষ্টাচার দেখাতে কুণ্ঠিত হব না। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে রাজনৈতিক কারণে এই রকম রূঢ় ব্যবহার দেখান অত্যন্ত অশোভন। মাদ্‌ম্যয়জেল আমি সকলের তরফ থেকে এইলাসের এই দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

'সেই থেকে ইয়ানিনা মিরকোর অনুরক্তা হয়ে পড়ল এবং এইলাস সুযোগ পেলেই মিরেকাকে, নরমপন্থী, দোমনা, বুর্জোয়া-ঘেঁষা ইত্যাদি বলে মিটিংয়ে আক্রমণ শুরু করল।

'শেষে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ তৈরী করে দেশের মূল পার্টির কেন্দ্র থেকে এখানকার লীডারশিপ থেকে মিরকোর অপসারণের ব্যবস্থা করল এবং এইলাস নিজে হল লীডার। মিরকো এখনও নির্ভয়ে বলে চলে তার মতামত।

'এইলাস অবশ্য সেটা মোটেই পছন্দ করে না। আমাকে একদিন বলেছিল যে, মিরকোর উপস্থিতিতে আমাদের পার্টির সলিডারিটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে নিজে সরে না গেলে উপায়ান্তরে তাকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

'মিরকোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বেশ ভয় হয়। তাকে একবার বলায় সে হেসে উড়িয়ে দিল আমার সাবধানবাণী। বলল, 'তা কী করে সম্ভব? এইলাস আমার আবাল্য বন্ধু।'

'আমি একদিন ইয়ানিনার কথা তুলে এইলাসকে বললাম, আচ্ছা, তুমিও তো এসেছ পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে, কাজেই তোমার সততা ও স্যোসালিজমে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অন্যেরাও তো সন্দেহ করতে পারে এবং যদি প্রশ্ন করে তো কি জবাব দেবে?

'সে একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বলল, আরে এ অতিশয় সোজা। তুমি বই পড়লে দেখবে যে সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতারা সব আসে এবং তৈরী হয় পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে। তারাই চাষী ও শ্রমিকদের দলকে সজাগ করে দেয় তাদের ন্যায্য দাবি কতটা এবং কোথায়, সে সম্পর্কে। আমি আমার কাজেই প্রমাণ করে দেব স্যোসালিজমের প্রতি আমার অবিচলিত একনিষ্ঠতা, এ ধরণের প্রশ্ন ও সন্দেহ আসবে কেবল মিরকোর মত পথভ্রষ্ট স্যোসালিস্টদের সম্বন্ধে।

'তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে মিরকোর বন্ধু হয়ে কেন মিথ্যা অভিযোগে তাকে পার্টির লীডারশিপ থেকে সরাল।

'সে বলল, এ তো মিথ্যা অভিযোগ নয়, পার্টির শুভার্থে সত্য উপায়। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে যে কোন উপায়ই নৈতিক ও সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও মিরকোর পরম বন্ধু এবং আমি জানি যে, সে অতিশয় সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু পার্টির প্রয়োজনের পক্ষে মিরকো একেবারেই অপদার্থ।

'একবার ইচ্ছা হল তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, পার্টি কি উদ্দেশ্যে

তৈরী হয়েছে এবং তাতে কি ব্যক্তিগত সততা, বন্ধুত্ব, প্রেম বা ভালবাসার কোন স্থান বা মূল্য নেই ?

'কিন্তু এইলাসের জবাব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ না থাকায় চুপ করে গেলাম।

'মিরকোকে প্রকারান্তরে জানাবার চেষ্টা করেছিলাম, এইলাসের তার প্রতি বিদ্বেষ কত তীব্র, কিন্তু মিরকো সে কথায় কান দিল না।

সে একদিন বলল, দেখ, কমিউনিজম্ আইডিয়া হিসাবে এক জিনিস আর তাকে কার্য্যকরী করতে যে উপায়ের সৃষ্টি হয় সে আর এক জিনিস। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যদি চেয়ে থাকি আমার চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মনের মত সহধর্মিনী, যাকে নিয়ে বাঁধব আবশ্যকের অনতিরিক্ত ঘর এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদের গড়ে তুলব সমাজের ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত অধিবাসী করে একেই সফল করে তুলবার জন্য চাইব কমিউনিজম—আমার একার সুযোগ ও সুবিধার জন্য নয়, আমার এই অভিলাষকে পরিপূর্ণ দেখতে চাইব আমার চারিপাশের আর-সকলের মধ্যে, তা হলে আমার এই অভিলাষ কি অন্যায় দাবি ?

'এই বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কিন্তু তার বোধন শুরু না হতেই 'যুদ্ধং দেহি'-র ভাব দেখিয়ে কি লাভ ? মানব সমাজের মঙ্গলার্থে যারা নিজেদের করেছে ব্রতী তাদের প্রত্যেকের সংকল্পকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এমন কি দেখতে হবে অবচেতনায় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কোথাও কোনমতে তাদের লক্ষ্যপথের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে কি না।

তারপর একটা আপসোসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কি জানি, এইলাস বোধ হয় ঠিকই বলে যে, আমার মধ্যে খানিকটা আছে বুর্জোয়াজি। আমার ডাচ পেন্টিং ভাল লাগে, অত্যন্ত ভোগ বিলাসের ছবি সে সব। গোয়েথে আর ইউগো পড়ে আমার

আনন্দ হয়—কিন্তু পার্টি সমর্থিত লেখক তাঁরা নন। আর মোৎসার্তের সঙ্গীত শুনতে আমি পাগল কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সুরধারা কেবল রাজদরবারে অভিজাত শ্রেণীর রুচি সেবার্থে রচিত বলে আমি পার্টি থেকে পাই গালাগালি। আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে এমন কোন স্থানে যেখানে নেই শ্রেণী, নেই জাত, যেমন পশুরা দল বেঁধে থাকে এক সঙ্গে, প্রকৃতি তাদের এক ছাঁচে ঢেলেছে বলে। আমি থাকতে চাই সেই রকম মানুষের সমাজে।'

ষ্টেফান যা ভয় করেছিল শেষে তাই ঘটল।

এইলাস মিরকোর নামে জাল প্রমাণ কাগজপত্র ও মিথ্যা অভিযোগ পৌঁছে দিল আপন দেশের সরকারের কাছে।

মিরকোর কাছে এল সরকারী নির্দেশ যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে সে লিপ্ত থাকায় তার বৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে এবং ফরাসী সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে মিরকোকে তিনদিনের মধ্যে তার স্বদেশের সীমানায় পৌঁছে দেওয়া হয়।

তার এই ভাগ্য বিপর্যয়ে আমরা সকলেই বিশেষভাবে দুঃখিত হলাম।

সে আমাদের সকলকে ডেকে বলল, 'আমার যা জিনিসপত্র আছে সেগুলি তোমরা যে দামে খুশী নিয়ে নাও আর যদি কেনবার সংগতি না থাকে তাহলে উপহার হিসাবে নিয়ে যাও, যা তোমাদের প্রয়োজন।'

সকলেই আপন সামর্থ মত অর্থ দিয়ে কিনে নিল টাইপরাইটার, ক্যামেরা, রঙ, তুলি, ইজেল, ক্যানভাস, কাগজ ও ফ্রেম। সে এমন কি তার বাড়তি জামা কাপড়ও বেচে দিল নাম মাত্র মূল্যে।

তারপর চলে যাবার দিন, আমাদের নিমন্ত্রণ করল তার সঙ্গে রেস্তোরাঁতে ডিনার খাবার জন্যে।

সে এভাবে কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় করছে বলে আমরা যে যার আহারের দাম দিতে চেষ্টা করলে মিরকো ভীষণ আপত্তি করে বলল,

'তোমরা যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে এ ভোজ দেওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করো না। কয়েকটা ফ্রাঙ্ক বাঁচানোর চেয়ে তোমাদের খাইয়ে যে তৃপ্তি পেলাম সেইটে হবে আমার যাত্রার সবচেয়ে বড় পাথেয়।'

রেস্তরাঁ থেকে সে আমাদের নিয়ে গেল ছাত্রপল্লীর একটি সিনেমায় এবং জোর করে আমাদের সকলের প্রবেশমূল্য নিজেই দিল।

এই আসন্ন বিদায় ভোজে ইয়ানিনার অনুপস্থিতি সকলের কাছে বেখাপ্পা ঠেকলেও কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমাদের দ্বিধা হচ্ছিল।

শেষে একজন মিরকোকে প্রশ্ন করলে সে বলল, 'যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হচ্ছি আমি আমার চারপাশে হাসিমুখ দেখতে চাই, ইয়ানিনা এখানে উপস্থিত থাকলে তা সম্ভব হত না। আমি অপেরার দুখানা টিকিট কিনে এইলাসকে অনেক অনুরোধ করে পাঠিয়েছি তাদের দুজনকে গীতাভিনয় দেখতে। সে এখনও ঠিক জানে না যে আমি যাচ্ছি এবং আশা করি এইলাস তাকে আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে বলে দেবে না আমার এই গোপন প্রস্থানের কথা।'

পরের দিন ভোরেই তাকে রওনা হতে হবে।

সিনেমা থেকে প্রায় রাত একটায় বেরিয়ে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দৃঢ় আলিঙ্গন ও শেষ করমর্দনের সময় সকলের চোখ ছলছল হয়ে উঠেছিল।

দূরে অপস্রিয়মান মিরকোকে আকাশে হাত তুলিয়ে আবার যখন কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠল 'অব্‌ভোয়ার্‌' বলে, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম আনন্দোচ্ছ্বাস আনবার চেষ্টায় সে আওয়াজ রুদ্ধ আর্তনাদের মত শোনাল।

সকাল তখন সাতটাও বাজে নি। ঘুমের ঘোরে শুনছি কোন সুদূর থেকে কে আমায় ডাকছে।

হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম স্টেফানের গলার আর দরজায় টোকা দেওয়ার চাপা আওয়াজ।

ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই সে বলল, 'কাপড় পরে শিগ্‌গির চল আমার সঙ্গে যদি মিরকোকে শেষ দেখতে চাও।'

বললাম, 'কাল তো তার কাছ থেকে আমরা সবাই বিদায় নিলাম। সে কি এখনও যায় নি!'

স্টেফান অশ্রুভরা চোখে ধরাগলায় জানাল, 'সে আমাদের ঠকিয়েছে। জান তো তার আর আমার কামরা পাশাপাশি। ভোর তিনটের সময়ে তার ঘর থেকে একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজে আমি জেগে উঠতে তার দরজায় অনেক ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে কাঁসিয়ার্জকে ডেকে আনি। সে আর আমি তার নাম ডেকে কোন শব্দ না পেয়ে পুলিস ডাকি এবং তারা এসে দরজা খুলতে দেখি মিরকো নিজের মাথায় পিস্তলের গুলি মেরে আত্মহত্যা করেছে।'

চললাম তার সঙ্গে গরীব বস্তির এক নগণ্য হোটেলে।

পথে স্টেফানএর কাছে শুনলাম যে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা হোটেলে পৌঁছলে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে তাকে বলে, 'স্টেফান, দেশের সরকারের কাছে আমি আজ দেশদ্রোহী আর পার্টির কাছে আমি অবিশ্বাসভাজন ও ভ্রষ্টকর্মী। আমার চলার পথের সামনে উঠে গেছে পাঁচিল আর পাশে ও পশ্চাতে পড়ে গেছে কাঁটা-বেড়া এবং আমার দাঁড়িয়ে থাকবার ঠাঁইটুকুও নেই। একেই বলে পারফেক্‌ট্‌ লিকুইডেশন্‌।' তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে আমার করমর্দন করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমরা হোটেলে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়।

আত্মঘাতীর মৃতদেহ দেখবার জন্য জীবিতদের কি আকুল আগ্রহ!

দরজায় পুলিস আমাদের ঢুকতে দেখে খুব রূঢ় ভাষায় সরে যেতে বলল। তারপর স্টেফানকে চিনতে পেরে বলল, 'তুমি ভিতরে এস কিন্তু ও আসতে পারবে না।' সে পুলিসকে জানাল যে মিরকোকে শেষ যারা জীবিত দেখেছে আমি তাদের একজন। তদন্তের সময় সাক্ষী দিতে আমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে নাম ঠিকানা লিখে ভিতরে

যেতে পারি বলায় নাম লিখে চললাম চারতলার এ্যাটিক্ কামরাগুলির অভিমুখে।

মির্কোর ঘরে ছোট স্কাইলাইটের একমাত্র জানলা দিয়ে আলো তখনও আসে নি। কমজোরের একটা বাল্‌ব থেকে যেটুকু রশ্মি তার উপর পড়েছিল তাতে দেখাল যেন মির্কো ফুতোইয়ে বসে ঘুমোচ্ছে।

স্টেফান ঘরের মধ্যে যে পুলিস কর্মচারী উপস্থিত ছিল তাকে কি বলতে সে তার টর্চ ফোকাস্ করে মির্কোর দেহের উপর ফেলল। দেখলাম কাত হয়ে পড়া তার মাথার ডান কানের উপরে একটা বীভৎস ক্ষত, এবং সেখান থেকে রক্তস্রোত কান গাল গলা বেয়ে শার্ট ও জামাকে রঞ্জিত করে জমিতে লিনোলিয়ামের উপর পড়ে চাপ বেধে গেছে।

তার আধবোজা চোখ আর হাঁ-করা মুখে যেন লেগে ছিল একটা ব্যঙ্গভরা হাসি।

আমরা বেরিয়ে আসবার সময় স্টেফান বলে উঠল, ষ্টুপিড—ষ্টুপিড। কিসের অথবা কার উদ্দেশ্যে এল তার এই খেদোক্তি জিজ্ঞাসা করি নি।

সমস্ত জগতটাকেই তখন আমার মনে হচ্ছিল ষ্টুপিড।

সেন সংলাপ

মিরকোর যেমন সকলকে কাছে টানবার আকর্ষণী শক্তি ছিল বন্ধু সেনের মধ্যেও দেখেছিলাম মানুষকে নিকটে আনবার সেই অদ্ভুত অভিব্যক্তি।

মনে পড়ে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমবার লণ্ডনে। পকেটে ছিল পাঁচ পাউণ্ড আর এক আমেরিকান ডাক্তার বন্ধুকে গচ্ছিত কয়েকটি ছবি, যা সে বিক্রী করে টাকা পাঠিয়ে দেবে তার প্রত্যাশায়।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে নিয়েছিলাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের খবর দিয়ে স্যার উইলিয়াম রোদেনৃষ্টাইনে নামে একখানি পরিচয়পত্র। ভেবেছিলাম সেই চিঠিতেই আমার সব আকাঙ্ক্ষার সুরাহা হয়ে যাবে। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়াল কলেজ্ অফ্ আর্টস্-এর অধ্যক্ষ এবং তাঁর আরও বিশেষ পরিচয় ছিল, ভারতভক্ত ও ভারতীয়দের বন্ধু বলে।

পয়সা বাঁচাতে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছিলাম তাঁর ঠিকানায় পৌঁছনোর উদ্দেশ্যে। যদিও জানতাম না কতদূরে সে বাড়ি। অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ায় আজও মনে আছে দয়ালু এক ট্রাক-ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে কোথায় যেতে চাই জিজ্ঞাসা করে তার বাহনে আমায় পৌঁছে দিয়েছিল স্যার উইলিয়ামের বাড়িতে।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের দর্শন-লাভ হল।

তিনি বললেন, 'দেখ, আমি রয়াল্ কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে এখন রিটায়ার করেছি কাজেই তোমাকে আমি কোনও সাহায্য করতে পারব না।'

বুঝলাম, আমি ভারতীয় শিল্পী ও তাঁর দর্শনপ্রার্থী লেখায় তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি তাঁর সাহায্য-প্রত্যাশী। যদিও তাঁর সঙ্গে দেখা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই, স্যার উইলিয়াম নিজে থেকে তা আন্দাজ করে বিনা আলাপে এমন নিরাশ করে দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ হলাম এবং বললাম, 'মহাশয়, আপনার সাহায্য চাই এ কথা তো বলি নি। শুনেছিলাম, আপনি ভারতবন্ধু এবং ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ আমার মারফত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুসংবাদ পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি আপনাকে দেখতে ও সে সংবাদ দিতে।'

এই কথা বলতেই তাঁর ব্যবহার ও কথার সুর বদলে গেল। যেন আমি হয়ে গেলাম তাঁর বহু পরিচিত পুরাতন বন্ধু।

আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'এস হে এঁস, ভিতরের কামরায় চল, চা খাও। বল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?' ইত্যাদি।

তাঁর এই আপ্যায়ন বেশ কৃত্রিম লাগল। ভাবলাম, কলিকাতার চোরা বাজারে কিনে ধোলাই করা পুরনো স্যুট আর চাঁদনী চকে সওদা করা সস্তার শার্ট ও টাই পরা এই অধম শিল্পী স্যার উইলিয়ামের ড্রয়িংরুমকে অশুচি করতে চলল। রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখে শুধু যে শুদ্ধিলাভ হল তা নয় চা-ও পাওয়া গেল।

কিন্তু অনেক চিনি ঢেলেও স্বাদে তিক্ততা দূর করা গেল না। তাঁকে অভিবাদন করে বিদায় নিলাম। পকেট থেকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের লিখিত পরিচয়পত্র তাঁকে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি।

ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্ট্‌স্‌ ইউনিয়ানে ডাঃ বীরেশ গুহর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

আমি লণ্ডনে কাউকে চিনি না বলায় তিনি একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন লিটল রাসেল স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে।

দোকানটির নাম ছিল 'বিবলিওফিল' এবং এর মালিকের সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁর নাম ডাঃ শশধর সিংহ।

আগের দিন আমার আমেরিকান ডাক্তার বন্ধুর প্রেরিত ছবি বিক্রীর দরুণ একশো বিশ পাউণ্ড পেয়ে ঠিক করেছি শিগ্‌গির প্যারিতে যাব কারণ লণ্ডনে মিউসিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখা ছাড়া শিল্প শিক্ষালাভের কোন সুযোগ ও সুবিধা পাই নি।

ডাঃ সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি প্যারিতে কাউকে চিনি কিনা এবং 'না' বলায় তিনি বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি এক ভদ্রলোক আসছেন তিনি প্যারিতে প্রায়ই যান, আপনাকে অনেক খোঁজ খবর দিতে পারবেন।'

কিছুক্ষণ পরেই মাঝারি সাইজের এক বাঙালি ভদ্রলোক আসতে

ডাঃ সিংহ পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনি সেনগুপ্ত, এখানে সংক্ষেপে সবাই এঁকে ডাকে শুধু সেন বলে।'

ভদ্রলোকের ব্যাকব্রাশ করা ঘন কালো চুলের তরঙ্গ, সমান ও মসৃণ কপাল, সোজা ক্লাসিকাল টাইপের নাক এবং সব মিলিয়ে বেশ মাননসই মুখ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে এক সুপুরুষ যুবক ছাড়া আর তাঁর কোন বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তাঁর গাঢ় ওয়াইন রঙের চোখের দিকে চাইলে উপলব্ধি হোত যে ওই গভীর ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পথ ধরে স্পর্শ করা যায় একটি তেজ ও প্রভাময় স্ফুলিঙ্গের উত্তাপকে।

তিনি নিবে যাওয়া পাইপে নিষ্ফল টান দিয়ে, তাম্রকূটের ভস্মপূর্ণ আধারটি নেড়ে চেড়ে যখন নিশ্চিত হলেন যে তার থেকে মৌতাতের আদৌ আর সম্ভাবনা নাই তখন আরম্ভ করলেন আমার সঙ্গে পরিচয়। 'প্যারিতে কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করেছেন।' 'না' বলায় বললেন 'ফরাসী ভাষা কিছুটা জানেন নিশ্চয়ই।' জানালাম, 'না মশায় কেবল 'উই' আর 'নো' ছাড়া ফরাসী শব্দ জানি না।'

স্তম্ভিত হয়ে সেন বললেন, 'মশাই, ওদেশে এরকম বেপরোয়াভাবে গেলে মারা পড়বেন। আপনাকে দু একজন বাঙালি ছাত্রের নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি। এরা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে'—বলে খবরের কাগজের সাদা মার্জিন ছিঁড়ে তাইতে লিখে দিলেন তাদের নামধাম। যদি কোনও মুস্কিলে পড়ি তা হলে তিনি দিন দশেকের মধ্যে প্যারিতে আসছেন এবং আমার সব হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবিষ্কার করলাম যে সেন অন্যের নাম ঠিকানা দিয়েছেন কিন্তু প্যারিতে তিনি নিজে কোথায় থাকেন বা থাকবেন তার কোন উল্লেখ নেই।

যাদের তিনি নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন প্যারিতে পৌঁছে ভাষা না জানায় তাঁদের খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ হয়েছিল এবং তাঁদের

বাড়ি পৌঁছেও কোন সুবিধা হয় নি কারণ তাঁরা সে সময়ে প্যারির বাইরে কোথায় সফরে বেরিয়েছিলেন।

লাটিন কোয়ার্টারসে আধ ঘণ্টা রাস্তায় ইংরাজী বোঝে এমন লোকের খোঁজ করে শেষে একটি ইণ্ডোনেশিয়ান ছাত্রের সাহায্যে থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম।

ওদেশে পথযাত্রায় পথিককে রক্ষা করেন সেণ্ট ক্রিষ্টোফার। ভাষা না জানা বিদেশীকে হদিশ দেবার কোন সেণ্ট আছেন কিনা জানি না। জানলে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করতাম।

ভাষা না জানলেও প্রথম কয়েক দিন অঙ্গ ও মুখভঙ্গীর সাহায্যে নক্‌শা এঁকে কাজ চালিয়ে নিলাম।

পরে সেনের দেওয়া ঠিকানায় ভদ্রলোক দুটির সাক্ষাতে ও পরিচয়ে পথে চলার মত কয়েকটি ফরাসী শব্দ আয়ত্ত করে ভর্তি হয়ে গেলাম একাদেমী গ্রাঁদ শমিয়ের-এ।

দেশ থেকে ফ্রান্স ও ফরাসী জাতটা সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ পড়ে যে ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ে সেই মনে-আঁকা ছবির রূপ পরিবর্তন হতে লাগল।

ছাত্র ছাড়াও ব্যবসাদার, টুরিষ্ট, অ্যাডভেনচারের কিংবা সরকারী কাজে আগত ভারতবাসীর চোখে ফ্রান্সের পরিচয় হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং এই বিভিন্ন পেশা ও স্তরের লোকেরা দেশে প্রচার করে তাদের ধরে নেওয়া দেশটার রূপ ও চরিত্র।

এদের আনা এই ছেঁড়া টুকরো ও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত অভিজ্ঞতাকে অসাবধানী অনেক ভারতবাসী যাচাই করতে গিয়ে হয়েছে অপদস্থ এবং দিয়েছে ভারতবর্ষের নামে অপবাদ।

প্যারিতে এক মহিলা ছিলেন খুব ভারত-ভক্ত। এঁর গৃহে আতিথ্য-লাভ করেছিলেন ফ্রান্সে আগত বিখ্যাত বা নগণ্য প্রায় সকল ভারতবাসীরা।

যে কোন ভারতীয় প্যারিতে এসেছে শুনলেই তাকে তিনি লাঞ্চ বা ডিনারে ডাকতেন। এ যেন ছিল তাঁর ব্রত।

এমন সজ্জন মহিলার আতিথেয়তার প্রতিদান দিয়েছিলেন একটি ভারতবাসী অত্যন্ত গর্হিত ও কদর্য ব্যবহারে। কিন্তু তবুও ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আস্থা একটুও কমে নি।

ঘটনাটি হয়েছিল একজন পাঞ্জাবীকে নিয়ে। ইনি ছিলেন লাহোরের অধ্যাপক, প্যারিতে এসেছিলেন পড়াশুনা করতে।

প্যারি থেকে প্রত্যাগত তাঁর কোন বন্ধু ফরাসী মহিলাদের চরিত্র সম্বন্ধে এই অভিমত দিয়েছিলেন যে তাঁদের কাউকে একটু উপরোধ করলেই নিকটতম সঙ্গসুখ লাভ করা যায়। আর যদি কোনও মহিলা, পুরুষকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন তা হলে সেটাকে একটা মধুর মিলন অভিলাষের স্পষ্ট সংকেত বলে ধরা উচিত।

ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্য যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও যে দু একজন ভারতীয় ছাত্রদের ডিনারে ডেকেছিলেন তারা অন্যত্র কাজ থাকায় নিমন্ত্রণে যেতে পারে নি।

অধ্যাপক মাদাম-এর বাড়িতে কেবল তাঁরা দুজন ডিনার খাচ্ছেন দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে আহারের পর দক্ষিণাটাও পেয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে প্রেম-লীলায়।

আহারান্তে টেবিলের এপারে ওপারে বসে কফি পান ও বাক্যালাপ অধ্যাপকের মনের মতন হচ্ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন যে তাঁরা মুখোমুখি না হয়ে পাশাপাশি একদিকে বসে আলাপ করলে ভাল হয়।

ভদ্রতার খাতিরে মাদাম এতে আপত্তি করেন নি। এই বন্দোবস্তকে মহিলাটি এত সহজে মেনে নিলেন অতএব অধ্যাপকের শৌখিন অভিলাষে তাঁর আপত্তি নেই ভেবে এই পঞ্চনদবাসী পাশে এসেই ভাল্লুকের মতন তাঁকে আক্রমণ শুরু করেলেন।

সচকিতা ও ভীতা মাদাম তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে

অধ্যাপক বললেন, 'মাদাম আপনি যদি অনভিজ্ঞা তরুণী হতেন তা হলে আপনার এই কপট ব্রীড়ার খেলা বেশ মানানসই হত। কিন্তু আপনার সে বয়স যখন পার হয়ে গেছে তখন এই মিথ্যা শিক্ষানবিশীর ছলনা করে সময় নষ্টের কি প্রয়োজন।'

বিপন্না মাদাম তখন অন্য ঘরে পাঠরত তাঁর কিশোর পুত্রের নাম ধরে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন।

ছেলেটি দৌড়ে ঘরে আসতে অধ্যাপক বুঝলেন তাঁর বন্ধুর বলা ফরাসিনীদের চরিত্র সম্বন্ধে থিসিসে বেশ কিছু প্রমাদ রয়ে গেছে।

তিনি মানে মানে সেখান থেকে লগুড়াহত কুকুরের মত তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

পানথেওঁর পিছনে ফৈয়ে দেৎএতুদিয়াঁ সাঁ ৎেনভিয়েভ ছিল ছাত্রদের বেশ সস্তার রেস্তরাঁ।

এইখানে একদিন খেতে গিয়ে দেখি কিউতে দাঁড়িয়ে সেন মাঝে মাঝে তামাকবিহীন পাইপে সোঁ সোঁ টান দিয়ে মার্ক টাইম করছেন।

আমায় দেখে বললেন, 'কি মশায়, তা হলে এসে পড়েছেন প্যারিতে। পথঘাট বেশ চিনে ফেলেছেন দেখছি। আশা করি কোন মুস্কিলে পড়েন নি।'

দুজনে ট্রেতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করে টেবিলে খেতে বসলাম।

পয়সা বাঁচাতে একবেলা এই রেস্তরাঁয় খেয়ে নৈশাহারের ব্যবস্থা নিজেই করতাম ডিম, রুটী, কলা আর ক্রীম কিনে।

ফরাসী রুটী সাধারণত হয় প্রায় দেড় কি দুই ইঞ্চি মোটা এবং লাঠির মতন হাত দুয়েক লম্বা। তাজা অবস্থায় এই রুটী খেতে বেশ মচমচে ও মুখরোচক। এর পুরো সাইজকে বলে 'বাগেত' এবং আধ বাগেতের কম রুটী কেনা যায় না।

আমার পক্ষে একবারে আধ 'বাগেত' রুটী খাওয়া সম্ভব ছিল না

অথচ সকালের রেখে-দেওয়া এই রুটী বিকেলে শুকিয়ে চামড়ার মত হয়ে অখাদ্য হত।

ভাবতাম আর যদি কেউ আমার মত দৈন্যে থাকে তাহলে এভাবে রোজ রুটী অপচয় না করে তার সঙ্গে হয়ত এই আধ 'বাগেত' রুটীকে ভাগাভাগি করে এই অপব্যয়কে বাঁচান যেত।

কিন্তু আধ বাগেত রুটীর অংশীদার লোককে কোথায় খোঁজা যায় এবং জিজ্ঞাসাই বা করি কেমন করে।

ফৈয়েতে ছেলেরা ও মেয়েরা খাওয়ার উদ্বৃত্ত রুটীকে টুকরো করে একে ওকে ছুঁড়ে মেরে খেলা করছিল।

হঠাৎ চুপ করে রুটীর অপব্যবহারকে দেখতে না পেরে সেনকে বললাম, 'এরা জানে না অভাব-পীড়িত লোকের কাছে এই টুকরো রুটীর মূল্য কত। এ কেবল আধ বাগেত রুটী কিনতে যার মনিব্যাগ আড়ষ্ট হয়ে যায় তারই মনে হবে, এ তো রুটীর টুকরো নিয়ে এরা খেলছে না, এ তার দৃষ্টিতে হয়ে উঠবে যেন জীবন্ত দেহের টুকরো।'

বিস্ফারিত চোখে সেন একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'আমি সিকি বাগেত-এর বেশী রুটী খেতে পারি না, আর বাকিটা রোজ নষ্ট হয়। আপনারও বোধহয় সেই দশা। আপনি যদি দ্বিধা বোধ না করেন তা হলে আমরা এই আধ বাগেতকে ভাগ করে খেতে পারি।'

আমরা ঠিক করলাম আমাদের নৈশাহার একসঙ্গে ব্যবস্থা করব। কাজেই সেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য শুরু হয় ওই আধ বাগেত ফরাসী রুটীকে উপলক্ষ্য করে।

সেন থাকতেন পাঁচতলার ছোট্ট একটি এ্যাটিক্ ঘরে। এ ঘরের দেওয়াল দেখা যেত না কারণ এর চার পাশে জমি থেকে ছাদ পর্যন্ত বহু সারি বই থাক দিয়ে রাখা ছিল। শুধু তাই নয় এই থাক করে রাখা বইয়ের রাশির অতিরিক্ত সংগ্রহ দড়ির শিকেয় বাঁধা অবস্থায় ছাত থেকে এখানে ওখানে ঝোলান ছিল।

অপরিচিত কেউ প্রথমে সেই ঘরে ঢুকলে মনে করত কোন পাগল এই ঘরের বাসিন্দা।

এখানে একটা স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে ছুটি ডিম সিদ্ধ করে তার সঙ্গে মরশুমী ষ্ট্রবেরী কি সুপক্ক কদলী ও ক্রীম সহযোগে হত আমাদের নৈশাহার। তারপর বেশ ঘটা করে সেন তৈরি করতেন কফি।

মাঝে মাঝে আরও মিতব্যয়িতা করতে আমরা শুধু চীয্ ও রুটীতেই কাজ চালিয়ে দিতাম।

সেন খাওয়ার সময় রহস্য করে বলতেন, 'খান মশাই ভাল করে খান, ধরে নিন না আমরা যেন মাক্সিমের মত দুর্মূল্য রেস্তরাঁয় বসে লাংগুস্ত্ আ লা ক্রীম ও গ্লাস নাপলেয়ঁ খাচ্ছি,-তা হলে আমাদের মিতাহার আর ধনীর এইসব বিখ্যাত রেস্তরায়ঁ রাজোচিত আহারে কোন বিশেষ তফাত বোঝা যাবে না।

সোরবনে ক্লাবে বা ক্যাফেতে ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে স্বল্পভাষী সেনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ত মেয়ে মহলে।

আমাদের দৃষ্টিতে আরও ভারতীয় ছাত্র ছিল যাদের সেনের চেয়ে সুশ্রী বলা যেত কিন্তু মেয়েরা তাদের দিকে ফিরেও চাইত না।

আজকালকার তরুণীকুল-সম্মোহনকারী ক্রুনার গায়কের উপস্থিতির মতন সেনের আবির্ভাব মেয়েদের হৃদ্চাঞ্চল্যের বেশ একটা কারণ হয়ে যেত।

একবার সেনের সঙ্গমোহিত একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর এই আকর্ষণের বৈশিষ্ট্য কি? সে বলল, 'এ কি কথায় বলে বোঝান যায়! রসনা-তৃপ্তিকর মিঠাই দেখলে সুখাদ্য-বিলাসীর জিহ্বা হয় বাসনায় আপনা থেকে লালাসক্ত তেমনি সেনকে দেখলে আমাদের মন ওর দিকে ছুটতে থাকে।'

তাদের এই পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগের আধিক্য অন্য যে কোনও পুরুষকে হয়ত করে তুলত আপন প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ও দাম্ভিক কিন্তু সেন এদের আদরের আতিশয্যকে মোটেই আমল দিতেন

না। তিনি বলতেন, 'মশাই, এই ডাকিনীগুলিকে আপনারা দু একজন মিতালি করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে বিশেষ বাধিত হব।'

কিন্তু কার কথা তারা শুনবে !

একবার সেন-অনুরক্তা একটি মেয়ে এক ক্যাফেতে ভারতীয় ছাত্রের সম্মেলনে সেন আসছেন শুনে সর্বাঙ্গে কাল রঙ মেখে উপস্থিত হল।

প্রথমে আমরা তার এই রূপান্তরে তাকে চিনতেই পারি নি। এই সঙ সাজবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল যে শ্বেতাঙ্গিনী বলে বোধ হয় সেনের তাকে পছন্দ হয় না। তাই সে এসেছে ভারতীয় মেয়েদের মত কালো রঙ মেখে যদি এখন তাঁর তাকে পছন্দ হয়।

সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, ভারতীয় মেয়েদের মত তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে কিনা ?

বেচারী জানত না যে আমাদের এই বাদামী কি কালো রঙকে একটু ফ্যাকাশে করবার প্রয়াসে আমাদের দেশে গাত্রচর্মে কত ক্রীম, খড়ি ও পাউডার দিয়ে ঘসা-মাজা চলে।

মেয়েটির চিবুকের নীচে দু জায়গায় রঙ না লাগায় শ্বেতকুষ্ঠের মত দেখাচ্ছিল।

আমরা তাকে আয়নায় সেটা দেখিয়ে দিতে সে অপ্রস্তুত হয়ে হাত ধোবার কামরায় গিয়ে সব রঙ ধুয়ে এল। এবং তারপর কাঁদতে আরম্ভ করল এই বলে যে তার সব সজ্জা ও আয়োজন বৃথা হল। এখন তার এই সাদা রঙ দেখে সেন আর ফিরেও চাইবে না।

এমন সময় বন্ধুবর এসে হাজির হলেন। তাঁকে আমরা মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা বলতে তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন এবং আমরাও সে হাসিতে যোগ দিলাম।

ক্রুদ্ধা ও রোদনবিহ্বলা মেয়েটি আমাদের মুণ্ডপাতের শপথ করে ক্যাফে পরিত্যাগ করল।

অবিচলিত সেন নির্বাপিত পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে পরিবেশকের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন, 'গাঁরস এঁ্যা ক্যাফে ক্রেম্ সিল ভূ প্লে।'

অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'মশাই বেশী মিশবেন না সেনের সঙ্গে কারণ ও দাগী লোক। দেশে ছিল সাংঘাতিক রকমের টেরোরিষ্ট, অনেক বছর জেল খেটেছে এবং এখন এখানে ও মার্কামারা কমিউনিষ্ট। এই সেদিন ফরাসী সরকার দুজন ভারতীয় সাংবাদিককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করে চলে যেতে হুকুম দিল কারণ তারা ছিল কমিউনিষ্ট। কিছু বলা যায় না, কোনদিন সেনকেও যদি তাড়ায় তা হলে আপনাকেও ওর সঙ্গে ভাগতে হবে।'

সেনের সঙ্গে আমার কথা হত শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর বিপ্লবী জীবন সংক্রান্ত কোন কথা আমরা আলোচনা করি নি। আর আমিও ঠিক করেছিলাম যে তিনি নিজে থেকে ও বিষয়ে কিছু না বললে আমার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করাটা অত্যন্ত অশোভন হবে।

একদিন লাঞ্চের সময় তিনি বললেন, 'আজ রুটী নষ্ট হবে, নৈশাহার আপনাকে একলা করতে হবে। আমি যাচ্ছি পার্টির এক বিরাট সম্মেলন হবে সেইখানে।'

জিজ্ঞাসা করলাম পার্টির সভ্য ছাড়া বাইরের লোক এই সম্মেলনে যেতে পারে কিনা।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি যেতে চান নাকি! জানেন না আমি দাগী বিপ্লবী এবং আপনি যে আমার সঙ্গে ডিনার খান এইটেই যথেষ্ট বিপদের কথা। এর পর আবার আমাদের পার্টির অধিবেশনে যদি যাতায়াত শুরু করেন তা হলে সেধে বিপদ ডেকে আনা হবে।'

বললাম, 'মশাই সে ভয় যদি থাকত তা হলে আমাদের এক সঙ্গে খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত। আপনার সম্বন্ধে অনেকেই

আমাকে সাবধান করে দিয়েছে এবং যদিও তারা আপনার কীর্ত্তি-কাহিনী আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছে তবু আরও খবর জানবার জন্যে আমাকে প্রায়ই ধড়পাকড় করে। আমি যদি বলি যে আপনার অতীত জীবন বা আপনার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কোন আলোচনা করি না এ তারা বিশ্বাসই করতে চায় না।'

তিনি বললেন, 'সে আমি জানি। আমাদের দেশের লোকেরা পরের ঘরের হাঁড়ির খবর বের করতে যেমন উদগ্রীব এমন আর অন্য কোন দেশের লোকেরা হয় না। ওরা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি যে বলেছে জানি না তবে তার কতটা সত্যি সে আপনাকে একদিন আমার পুরনো দিনের কথা বললে বুঝে নিতে পারবেন। বড়াই করবার মত কিছু হয় নি আমার জীবনে। দেশে একটা জাগরণ এসেছে এবং সেই ইতিহাসে আমি একটা অক্ষর মাত্র।'

তারপর একদিন শুনলাম তাঁর ইতিবৃত্ত। 'মশায় দক্ষিণেশ্বরের মামলার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। বোমাগুলি আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম সুটকেসে ভরে। আর আধ ঘণ্টা ওখান থেকে সরতে দেরী করলে পুলিসে আমাকেও জালে ফেলত।'

বললাম, 'দক্ষিণেশ্বরের বোমা তো অনেক দূরের লাফ। তার আগে কি ঘটনাচক্রে আপনি এরকম একটা জ্বলন্ত বিপ্লবী হলেন সেটা বলায় আপত্তি আছে কি?'

'না' বলে তিনি শুরু করলেন, 'আমি তখন খুব ছোট, বয়স দশ কি এগারো হবে। বিক্রমপুরে নিজেদের গ্রামে সোনারঙ-এ গিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি পুলিসে ঘেরাও করে খানাতল্লাসী আরম্ভ করল। শুনলাম, আমার সম্পর্কিত এক কাকা ও দাদাকে তারা ধরতে এসেছে। সর্ব্বদাই শুনেছি যে চোর বদমাশদের পুলিসে ধরে।

'আপনজনের মধ্যে এমন লোক আছে এবং তাদের ধরতে এরা এসেছে মনে করে নিজের উপর বেশ একটা ধিক্কার এল।

'কাকা ও দাদা পুলিস আসছে আগেই খবর পেয়ে উধাও হয়েছিলেন। পুলিস বাড়ির আর সকলের উপর খানিকটা তর্জন গর্জন ও গালি বর্ষণ করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে গেল।

'অবাক হয়ে শুনলাম যে বাড়ির লোকেরা কাকা ও দাদাকে পুলিসে ধরতে পারে নি বলে খুব তারিফ করছে ওঁদের উপস্থিত বুদ্ধির।

'যখন বললাম, পুলিসে ধরতে আসে এমন অপরাধীর সম্বন্ধে কি করে তাঁরা এ ধরণের নির্লজ্জ প্রশংসা করতে পারেন বাড়ির সবাই আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে তাঁরা চোর বদমাশ বলে পুলিসে তাঁদের ধরতে আসে নি।

'এঁরা বিপ্লবী দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। মোটামুটি বুঝলাম ব্যাপারটিকে।

'সেই থেকে আমার মনে দুটি কথা চিহ্নিত হয়ে গেল বিপ্লব ও স্বাধীনতা।'

বিপ্লবী সেন

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরেই বাংলাদেশে যে সব ছেলেমেয়েদের শুরু হয়েছিল বাল্য ও যৌবন, ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচেষ্টা তাঁদের জীবনে জাগিয়েছিল নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা।

এঁদের অনেকে এই আন্দোলনে ঘোরতর সক্রিয় কর্মী হয়ে পেয়েছিলেন কারাবাস অসীম নির্যাতন ও চরম দণ্ড। অন্যেরা কার্যত এই অভিযানে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও একেবারে নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি।

আপাতদৃষ্টিতে আজকে হয়ত অনেকের মনে হবে যে ভারতে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস ও গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ পন্থাই এর সাফল্যের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সন্ত্রাসবাদকে

নৈতিক কারণে অন্যায় পথ ভাবলেও এর প্রতিক্রিয়া যে ভারতের ভূতপূর্ব্ব শাসকশক্তির ভিত্তিকে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে আলগা করে দিয়েছিল তার প্রমাণ যদি আজ আমাদের সামনে স্পষ্ট না হয়ে থাকে ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস বড় বড় হরফে লিখে জানাবে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় কতখানি দান এই পথ বেয়ে এসেছিল।

এটাও ঠিক যে ভারতের বাইরে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন তদানন্তিন ব্রিটিশ রাষ্ট্র অধি-নায়কদের মনে এদেশের আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ছাপ লাগিয়েছিল। এই দুটি কারণ ব্যতিরকে ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দিন পিছিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভবনা ছিল।

সন্ত্রাসবাদ সূত্রপাতের প্রাক্কালে স্বাধীনতাকামী বাঙালী নওজোয়ানদের একটা বিশিষ্ট অবদান দিকে দিকে দেখা যেত 'দাদা' রূপে।

এমনি এক দাদার সম্মোহনে কৃষ্ণনগর শহরে স্কুল কলেজে পড়া ছেলেরা ভিড়েছিল তাঁর চারপাশে।

ইনি ছিলেন শহিদ অনন্তহরি মিত্র।

সাদাসিধে ধরনের এই স্পষ্টভাষী দাদাটির সান্নিধ্যে এসেছিলেন সেন।

সেনের পিতা ছিলেন এ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জন। হুগলী থেকে বদলী হয়ে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন।

যুগান্তর সমিতির দলভুক্ত অনন্তহরি তখন এই শহরে স্কুল কলেজের ছেলেদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন নৈশ-বিদ্যালয়, দরিদ্র-ভাণ্ডার সৎকার-সমিতি, আখড়া, লাইব্রেরি ইত্যাদি।

গান্ধীজী যুদ্ধমান সন্ত্রাসবাদী সব সমিতিগুলিকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি তারা তাদের উগ্র নীতিকে বন্ধ রেখে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সাহায্য করে তা হলে এক বছরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন।

এই সমিতিগুলির প্রতিশ্রুত এক বছরের নিষ্ক্রিয় আবহাওয়ায় অহিংস আন্দোলন পুরো মাত্রায় চালিয়ে গান্ধীজী এক বছরে স্বরাজ আনতে অপারগ তো হলেন বটেই উল্টে তিনি বছর শেষ হলে বন্দী হয়ে গেলেন কারাবাসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেওয়া চুক্তি শেষ হওয়ায় সন্ত্রাসবাদ আবার পুরোদমে চালু হয়ে গেল।

স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক আদর্শ সামনে রেখে যে সব ছেলেদের এতদিন অনন্তহরি নিরীহভাবে সমাজসেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন এই বার তাদের কানে শুনিয়ে দিলেন সংগ্রামের মন্ত্র। তাদের সামনে তুলে ধরলেন দেশা-বিদেশী বিখ্যাত বিপ্লবীদের অগ্নিময় জীবনাদর্শ।

তারা এইবার পড়তে লাগল। ভারতের ধর্মকাহিনী নয়, শহিদ বিপ্লবীদের জীবনচরিত।

সংগ্রামে দৃঢ়কল্প ও নির্ভরশীল কয়েকটি তাঁর অনুচর চাইল তাঁর কাছে অস্ত্রের সন্ধান।

তিনি বললেন, বিনা টাকায় অস্ত্রের সংস্থান কি করে হবে অতএব টাকার যোগাড় দেখ।

তারা বলল, ডাকাতি করে টাকার যোগাড় করবে।

কিন্তু অনন্তদার তাতেও আপত্তি।

তিনি বললেন, পরের ধন কেড়ে নেবার আগে নিজের যা আছে তাই দান করার পর তোমরা এই উপায় অবলম্বনের যোগ্য অধিকারী হবে।

এ যেন অনাথপিণ্ডদ চাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে সেনু আরম্ভ করলেন টুইশানি এবং পুরো রোজগারের দশ টাকা মাসে মাসে দিতে লাগলেন সমিতিকে।

নিজের ঘরে করলেন প্রথম ডাকাতি এবং সংঘে এনে দিলেন বাক্স ভেঙে চুরি করা নিজের মায়ের গলার সোনার হার।

এই প্রথম দীক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনি পেলেন একটি রিভলবার। তারপর চলল নদীর ওপারে গোপনে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস। সে সময়

নবদ্বীপে ডাক যেত ঘোড়ার গাড়িতে কৃষ্ণনগর হয়ে। একদিন রাত্রে কয়েকজন আটক করল সেই গাড়ি রাস্তায়। ডাকের রক্ষী হাতে গুলি লেগে জখম হল। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। পরের দিন সকালে সেনের পিতা যখন অস্ত্রোপচার করে বিদ্ধ গুলি বের করছিলেন আততায়ী সেন এই রক্ষীর সামনে দাড়িয়ে থাকলেও সে তাঁকে চিনতে পারে নি। ধরা পড়ে গেল কয়েকজন গুণ্ডা ও নিরপরাধীরা।

পুলিস ভাবতেই পারে নি যে এর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিতদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজনই বেশীদিন পুলিসের কৃপাদৃষ্টি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই সুচতুর ধরপাকড়ে পুলিসের কর্মনৈপুণ্যই পুরোপুরি দায়ী ছিল না।

এই সন্ত্রাসবাদ আমাদের দেশে দুর্বল স্নায়ু ও সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং ইংরাজ সম্রাটের বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজাবর্গের অনেককে ভীত ও মর্মাহত করায় তাঁরা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই পুলিসে খবর দেওয়া তাঁদের ধর্ম ও কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং এঁদের নজর এড়িয়ে কাজ করা বিপ্লবীদের সব সময় সম্ভব হয় নি।

পুলিসের বিস্তৃত জালে সন্দেহের কারণে সেন একদিন ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু বাস্তব প্রমাণের অভাবে তাঁকে প্রথম শিলচর ও পরে ফরিদপুর জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯২৭ সালে জেল থেকে বি, এ পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়ে সেন পিতার ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের সাহায্যে নানা চেষ্টায় বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়ার ও পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়ে সাগর পাড়ি দিলেন।

ব্রিটিশ সরকার ভাবল দুশমনের বুঝি এতদিনে সুমতি হল। সেন তখন রোমান্টিক স্বপ্ন দেখছেন যে সিভিল সার্ভিস পেয়ে তিনি সুভাষ বোসের মতন তাকে প্রত্যাখান করে আর একটি বঙ্গ-সন্তানের দৃঢ় চরিত্রের উদাহরণ দেখাবেন। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হল না। কারণ প্রথমবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয়বার তিনি যখন আবার প্রস্তুত

হয়েছেন তখন তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হল যে, পরীক্ষার্থী-দের সম্বন্ধে নিয়মের ছয় নম্বর আইন অনুযায়ী তিনি এই পরীক্ষার অযোগ্য পাত্র প্রমাণিত হয়েছেন। ছয় নম্বর আইনে লেখা ছিল : bad character।

ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট সেন ঠিক করলেন যে ছয় নম্বরের আইনে তাঁর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে।

ইতিমধ্যে বার্লিন থেকে তাঁর কাছে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আসছিল দুটি নাম-করা ভারতীয় বিপ্লবীর কাছ থেকে।

নলিনী গুপ্ত ও সৌম্যেন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কলিকাতার বোমার মাল-মসলা সরবরাহে আলাপ-পরিচয় আগেই হয়েছিল। এখন তাঁরা বার্লিনে বসে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে একটি বোঝা-পড়া করবার প্রচেষ্টায় উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

বার্লিনে পৌঁছে এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেন জানলেন যে, এক জার্মান অস্ত্রব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে তিনি ধারে ভারতে অস্ত্র রপ্তানি করবেন এবং দেশ স্বাধীন হলে পর তাঁর ঋণ শোধের ব্যবস্থা করা হবে। নমুনা হিসাবে এঁরা সেনের হাতে ছোট ও চ্যাপ্টা ধরনের সক্ষম দুটি রিভলবার দিয়ে অনুরোধ করলেন যে যেমন করেই হোক এই অস্ত্র দুটি দেশের বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

নমুনা দুটিকে ওভারকোটের পকেটে ফেলে সেন চললেন লণ্ডনে। ট্রেন জার্মান ও ফরাসী সীমান্তে থামলে ফরাসী কাস্টম অফিসার তাঁর ছোট স্যুটকেসটা পরীক্ষা না করেই খড়ির দাগ মেরে ছাড়পত্র দিল, সেন ভাবলেন একটা বিরাট সমস্যার শেষ হল। কিন্তু পরক্ষণেই সিকিউরিটি পুলিসের একদল এসে তাঁর কামরা ঘিরে ফেলল এবং তাদের অফিসার খানাতল্লাশি করতে ওভারকোটের পকেট থেকে বেরুল অতি নিরীহ চেহারার রিভলবার দুটি।

সেন গ্রেপ্তার হয়ে স্টেশনে তাদের অফিসে গেলেন। কিন্তু

অফিসারটি জেরার চেয়ে যেন সহানুভূতি-ভরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন।

বললেন, 'তোমরা কেন এই বৃথা চেষ্টা করছ, কারণ কয়েকটা রিভলবার দেশে চালান করে ইংরেজের বিরাট সামরিক শক্তিকে তোমরা হটাতে সক্ষম হবে এ ভাবাই বাতুলতা। তাছাড়া তোমাদের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জাতভাই বিশ্বাসঘাতকেরা। তুমি যে মাল-সুদ্ধ ধরা পড়লে এ তাদেরই ছলনায়। ফরাসী জাতির ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই। তাই যদিও আইনত তোমাকে এই অপরাধের জন্য জেলে পাঠানো উচিত, আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। ব্রিটেনের বন্দরে পৌঁছলে ইংরেজ পুলিস তোমার যথাযথ ব্যবস্থার জন্যে তৈরী হয়ে আছে।' এই বলে অফিসারটি সেনের রিভলবার দুটি বাজেয়াপ্ত করে ট্রেনে উঠবার হুকুম দিলেন।

ব্রিটিশ বন্দরে পৌঁছতেই পুলিস সেনের পাসপোর্টটি কেড়ে নিল, কিন্তু গ্রেপ্তার করল না।

তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে এখন তারা তাঁকে নজরে রেখে জানতে চাইবে তাঁর সহকর্মী আর-কেউ এই কাজে লিপ্ত আছে কিনা!

লণ্ডনে সেনের সঙ্গে গুহ নামে এক বাঙালী ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেনের ঘরে এসে গল্প করে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরতেন।

সেন মাঝে মাঝে গুহকে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতেন। বন্ধুমহলে তাঁর হাতের রান্নার খুব প্রশংসা ছিল। গুহ ছিলেন রীতিমত মদ্যপ। একদিন বেশ মত্ত অবস্থায় সেনের কামরায় উপস্থিত হয়ে দারুণভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। হতবাক সেন ভাবলেন, ভদ্রলোক নেশার ঘোরে এমন কান্না-পাগল হয়ে পড়েছেন।

তাঁর কান্নার বেগ কিছুটা প্রশমিত হলে তিনি সেনকে বললেন, 'আপনি আমাকে এ ভাবে ছেলেমানুষের মত কাঁদতে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছেন!'

সেন জানালেন, মানুষ মনে কষ্ট পেলে কেঁদে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেবল তিনি কামনা করেন যে কারণে তাঁর মনোবেদনা হয়েছে তার থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি যেন শান্তি লাভ করেন।

ভদ্রলোক তখন কান্নার উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে বললেন, 'আজ আপনার কাছে একটা দারুণ অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে এসেছি কিন্তু কাপুরুষ আমি এখনও বলবার সাহস পাচ্ছি না বলেই কেঁদে ঢাকবার চেষ্টা করছি আমার অক্ষমতাকে।'

আরও অনেক ভনিতা করার পর ভদ্রলোক যে কাহিনী সেনকে শোনালেন তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গুহ দেশে বোমার কেসে জড়িত কয়েকজন কর্মীদের জানতেন এবং পুলিস সে খবর পেয়ে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাদের নাম ঠিকানা জেনে গ্রেপ্তার করে ফেলে। এই সৎকার্যের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করে গুহকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলেতে এবং তাদের সুপারিশে তিনি রোলস্‌রয়েস্‌-এর কারখানায় মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শেখবার সুযোগ পান। এর আগে আর কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে এত দুর্লভ সুযোগ জোটে নি।

কর্মীদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার পর তিনি দেশে থাকলে অপর কর্মীরা যে তাঁর পঞ্চত্বের ব্যবস্থা সুচারুরূপে সম্পন্ন করত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

গুহ অবশ্য পুলিসের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে তাঁকে এ-ধরনের ফেউ-এর কাজে আর ডাকা হবে না। কিন্তু লণ্ডনে আসতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একদিন গুহর ডাক পড়ল এবং তাঁকে বলা হল যে একটি ভারতীয় ছাত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে নজর রেখে তাঁকে বরাবর পুলিসে খবর জানাতে হবে।

তিনি তাদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করলে তারা বলল, এ তো কিছু শক্ত বা বিপজ্জনক কাজ নয়। তাঁকে যেমন করে হোক

সেনের বন্ধু হতে হবে এবং তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সাহচর্য করে প্রতিদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার পথে পুলিসের অফিসে গিয়ে কেবল মুখে বলে আসতে হবে কথোপকথনের মোটামুটি ভাষ্য ও অতিথি কেউ এসে থাকলে তাঁদের নাম ও পরিচয়।

সেনের আর-একটা কার্জ ছিল: ভারতে নিষিদ্ধ এমন বহু রাষ্ট্রবিপ্লবী ও রাজনৈতিক বই, সাধারণ পত্রিকা ও রোমাঞ্চক কাহিনী-মূলক বইয়ের মলাটে ঢেকে দেশের গণ্যমান্য লোকেদের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া।

বাক্স-ভরা এই বইগুলি নেহরু, ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, মালবিয়া, ডাঃ বিধান রায় প্রভৃতির নামে পাঠালেও পৌঁছে যেত ঠিক দেশের গুপ্ত সমিতির সদস্যদের হাতে। কিন্তু গুহ একদিন দেখেছিলেন সেনের ঘরে এমনি একটি পাঠাবার জন্য তৈরী বাক্স। তারপর সেন যতগুলি বাক্স ভারতে পাঠিয়েছিলেন গুহের কাছে এই প্রথম জানলেন যে সেগুলি গন্তব্যস্থানে পৌঁছয় নি।

তিনি সেনকে বললেন, 'এই ভাবে গত ন' মাস আপনার বন্ধুত্ব ও আতিথ্য গ্রহণ করে প্রতিদিন দেশদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এখন আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়েছি উপযুক্ত শাস্তি পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।'

এ রকমের নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় মেলে বইয়ের পাতায়। বাস্তবে তার সম্মুখীন হয়ে সেনের মনে হল, যেন এক বীভৎস জানোয়ার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তিনি শুধু বলতে পারলেন, 'মশায়, অনুগ্রহ করে এখন আমার ঘর ছেড়ে বাড়ি যান।'

গুহ জিজ্ঞাসা করলেন, আর বোধ হয় তিনি সেনের কামরায় আসতে পারবেন না ?

সেন বললেন, 'না, তা কেন ? আপনি যেমন আসছিলেন তেমনি আসুন। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এই কাজের জন্যে আপনাকে যে ইনাম দেওয়া হয় তার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতে চাই না। আর

তাছাড়া আপনি না এলে আমার অন্য বন্ধুদেরও হয়তো আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করব যে তাদের মধ্যেও রয়ে গেছে আপনার মতন মনোবৃত্তিসম্পন্ন বন্ধু। তাই সন্দেহটা আবদ্ধ থাক্ একজনেরই উপর।'

যে জাতীয়-সংগ্রামের অভিযান দেশে চলেছিল তারই তরঙ্গ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে এনেছিল নব আশার বার্তা, উত্তম ও সংকল্প।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা গড়েছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন এক বিরাট ছাত্রসমাজ। সাকলাতওয়ালা প্রমুখ স্বরাজ্য সংগ্রামের অগ্রদূতেরা প্রবাসী ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন একটা পরিস্ফুট রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শ।

১৯০০ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত ভারতীয় সাম্যবাদী ছাত্র সমিতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভারত-শাসন-প্রণালীর ওপর অবিরত তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যান।

এই সময় লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ডাঃ মুল্কুরাজ আনন্দ্ হন তার সেক্রেটারি। বেন্ ব্রাড্লে, হাচিনসন ও ফিলিপ প্রাট্-এর মত মীরাট ষড়যন্ত্রের কম্যুনিস্ট অধিনায়করা প্রথমে আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতীয় ছাত্রদের হাতে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। পরিশেষে স্বাবলম্বী হয়ে ভারতীয় ছাত্ররা নিজেরা দল সংগঠন করেন এবং ঠিক হয় যে পারী শহরে তাঁরা কার্যপরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করবেন।

সেন লণ্ডনে আধবেলা ডাঃ সিংহের বইয়ের দোকানে কাজ করতেন। এখানে বই বেচা ও পড়া দু কাজই একসঙ্গে হত। আধবেলা ইণ্ডিয়া-অফিস-লাইব্রেরিতে গবেষণামূলক পড়াশুনা করে ও বাকী সময়টা রাজনৈতিক কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এখন তিনি লণ্ডনের পাট উঠিয়ে পারীতে এসেছেন নতুন কেন্দ্রের কাজে।

পারীতে সেনের কয়েকজন বন্ধু তাঁকে একবার জানাল যে

পলাতক মানবেন্দ্র রায় দেশে ফিরতে চান, তার জন্যে একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ অন্য কারুর পাসপোর্ট নিয়ে জাল মানুষ সেজে দেশে ঢোকবার চেষ্টা করতে হবে।

সেন তখন লুব্ধ পকেটমারের মত ওত্ পেতে থাকতেন কার কাছ থেকে এই অমূল্য ছাড়পত্রটি হস্তগত করা যায়। তাও আবার এমন লোকের পাসপোর্ট হওয়া চাই, যার সঙ্গে জাল অধিকারীর খানিকটা সাদৃশ্য থাকে।

উপায় মিলল একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে। সেন লণ্ডন থেকে আগত একজন ভারতীয় ও আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভেয়ারসাই দেখতে। সেখানে একটি কাফেতে ভারতীয় ছাত্রটি বাথরুমে যাবার সময় সেনকে তাঁর রেন কোটটা রাখতে বললেন। বেশ নিপুণ পকেটমারের মত কোটের পকেটগুলি হাতড়াতে সেন পেয়ে গেলেন ভদ্রলোকের পাসপোর্টখানা। কোন এক ওজর দেখিয়ে অপর একজনের জিম্মায় কোটটি দিয়ে সেন তখন ছুটেছেন পারীর গাড়ি ধরতে।

সেই পাসপোর্ট নিয়ে মানবেন্দ্র রায় ফেরেন ভারতে এবং প্রায় দেড় বছর পরে যখন তিনি ধরা পড়েন তখনও সেই পাসপোর্টের অধিকারীর নামেই তিনি পরিচিত।

সেনকে একদিন প্রশ্ন করলাম, তিনি কেন আমাকে তাঁর দলে টানবার কোনও চেষ্টা করেন না যেমন তাঁকে তাঁর সহকর্মীরা টেনে নিয়েছিল?

তার উত্তর এল, 'আমাকে কেউ তো টানে নি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমার মনকে তৈরি করেছিল এবং এই ভাবে যাদের মন হয়েছিল সজাগ তারা নানা যোগাযোগে জোট বেঁধেছিল, কারণ তাদের উদ্দেশ্যটা ছিল একই ধরনের। আপনি শিল্পী আপনি থাকবেন শিল্পের কেন্দ্রে শিল্পীদের সঙ্গে। আপনাকে একটা বিপ্লবী বা সোলজারে পরিণত করা মানে দেশের ক্ষতি করা। স্বাধীনতা আনব আমরা লড়াই করে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠায় গড়বার কাজে প্রয়োজন হবে শিল্পী,

সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের। আমাদের বন্ধুত্ব ও দেশাত্মবোধটা থাক্ একত্র, কিন্তু আমাদের পেশাটা রেখে দেব স্বতন্ত্র।'

এর পর মাসের পর মাস কেটে গেল সেনের সান্নিধ্যে কিন্তু আমাদের শিল্প ও সাহিত্যে ছাড়া রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনা আর হয় নি।

ম্যাটেভিয়েস্কী

ফৈয়ে জেন্‌ভিয়েভে প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যার সময় স্বল্পমূল্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীর ভিড় লেগে যেত তার মধ্যে সাদা, কালো, বাদামী, হলদে মানুষের ভেদাভেদের বালাই ছিল না।

হৃদ্যতা-ভরা করমর্দন অচেনাকে এই মিলন-মন্দিরে চেনা করে দিত বিনা আড়ম্বরে এবং দু-এক দিনের আলাপের পরেই 'মো ভিয়ো কি মা ভিয়েই' বলে নিকট-বন্ধুত্বের সম্বোধন এনে দিত মিত্রতার সান্নিধ্য।

স্লাভ জাতীয় সব কটি বিশেষণকে চেহারা ও আচরণে পরিস্ফুট করে এই ফৈয়েতে আসতেন ব্রনিস্‌লাভ্ মাটেভিয়েস্কী। তাঁকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বেশ ব্যগ্র দেখা যেত। কিন্তু অপর পক্ষ তাঁর অগ্রসরের আভাস পেলেই কোন অছিলায় সরে পড়বার চেষ্টা করত। এই ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক আদর্শ ছাত্র সম্মেলনে কেমন যেন অপাংক্তেয়—তার কারণ, প্রথমে বুঝি নি।

একদিন তিনি আমাকে 'আমি ম্যাটেভিয়েস্কি, আপনি নিশ্চয়ই ভারতীয়। আপনার নাম বললে বাধিত হব' বলে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন। আলাপের পর তিনি আমার পাশে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। সেগুলি তুবড়ি বিস্ফোরণের বেগে আসতে লাগল এবং ততোধিক বেগে আসতে লাগল সদা লালাসিক্ত মুখের ছিটে-ফোঁটা। দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সেই মুখনিঃসৃত বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার

চেষ্টাও বৃথা। কারণ প্রশ্নের গুরুত্ব ও আগ্রহকে জোরালো করতে তিনি ঝুঁকে পড়ে আরও কাছে মুখ নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, সেই মুখবিবর থেকে একটা দুঃসহ গন্ধ আসছিল, সেটা ফরাসী সুরার স্থায়ী খোসবু কিংবা হ্যালিটোসিস নির্ণয় করার আগে তার গ্যাসে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

এ অভিজ্ঞতা অবশ্য আমাদের দেশে খুব সাধারণভাবে হয়ে থাকে। সাধারণত এই দুর্গন্ধ-ভরা মুখের অধিকারীরা, অন্যে সেই দুঃসহ গ্যাসের পরিধির মধ্যে পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকেন, নিজের নাসিকা সেই গন্ধে অভিভূত হয় না বলে।

ওদেশে শারীরিক কোন ত্রুটির কথা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো অসৌজন্য। তবুও ম্যাটেভিয়েস্কীকে অনুরোধ করলাম যে যদি তিনি আমার পরিচয়কে দীর্ঘায়ু করতে চান, তাহলে তাঁকে কথা বলার সময় মুখ দূরে রেখে একটা ব্যবধান বজায় রাখতে হবে। তিনি তো প্রথমে এই আকস্মিক রূঢ়তায় থ' হয়ে গেলেন। পরে হেসে বললেন, 'জান হে, তোমার মতন এমন স্পষ্টবাদী লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি। এখন আমি বুঝি, কী জন্যে সবাই আমায় এড়িয়ে যেতে চায়।'

কিন্তু ম্যাটেভিয়েস্কীর এই একটি ত্রুটিকে শুধু যে লোকে এড়াবার চেষ্টা করত তা নয়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষার বেশ কতকগুলি অভিধান থাকত এবং নানান ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তিনি তাদের ভাষায় আলাপের চেষ্টা করতেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে 'এঁ্যা মম সিল্ ভুপ্লে' বলে তাঁদের থামিয়ে না-বোঝা কথার অর্থ অভিধান খুলে দেখে নিয়ে তারপর শব্দটিকে দু-তিন বার আবৃত্তি করে বলতেন 'কন্‌তিনিউয়ে' অর্থাৎ এখন বলে যাও। এরই জন্যে ছাত্রছাত্রী মহলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'ম্যঁসিয় লো ডিকসনেয়ার্'।

ভদ্রলোকের আরও একটি দুর্বলতা ছিল, সুন্দরী ছাত্রী বা যুবতী

দেখলে তার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা। তিনি ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-একটি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেছেন এবং পারীর ফাকুলতে দু দ্রোয়ায় তিনি 'ইকনমিক পলিতিক' সম্বন্ধে গবেষণা করে আর-একটি ডক্টরেট অর্জনের ব্যবস্থা করছিলেন।

তাঁর নিমন্ত্রণে একদিন ছ তলার উপরে চিলে কোঠায় অ্যাটিক ঘরে গিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল দিভানের পাশের দেওয়ালে লাগানো অসংখ্য কিশোরী ও যুবতীদের ফটোগ্রাফ।

জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, তবুও শুধালাম যে, বন্ধুবরের কোনদিন এদের তাঁর হারেমে রাখবার ইচ্ছা ছিল কি না ?

তিনি বললেন, 'এদের অনেকেই আমি চিনি না। রাস্তায় দেখা হলে তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি শুধু একটি ফোটো তোলবার অনুমতি ভিক্ষা করে এই সংগ্রহকে তৈরি করেছি।' তারপরে তিনি এই ছায়াগুলির অধিকারিণীরা কে কোন্ দেশীয় তার পরিচয় দিতে লাগলেন।

ঘরের এক কোণে ছিল একটি বেহালা এবং স্ট্যাণ্ডের উপর রাখা মিউজিক স্কোরের কয়েকটি শীট্। কাছে গিয়ে দেখলাম, সেটি মোৎসার্ত-এর 'ভায়েলিন কনচারতো'।

তিনি দুটি বিরাট পোর্সেলিনের বাটিতে গরম জল ঢেলে ঝাঁজরা-করা বড় মাদুলির মত চেনে বাঁধা একটি অ্যালুমিনিয়ামের আধারে চা ভরে সেটা জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নেড়ে চায়ের সুরুয়া বানিয়ে তাতে আধখানা পাতিলেবুর রস নিংড়ে বললেন, 'চিনি সংযোগের প্রয়োজন বোধ করলে, নিজেই নিও।'

কাছে একটি কাগজের বাক্সয় মিনিয়েচার সাইজের ফরাসী চিনির ইট পাঁজার মত সাজানো ছিল। তারই গোটা কয়েক মিশিয়ে কোনমতে এই চা পান করা গেল।

আলাপ ঘনীভূত হলে জানলাম ম্যাটেজিয়েস্কী হচ্ছেন উৎকট রকমের জ্ঞানপিপাসু।

ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তেবাসীর সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা বিদ্যায়তনে প্রবেশের পর থেকেই গবেষণায় এমন মেতে যান যে বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছোট হতে হতে তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।

বিদ্যায়তনের পরিধির মধ্যেই তাঁরা স্বাচ্ছন্দতা অনুভব করেন আর বাইরে এলেই তাঁদের ভাবে, আচরণে, মনে হয় যেন বাড়ির ইট-কাঠরার ভিড়ে তাঁরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন এবং সব সময়েই অন্য পেশার লোকেদের আলাপ-পরিচয়ের হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

একটি গবেষণা বা থিসিস্ শেষ হওয়ার আগে বিদ্যায়তন ছেড়ে যাবার ভয়ে তাঁরা আর-একটি গবেষণা বা থিসিস্ লেখার ব্যবস্থা করে ফেলেন। যদি বিদ্যায়তনে অধ্যাপনার কাজ জোটে তা হলে তো তাঁদের সর্বোদ্ধার হয়ে যায়, তা হলে কোন-না-কোন অছিলায় তাঁরা থেকে যান আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে।

বুঝলাম, মাঢ়েভিয়েস্কী এরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সামান্য-মাত্র বৃত্তি পেয়ে রাত্রে কোন ব্যবসায়ীর অনুবাদকের কাজ করে কোন মতে তাঁর বাসস্থান ও আহারের সংস্থান হয়ে যায়।

একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অপরদিকে তাঁর তেমনি ছিল মেয়েদের ব্যাপারে পাগলামি। এ যেন সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন ব্যক্তির এক অদ্ভুতভাবে পরিস্ফুট ডাইকোটমি।

তিনি যে এত ইউরোপীয় ভাষা কেবল অভিধানের সাহায্যে এবং প্রশ্নোত্তরকারী লোকেদের বিরক্তি কুড়িয়ে আয়ত্ত করেছিলেন তার মূলে ছিল সেই ভাষাভাষী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলে তাদের মাতৃ ভাষায় মধুর সম্ভাষণ অকৃত্রিম ভাবে করতে পারবেন বলে। তাঁর কথার বিষয়বস্তু ঘুরে ফিরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক রূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় দাঁড়াত।

একদিন মাঢ়েভিয়েস্কির সঙ্গে এক স[illegible] যেতে মেট্রো

ট্রেনে উঠতেই তিনি বললেন, 'এ কামরায় যাব না, অন্য কামরাতে চল।' সে কামরায় অনেক আসন খালি থাকা সত্ত্বেও তিনি জিদ করে উঠলেন অন্য কামরায়। সেটায় ছিল ভীষণ ভিড়। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'ও কামরায় দেখলাম একটিও মহিলা বসে নি। একটিও মহিলার মুখ যে যানবাহনে দেখা যায় না, তাতে চড়ে গেলে আমার মনে হয় যেন আমি শবদেহবাহী গাড়িতে বসে আছি। এর চেয়ে ভিড়ে-ভরা গাড়িতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অনেক ভাল, কারণ মেয়ে-যাত্রীদের সুন্দর মুখগুলি ফুল দেখার মত নিরীক্ষণ করে যাত্রার বিরক্তি ও ক্লেশকে ভুলে থাকা যায়।'

তাঁর এসব উক্তি শুনে মনে হবে যেন তিনি একটি উৎকট রকমের ডন্ জুয়ান। কিন্তু বাস্তবে তিনি মেয়েদের সান্নিধ্যে রীতিমত লাজুক হয়ে সামাজিক শিষ্টাচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাতেন এবং সাহস করে বড় জোর তাদের সুশ্রী ও সুসজ্জার দু-একটা মামুলী প্রশংসাবাদ ছাড়া আর-কিছু বিশেষ রোমান্টিক কথা বলতে অক্ষম ছিলেন। তখন তাঁর আচরণ দেখে মনে হত না যে, রোমান্স-সন্ধানী যুবকের প্রেমসঞ্চারী অগ্রসর ; এ যেন, কোন বাৎসল্য-স্নেহে অভিভূত খুড়ো কি জ্যেঠার, ভাইঝির কাছে কুশলাদি সংবাদ নেওয়া।

তখন নভেম্বরের শেষ। সিতে ইউনিভারসিটিতে এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যেতে আমি ও ম্যাZেভিয়েস্কী মোপারনাসে মিলিত হয়ে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছি। সেই বিশাল চওড়া বুল্ভার আর তার অতি প্রশস্ত ফুটপাথে অনেক পথচারীর ভিড়কেও বেশ পাতলা দেখাচ্ছে।

হঠাৎ আমাদের সামনে ছেঁড়া-পোশাক-পরা একটি বৃদ্ধা অতি সঙ্কোচে হাত চিতিয়ে আমার অচেনা ভাষায় কী একটা বললে। তার পোশাকের কাটছাট ফরাসীনীদের অঙ্গবস্ত্রের ঢঙ থেকে যে বেশ অন্য রকমের তা এক পলকের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছিল। ফরাসী দেশে ভিখারীর হাত পেতে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব বিরল ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধাটিকে সেই জাতীয় ভিখারী বলে মনে হল না।

ম্যাটেভিয়েস্কী তাঁর ভাষাতেই কী একটা বলতে সে তাঁর হাত ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

বন্ধু সংক্ষেপে জানালেন, যে মহিলাটি অন্তর্বিপ্লবে বিধ্বস্ত স্পেন থেকে পলাতকের গড্ডলিকাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এসে পড়েছেন এই বিলাস ও সুখানন্দে আপ্লুত পারী নগরীতে। ফরাসী ভাষা না জানায় দিশেহারা মহিলা দু দিন যাবৎ না পেয়েছেন আহার্য, না পেয়েছেন আশ্রয়। ভিক্ষায় অনভ্যস্তা তিনি, আনাড়ির মত হাত পাতায় পথচারীদের করুণা জাগাতে অক্ষম হয়েছেন এবং ফরাসী ভাষা না জানায়, কাউকে জানাতে পারেন নি তাঁর দুর্দশার কথা।

বৃদ্ধাকে আমরা একটি কাফেতে বসিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করলাম। খাওয়ার শেষে যখন তাঁকে কফি দেওয়া হল তিনি কাপটি অতি সন্তর্পণে নাকের কাছে তুলে তার তীব্র গন্ধকে বেশ একটা দীর্ঘ আঘ্রাণ করে চোখ বুজে বললেন, 'আঃ! ক্যাফে।' যেন কতদিনের আকাঙ্ক্ষার দুষ্প্রাপ্য পানীয় আজ তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করে সেই অমৃত পানীয়ের আস্বাদনকে যত দীর্ঘজীবী করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ম্যাটেভিয়েস্কি ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় তার সঙ্গে আলাপ করে জানালেন যে, বার্সিলেনোয় বোমা বর্ষণের পর শহর ও শহরতলীর লোকেরা ভয়বিহ্বল হয়ে পালাতে শুরু করে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল ফরাসী সীমান্ত। একটা বিরাট বিভীষিকার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের প্রথম প্রচেষ্টা।

প্রথমে একটা বিশৃঙ্খল সন্ত্রস্ত জনসমষ্টি পথে চলতে ঘটনাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সে কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছতে আবার সে জমাট বাঁধা রেফুজির দলে ধরেছিল ভাঙন। সেই ভাঙনের একটা ভাঙা টুকরো ছিল এই বৃদ্ধা। এক বিভীষিকার করাল গ্রাস থেকে পালিয়ে এসে আর-এক ভয়ঙ্করের সামনে পড়েছে।

স্প্যানিশ রেফিউজি

পারী নগরীর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এই রেফিউজি বৃদ্ধাকে কেবল সামান্য আহার্য দিয়ে পুনরায় তাকে অনিশ্চিত ভাগ্যের অন্ধকার পথে ঠেলে দিতে আমাদের হৃদয়ে কেমন একটা মোচড় দিতে লাগল। তাকে বাঁচাতে হলে চাই আশ্রয়, চাই আহার্য, চাই মানবীয় সহানুভূতি। আমরা তাকে নিয়ে গেলাম পুলিস থানায় যদি সেখান থেকে সাহায্যের কোন কিনারা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা খুব ধমক খেলাম। আমাদের বলা হল বিদেশী ছাত্র এ রকম পলিটিক্স্-এ মাতামাতি করলে এদেশ থেকে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে।

আমরা যখন বললাম, 'একজন দুঃস্থা রেফিউজির আশ্রয়ের সন্ধানের সঙ্গে পলিটিক্স্-এর কী সম্বন্ধ?'

কোতোয়ালির কর্তা জবাব দিলেন, 'সব স্প্যানিশ রেফিউজিরা 'সাল্ কমিউনিস্ত্' অর্থাৎ অতিশয় বদলোক।

দু-একজন দর্শক যাঁরা আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন আমরা কোতোয়ালিতে চীরবসনা এক বৃদ্ধাকে নিয়ে কী নালিশ করতে এসেছি, তাঁদের একজন বললেন জুভিসির কাছে 'প্যাভিয়ঁ ব্লো'তে তিনি অনেক স্প্যানিশ রেফিউজির সমাবেশ দেখেছেন। সেখানে বোধ হয় বৃদ্ধার একটা ঠাঁই মিলতে পারে।

আমরা ঠিক করলাম সে রাতের মত এক হোটেলে মহিলাটির থাকার ব্যবস্থা করে পরের দিন তাকে প্যাভিয়ঁ ব্লোতে পৌঁছে দেব।

রিপাবলিকান্ স্প্যানিশ সরকার ও ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ট দলকে নিয়ে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তাতে হিটলার ও মুসোলিনী অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য, বিমান ও বোমাবর্ষণের ফলে স্পেনকে বিধ্বস্ত করলেও বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন শান্তিবাদী নিয়ন্তারা নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে

এই ধ্বংসনীতির সমর্থন করেন না বলে তাঁরা দু-একটি ভদ্রোচিত মৃদু আপত্তি করেছিলেন মাত্র।

ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব রিপাবলিকের জন্ম দিয়ে জগতে স্বাধীনতাবাদী জনগণের মনে এনেছে একটা স্থায়ী আকর্ষণ। তাই যে কোন রিপাবলিক পীড়িত হলে সহানুভূতির জন্য সকলে মুখ তুলে চায় ফ্রান্সের দিকে।

তদানীন্তন ফরাসী সরকার স্পেনের এই পীড়ন সম্বন্ধে একেবারে যে নির্বিকার নন, তাই দেখাতে, পলাতক রেফিউজিদের বিনা বাধায় সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সে আসতে বাধা দেন নি। তাদের জন্যে সীমান্ত খুলে দেওয়ার মাহাত্ম্যটুকু সংবাদপত্রের প্রশস্তিতে বেশ ভাল করে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া স্প্যানিশ রেফিউজিবা ফরাসী সরকার থেকে কোন সাহায্য পায় নি।

সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে জগতের সব দেশের চেয়েও তখন কমিউনিস্টদের সংখ্যা ফ্রান্সে ছিল সর্বাধিক। এবং ফবাসী রাষ্ট্রীয় শক্তিব তাকে বিধ্বস্ত করার মত সামর্থ্য না থাকায়, ফরাসী বামপন্থীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছিল। প্রকাশ্যভাবে না করলেও পরোক্ষ-ভাবে ফরাসী রাষ্ট্রনিয়ন্তারা তাদের এই পরিবর্তনকে খর্ব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

পলাতক স্প্যানিশদের ধরে নেওয়া হয়েছিল রিপাবলিকান সরকারের পক্ষপাতী অর্থাৎ বামপন্থী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ফরাসী সরকার এই স্প্যানিশ রেফিউজিদের ক্যাম্পে গণ্ডীর মধ্যে আটকে নিয়ম জারী করে তাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করল অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে তাদের কয়েদ করে রাখল। জায়গায় জায়গায় রেফিউজিরা একজোট হতেই পুলিসের লোক এসে সেগুলি যে রেফিউজি ক্যাম্প তার ঘোষণা সরকারীভাবে করে দিল। এই হতভাগ্যদের থাকবার ও খাওয়ার সাধ্যমত আয়োজন কেবল বামপন্থী নাগরিক ও কম্যিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের কাছ থেকেই এসেছিল।

প্যাভিয়ঁ ব্লো-র ক্যাম্পে ছিল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা শহরের অপেরা ও সঙ্গীতালয়ের কয়েকজন সুর-সংগতকারীরা। এদের প্রযোজনায় ক্যাম্পের কিশোর ও কিশোরীদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল স্পেনের পল্লীনৃত্য-সংগীতের একটি দল। তারা জুনেস্ দাস্‌প্যান্ নাম দিয়ে ফ্রান্সের শহরে গ্রামে নেচে গেয়ে ক্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত রেফিউজিদের অন্নবস্ত্র সংস্থানের কিছুটা ব্যবস্থা করতে পেরেছিল।

ম্যাটেভিয়েস্কী ও আমি রেফিউজি-রিলিফ ভলেন্‌টিয়ারদের দলভুক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এদের খাদ্য বস্ত্রাদির ব্যবস্থার চেষ্টা দেখতাম।

ক্যাম্পে এতগুলি মেয়েদের সমাগম ম্যাটেভিয়েস্কীর ক্যামেরাকে ব্যস্ত রাখত। আমি আমার সাধ্যমত প্লাম, অ্যাপল বা পেয়ার কিনে থলে ভরে যেতাম ক্যাম্পে এবং এই ফলের অংশ প্রত্যেক ক্যাম্পবাসীর হাতে কিছু-না-কিছু পড়ত। ম্যাটেভিয়েস্কী নজরে-পড়া কোন মেয়ের পক্ষপাতিত্ব করে আনতেন রঙিন রুমাল, আতর এবং এর ফলে আর সকলে ঈর্ষান্বিতা হয়ে বেশ বিরূপ হত। এই সব মেয়েরা একে একে ম্যাটেভিয়েস্কীর দেওয়া জিনিস দু-একবার গ্রহণ করার পর অপরের বিরক্তিভাজন হবার ভয়ে, তারা যে তাঁর অনুরাগী নয়, তাই স্পষ্টভাবে দেখাতে তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য করত।

ভলেন্‌টিয়ারদের মধ্যে আর কেউ এই রকম বিশিষ্টভাবে একজনকে বন্ধুত্ব বা স্নেহের ভাগ দিয়ে অন্যদের ঈর্ষান্বিত করে তোলে নি। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছলেই, ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যেত। তারা সব আমাদের ঘিরে গলা কাঁধ ধরে ঝুলে চিৎকার করত, "ওরে, এরা সব এসে গেছে।" তারপর হাত পেতে বসে যেত, যা এনেছি তা পাবার প্রত্যাশী হয়ে।

একদিন ম্যাটেভিয়েস্কী আমাদের একলা পেয়ে বললেন, 'জানি না, তোমরা কি যাদুতে এদের সব বশ করে ফেলেছ—আমাকে শিখিয়ে দাও। সকলেই তোমাদের অনুগত থাক্, আমি চাই কেবল একজনেরই

বন্ধুত্ব বা স্নেহ।' আমরা তাঁকে বলে বোঝাতে পারলাম না যে, তাঁর দৃষ্টি নিয়ে আমরা কোনদিন চাই নি এই রেফিউজিদের প্রতি স্নেহ বা ভালবাসার প্রতিদান। ঘটনাচক্রে হতভাগ্য এদের হৃদয়কে ভাগবাটরা করবার প্রবৃত্তি দেখানো অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন।

রেফিউজি ক্যাম্পের বাইরে একটি জিপ্সীর দল ক্যারাভ্যান নিয়ে যুদ্ধ-ক্ষুব্ধ স্পেন থেকে পালিয়ে আড্ডা নিয়েছিল।

তারা নিজেদের রেফিউজি বলে গণ্য করে নি এবং তা কাউকে ভাবতেও দেয় নি। তারা স্প্যানিশ জিপ্সী হলেও ক্যারাভ্যানই ছিল তাদের প্রকৃত দেশ।

স্থায়ী বাসিন্দাদের রাজনৈতিক কোন ব্যাপারে তারা আকৃষ্ট ছিল না, কারণ তাদের জীবনে গণতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সত্তার কোন অর্থই নেই।

শ্রেণীগত একটা নীতি ও আচারের খসড়াকে অবলম্বন করে চলে যায় জিপ্সীদের সমাজ ও জীবন। এদের কিশোরী যুবতীরা পথচারীদের হাত দেখে ভাগ্য গণনা করে বা নাচ দেখিয়ে, গান গেয়ে রোজগারের উপায় দেখে। যুবকেরা ক্যাফের সামনে বাজনা বাজিয়ে বা সামাজিক সম্মেলনে মেয়েদের নাচে গানে সংগত করে পারিশ্রমিক পাবার চেষ্টা করে। উপায়ান্তরে হয়ে যায় মুটে মজুর। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা ক্যারাভ্যানের দৈনন্দিন গোছগাছ বা রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা কেবল খোসগল্প বা ধূমপানে সময় কাটিয়ে দেয়।

পথেঘাটে লোকের অলক্ষ্যে জিনিসপত্র হস্তান্তর করা এদের কাছে চুরি নয়। ভগবানের দেওয়া জিনিস যে নিয়ে নিতে পারে বিনা গোলমালে, সেইটাই হয়ে যায় তার ন্যায্য পাওনা।

আমি বহু চেষ্টা করে চুরি করা পাপ এ কথা কোনমতে তাদের বোঝাতে পারি নি। তারা বলত, 'ও পাপ করে কেবল সমাজের স্থায়ী বাসিন্দারা।'

এদের দলপতি খুয়ান্-এর ছিল ক্যারাভ্যানে একাধিপত্য।

যুবকদের মধ্যে আংখেলো ছিল সবচেয়ে অলস ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। রোগা ছিপছিপে ছিল তার চেহারা এবং একটি চোখ কানা। কিশোর বয়সে কে নাকি তার স্নেহমুগ্ধা মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর স্পর্ধা দেখানোতে তার সঙ্গে লড়াই হয়ে যায় এবং এই ভালোবাসার একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক রয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ছুরির ঘায়ে হারানো একটি চোখ।

খুয়ান্ এবং ক্যারাভ্যানের আর সকলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। এরা বলত যদি কোন দেশকে এদের পিতৃভূমি বলে স্বীকার করতে চায়, তাহলে সে দেশ হবে হিন্দুস্থান।

কারণ এদের দৃঢ় বিশ্বাস এইখান থেকেই ঘর-বিবাগী হবার কোন প্রেরণায় এদের পূর্বপুরুষরা বেরিয়ে পড়েছিলেন দিকে দিকে বাঁধা-ধরা দেশ ও জাতির গণ্ডী-মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই কোন সুদূরে বিস্মৃত টানে আমি হয়ে গেলাম তাদের ভাই।

রাত্রে গলে ধ্বসে-যাওয়া আলু পেঁয়াজের স্যুপে রুটি ভিজিয়ে নৈশাহার শেষ করে যখন তারা গীটারের তন্ত্রীতে ছোট সুরের গৌর-চন্দ্রিকা তুলত—মনে হত যেন সাহানা, আশাবরী, গান্ধারী কি ভৈরবী সুর আত্মপ্রকাশের একটা ইশারা করে পিছিয়ে গেল। যেন চেনা কোন অবগুণ্ঠনবতীর কাপড় সরে জানা-মুখের একটা ঝলক অন্তর্হিত হয়ে গেল আরও বড় ঘোমটার অন্তরালে। গোল হয়ে বসা দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের দল মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে 'ওলে, ওলে।' হঠাৎ দু একটি মেয়ে মাঝখানের জমিতে লাফিয়ে পড়ে কোমরে হাত রেখে চরণাঘাতে জাগিয়ে তোলে নৃত্যের ছন্দ। হাততালি আর গীটারের সুর-সঙ্গতে সর্পিনীর মতো দুলতে থাকে তাদের দেহবল্লরী কখনও বা বেগে ঘুরতে ঘুরতে তারা যেন হয়ে যায় ঘূর্ণি বায়ু। উত্তেজিত দ্রষ্টার দল থেকে কেউ কেউ তাদের মধ্যে পড়ে নৃত্যের সেই উদ্দাম তালে মেতে যায়। যখন মনে হয় মেয়েরা নাচের তালে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে, সঙ্গী যুবকের অঙ্গ-ভঙ্গিমায় কোন্ অদৃশ্য অবলম্বন যেন

তাদের লুফে ধরে আবার মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাদের গলায় বাঁধা রেশমী রুমালের দোদুল্যমান কোণগুলো আশে পাশের নিবু নিবু অগ্নিকুণ্ডের শিখার মতো আবছা আকাশের গায়ে জ্বলে উঠছিল। এ যেন প্রায়-নির্বাপিত বিরাট ইন্ধনে কোন অদৃশ্য দৈত্য ফুঁ দিয়ে আগুনের ফুল্‌কি ছড়াচ্ছিল দিকে দিকে।

থুয়ান্ একদিন রহস্য করে বলল, 'আমাদের এই ক্যারাভ্যানের অধিনয়াকত্ব আমাদের এই ইণ্ডিও ভাইয়ের হাতে তুলে দিলে বেশ হয়।'

আংখেলো শুনে তার ধারাল ছুরিখানা দু একবার হাতে শানিয়ে নিয়ে বলল, 'এই ক্যাম্পে সেই হবে দলপতি যার এই অধিকার রাখবার মতো হিম্মৎ আছে।'

হেসে বললাম, 'ব্যস্ত হোয় না আংখেলো, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে রাজী নই। হাজার চেষ্টা করলেও আমি জিপ্‌সী হতে পারবো না। এমন কি, তোমাদের পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়েও।'

এক বৃদ্ধা বিদ্রূপ করে আংখেলোকে বলল, 'কি আমার দলপতি রে! কুঁড়ের সর্দার। কেবল বসে বসে আমাদের কষ্টলব্ধ আহার্য ধ্বংস করতে মজবুত। এ পর্যন্ত একদিন এক টুকরো মাংস আনবার মুরোদ হয় নি—পুরো একটা হাঁস বা মুরগী তো দূরের কথা।'

সে উত্তর দিল, 'দলপতি যদি সাধারণের মতো কাজ করতে থাকে তাহলে অন্যের সঙ্গে দলপতির তফাৎ কোথায়? আর সকলের সঙ্গে সমান কাজ করলে, অন্যে তাকে সমীহ করবে কেন? আমার কোন মুরোদ নেই বলছ? ইচ্ছে করলে মুরগী বা হাঁস কেন, একটা বড় বলদ পর্যন্ত এনে দিতে পারি।'

সেদিন সন্ধ্যায় তাদের ক্যাম্পে একটা হৈ চৈ ব্যাপার শুরু হল। কারণ পড়ন্ত বিকেলে আংখেলো এনে হাজির করেছে বিরাট হৃষ্টপুষ্ট একটি গাভী। বয়োজ্যেষ্ঠরা সমস্বরে ভৎর্সনা ও গালিবর্ষণ করছিল। গাভী তো তারা কেটে খেতে পারে না; কোন্ বুদ্ধিতে এত বড় অকেজো জানোয়ার ধরে নিয়ে এসেছে!

আংখেলো তখন সকলের কান কাটিয়ে বোঝাচ্ছিল, বাজেয়াপ্ত করার সময় তার কি দেখবার সময় ছিল সেটা গাভী না বলদ। তারা অনুযোগ করেছিল যে সে কিছু আনতে পারে না তাই সে প্রমাণ করেছে, তার পক্ষে একটা বড় জানোয়ার সকলের অলক্ষ্যে ক্যাম্পে নিয়ে আসা কিছু মাত্র শক্ত নয়।

সকলে রায় দিল, তাকে এক্ষুণি যেখান থেকে গাভীটি এনেছে সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ যদি কোনক্রমে পুলিস খোঁজ করে গরুটিকে ক্যাম্পে দেখতে পায় তাহলে চুরির দায়ে হারাবে তাদের সব সম্পত্তি এবং পচবে তারা জেলে।

আংখেলো বলল, 'আর রাস্তায় আমায় মালসমেত ধরলে তারা বুঝি আমায় খাতির করে খেতাব দেবে?'

খুয়ান্ বলে উঠল, 'কানা সং-এর আর কত বুদ্ধি হবে! মগজে যদি কিছু সার থাকত তাহলে নিজে থেকেই ঠিক করত যে গরুটিকে সোজা নিয়ে যাওয়া উচিত থানায় এবং সেখানে এ বোঝান খুব শক্ত হবে না, যে কাদের হারানো গরু থানার জিম্মায় সে পৌঁছে দিচ্ছে। কে জানে গরুর মালিক হয়তো খুশী হয়ে তাকে কিছু বকশিশও দিয়ে দিতে পারে।'

আংখেলোর কোন আপত্তি টিঁকল না। তাকে যেতেই হল গরুটিকে নিয়ে নিকটবর্তী থানায়।

রেফিউজি ক্যাম্পে ভলেন্টিয়ার ছাড়া গ্রামের অনেক মেয়ে পুরুষরা আসত তাদের সাহায্য করতে। একদিন দেখি সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবক ক্যাম্পের মাঠে বসে আর সবাই তাকে একটু বিশেষ সম্মান ও খাতির দেখাচ্ছে।

সকলে তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি সেইনর্ বেল্‌জ্। ইন্টারন্যাশনাল বিগ্রেডে থেকে ফ্যালানজিস্তদের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং ধরা পড়ে ফ্রাঙ্কোর জেলে মৃত্যুদণ্ডের

আসামী হয়ে আট মাস কাটিয়ে কোন অজ্ঞাত কারণে ছাড়া পেয়ে এইখানে পৌঁছেছেন।'

ভদ্রলোক ইংরাজী জানায়, আমাদের অসংকোচে কথা বলার সুযোগ হল। কারণ সেখানে আর কেউ ইংরাজী জানত না বা বুঝত না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি স্প্যানিশ সরকারের পক্ষাবলম্বী ভলেনটিয়ার কিনা।

বললাম, 'না মশাই। আমি রাজনৈতিক পার্টির পক্ষপাতিত্ব দেখাতে এ কাজে নামি নি। দুস্থের দুর্গতি কিছুটা লাঘব-প্রচেষ্টা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

তিনি জানালেন যে, স্পেনের রিপাবলিকান্ সরকারের পক্ষ নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তাদের ধারণায় আদর্শ ও উন্নত একটি রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট অন্যায়ের দলনকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হওয়া ছিল তাদের নৈতিক কর্তব্য। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের হাতে বন্দী হলে মৃত্যুদণ্ডের আসামী করে তাঁকে আটমাস বন্দী রাখা হয়েছিল। একই দশাগ্রস্ত রিপাবলিকান সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অনেকে এই বন্দীশালায় জমা হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখলেন যে, এক স্বপক্ষের জোঁর গলায় গুণকীর্তন ছাড়া নৈতিক আদর্শ বলতে তাদের আর কিছু ছিল না। শত্রুপক্ষের কারাধ্যক্ষকে সিগারেট রেশনের ঘুষ দিয়ে তাদের মধ্যে মদ ও অন্যান্য শৌখিন অভিলাষের আমদানী চলত এবং এর জন্য কোন দিন তাদের বিবেকবুদ্ধিতে লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হয় নি। অর্থের বিনিময়ে প্রাণ রক্ষার ঘৃণিত উৎকোচ ব্যবস্থায় এই আদর্শবাদী রিপাবলিকানদের যে তৎপরতা দেখা যেত তাতে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডভুক্ত ভলেনৃটিয়াররা স্তম্ভিত হয়ে অনুশোচনা করতেন যে কেন তাঁরা এই চরিত্রহীন লোকগুলোকে বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন। কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একটি ষোল কি সতের বছরের ছেলে ছিল। তার কোন অপরাধ ছিল না। পলায়মান শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে

তাদের হদিশ না পেয়ে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা এই ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকে ধমকায় শত্রুপক্ষের খবর বলে দেবার জন্তে। বেচারী কিছু না জানলেও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে শত্রুর সংবাদ সে গোপন করছে। অতএব তাকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। কারাধ্যক্ষ উপযুক্ত অর্থের উৎকোচ পেলে তাকে ছেড়ে দেবে বলায় ছেলেটির আত্মীয়স্বজন বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যেদিন ধার্য ছিল, সেইদিন সকালে বন্দীশালার সামনে তাকে গুলি করে নিধন-কার্য শেষ করা হল। বেচারী শেষ পর্যন্ত নির্দোষী বলে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে যখন দেখেছিল তারা তার অনুনয় শুনবে না তখন সে বেশ সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছিল বাগিয়ে-ধরা রাইফেলের সম্মুখে। কোন এক পাশবিক আনন্দকে চরিতার্থ করতে সব কয়েদীরা যাতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখতে পায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

ক্ষুব্ধ রুষ্ট এই বেলজিয়ান্ ভদ্রলোক কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার চাওয়া উৎকোচের অর্থ দিয়েও কেন এই নির্দোষ যুবকটির প্রাণরক্ষা হল না। তোমাদের বিবেকে প্রতিশ্রুতির কি কোন মূল্য নেই এবং অর্থলোলুপতায় মানবধর্মের সবটাই কি তোমরা বিসর্জন দিয়েছ।'

কারাধ্যক্ষ বেশ নির্বিকার ভাবে বলল, 'ওকে মুক্তি দিতাম ঠিকই এবং ওর বদলে এক বৃদ্ধ বন্দীকে বধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সে ওর চেয়ে অনেক বেশী অর্থের উৎকোচ আমাদের দিয়েছে, কাজেই কি কারণ দিয়ে তাকে যমালয়ে পাঠাই বল। উপর থেকে হুকুম এসেছিল যে ওইদিন প্রত্যুষে ছয়জন আসামীর জীবনপাত হওয়া চাই এবং সকলে যাতে এই নিধন-কার্য দেখতে পায় তারও নির্দেশ ছিল—এতে রিপাবলিকান্ পার্টির পক্ষপাতী লোকেদের মনে ত্রাসের সঞ্চারে তাদের শুধরানোর একটা মোক্ষম চিকিৎসা হয়ে যাবে।'

রিপাবলিকান সৈন্যদলভুক্ত কয়েদীরা অনেকে তাঁকে এইভাবে

কারাধ্যক্ষের সঙ্গে বচসা করতে দেখে বেলজিয়ান্ ভদ্রলোককে ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আরে তুমি একটা নিরপরাধ যুবককে মারা হয়েছে বলে এত বিচলিত হচ্ছ কেন? যুদ্ধের সময় এ রকম হত্যাকাণ্ড হওয়া স্বাভাবিক।'

তিনি বললেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে বলে উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ও নিরপরাধের নিধনকে বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হবে? জানি না, তোমাদের দেশের লোকদের কি করে এমন পাষণ্ডদের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি থাকতে পারে।'

তারা জবাব দিল, 'তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, সেখানের লোকেরা অত্যন্ত জড় ও নির্বিবাদী। তাই তোমরা বিপ্লবের স্বরূপকে ভাল করে জান না। স্পেনে কোন কারণকে লক্ষ্য করে জীবন দেওয়া বা নেওয়ায় কোন লজিক দেখবার প্রয়োজন্ হয় না। আজ যদি আমরা হতাম বিজেতা আর এরা থাকত আমাদের কয়েদী তাহলে আমরা আরও বেশী করে হত্যার ব্যবস্থা করতাম এবং আরও নৃশংসভাবে—যাতে এদের পক্ষের আর কেউ কোন দিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।'

এই কথা শুনে তিনি যে আদর্শের প্রেরণায় এসেছিলেন স্পেনে জীবন দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করতে, তা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'জান, আজ আমি এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছি একটা জাতি যখন অধঃপাতে যায় তখন তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নামের সঙ্গে যে কোন উচ্চাদর্শকে জড়িয়ে নিলেও যুদ্ধমান সেই দলগুলির উদ্দেশ্যে কোন তফাৎ থাকে না। সাধারণ অধঃপতনের মাত্রা তাদের সকলের মধ্যে সমান ভাবে দেখা যায়। তাই আজ জানি, রিপাবলিকান পার্টি বা ফ্রাঙ্কোর ফ্যালান্জিষ্ট—যারাই স্পেনের নিয়ন্তা হোক, ফল হবে একই। কোন্ ভাগ্যের জোরে জানি না, আমি ও আমার এগারজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্ধুদের ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা আদর্শের মরীচিকায় শুধু শুধু আমাদের জীবনপাত হয় নি বলে আজ আমি নিজেকে মনে করি ধন্য।'

বললাম, 'এত সুন্দর নাচে-গানে-ভরা যে জাতির প্রাণ, তা কি করে হয় এত ধ্বংসপ্রবণ ও নিষ্ঠুর? ইনকুইজিশন থেকে আরম্ভ করে নৃশংসতার প্রবাহ যেন স্পেনে থামতেই চায় না।'

তিনি বললেন, 'নিষ্ঠুরতাকে আমি জাতিগত প্রকৃতির একটা অঙ্গ বলে স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবে বোধ হয় সেটা সত্য। সাধারণতঃ অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয়ে থাকে। একটা দেশ থেকে অভাব তুলে নাও, উৎপীড়নও উঠে যাবে। আর অভাব তো কেবল মানুষেরই তৈরী না, প্রকৃতিও কোন কোন দেশে দানের প্রাচুর্যে অধিবাসীদের জীবনকে ভরিয়ে দেয় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে; আবার কোথাও নির্জলা নিষ্ফলা হয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের স্বভাবকে করে দেয় রুক্ষ ও নীরস। স্পেনের নাচ গান যদি ভাল করে দেখ ও শোন তাহলে বুঝবে তার আপাত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের নীচে যেন নিপীড়িতের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে। এ সব দেশে কথার মাত্রায় ঈশ্বরের নাম স্মরণ যখন লোকে করে তাই শুনলেই জাতিগত প্রকৃতির একটা ধাঁচ বুঝতে পারবে। যখন জার্মান বলে 'মায়েন্ গট্' কি ইংরাজ বলে 'মাই গড্' তা শুনে মনে হয় তারা কোন বিচারককে সাক্ষী মানছে আর ফরাসীর বলা 'ম্য দিয়ো' শুনে অনেক সময়ে ভুল হয়ে যায় যে বলছে 'ম্য ডিয়ো'। কিন্তু যখন স্প্যানিয়ার্ড বলে 'মাদ্রে দিয়স্' ওই কথাটুকুর টানে মনে হয় তার অন্তরাত্মা চেঁচাচ্ছে 'হে মাতঃ দেবতা, আমাদের ত্রাণ কর, ত্রাণ কর'। তাই বলি বন্ধু, যদি সাধারণ মানবধর্মের প্রেরণায় আজ তুমি এই রেফিউজিদের ক্লেশ মোচনের প্রচেষ্টায় এদের মধ্যে এসে থাক, জাজ্বল্য রেখে দাও সেই প্রেরণাকে। কিন্তু সবধান, এদের বাক্যজালে জড়িও না নিজেকে এদের রাজনৈতিক ন্যায় ও অন্যায় বিচারে সমর্থনে ও তার বাস্তব পরীক্ষায়। অধঃপাতিত জাতির বহু প্রায়শ্চিত্তের পর আসতে পারে হয়ত আবার মানবধর্মে বিশ্বাস এবং সেই জাতিকে বাঁচতে হলে আবার একদিন না একদিন নিতে হবে এরই আশ্রয়। আমরা অপেক্ষা করব সেদিনের জন্য এবং সেই

ক্ষণ এলে পরে আমরা উজাড় করে ঢেলে দেব আমাদের সব কিছু, আমাদের আদর্শকে সফল করতে এবং তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করতে।'

প্রফেসর হেবল্‌রিক

আতলিয়েতে শুক্রবার একটি মহাদিন। এই দিন আসেন প্রফেসার হেবল্‌রিক, সকলের কাজ দেখে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে।

সেদিন আমরা জানি, সকাল ঠিক সওয়া ন'টায় দরজাটা খুলবে একটুখানি এবং আওয়াজ আসবে 'বঁzুর মেদাম, বঁzুর মেসিয়েঁ।' বহুবচনে সকলকে প্রভাত-সম্ভাষণ জানিয়ে হঠাৎ তিনি ঢুকে পড়বেন এবং সকলের চোখে পড়বে ব্রাউন্‌ টুইড্‌-এর স্যুট ও কোটের পরিপাটি সজ্জায় মাঝারি সাইজের একটি লোক—যার কেয়ারি-করা গোঁফদাড়ি, উন্নত নাসা, ললাট ও দুটি জ্বল্‌জ্বলে স্বচ্ছ নীলাভ ধূসর চোখ মিলিয়ে প্রশান্ত একটি মুখ।

এই চোখের চাউনিতে দেখা যেত কৌতূহল, উপেক্ষা, জিজ্ঞাসা, সহানুভূতি, বুদ্ধির জৌলুষ আর অপরিমিত স্নেহ। কিন্তু কোনদিন দেখি নি সেই চোখে রাগের আগুন বা ঘৃণার অঙ্গার।

ফরাসীদের স্বভাবজাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোলানি, বলার যে ভঙ্গি, প্রফেসার হেবল্‌রিক সেই ভাবে কথা বললেও তাঁর বলার একটা বিশেষত্ব ছিল। মনে হত, তিনি যেন আমাদের আতলিয়েকে করে দিয়েছেন এক রঙ্গমঞ্চ আর সেখানে আমরা এক একটি অভিনেতা নায়কের হাতের একটি ভঙ্গিমায় হয়ে গেছি মূক ও স্তব্ধ।

একজনের-করা মাটির মূর্তির সামনে তিনি যেই দাঁড়ালেন সকলেই অমনি তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। শ্রবণোৎসুক সকলের মুখ ফিরল তাঁর দিকে। মডেল থ্রোনের দিকে হাত ঘুরিয়ে তিনি বললেন,

'মাদ্ম্যয়জেল পোজে ভু সিল্ ভু প্লে (অনুগ্রহ করে ভঙ্গিতে দাঁড়ান)।' কিন্তু মডেলকে ফের দাঁড়াতে বলার সেকি ভঙ্গিমা! মনে হলো 'গুনো'র ফাউষ্ট অভিনয়ে মেফিষ্টোফেলিস হস্ত সঞ্চালনে আজ্ঞা দিল নর্তক ও নর্তকীদের নৃত্যরঙ্গের উৎসবারম্ভের। কেবল তফাৎ এই যে আজ্ঞাকারী মেফিষ্টোফেলিসের আদেশের প্রাবল্য থাকলেও ব্যক্তিটি পিশাচপতি নয়। তিনি যেন ক্রাইষ্টের এপসল্‌সদের একজন, ধর্মকথার গৌরচন্দ্রিকায় বলছেন সকলকে আসন নিতে। শুনছি তাঁর কথা—'বহুবা বেশ করেছ। কিন্তু তোমার মূর্তির রঙ ঠিক হয় নি।' ভাস্কর্যের মূর্তির রং! শ্বেত পাথরের সাদা, ব্রোঞ্জের কাল্‌চে তামা আর মাটির ধেঁায়াটে কালো রঙ, তা তো পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু প্রফেসার এই একরঙা মূর্তিতে দেখতে বলছেন ব্লণ্ড ব্রুনেট ও নিগ্রোর অঙ্গ-বর্ণের তারতম্য! বোঝালেন তিনি, এই একরঙা মাটি, পাথর বা ধাতুতে ভাস্কর দেখাতে পারে সব রঙ যদি তার মন আর চোখ কেবল গঠনের প্রতি নিবিষ্ট না হয়। মূর্তির গায়ে গঠন-কৌশলে, আলোকের আচ্ছাদনে, শোষণে ও বিচ্ছুরণে, ছায়ার সঙ্গে কানামাছি খেলিয়ে ভাস্কর ধরে ফেলে সব কটা রঙ। এই রঙের খেলা দেখতে জানত গ্রীসের ভাস্কররা। যাদের দেবদেবীরা দৌড়ঝাঁপ করত ব্যায়ামশালায় বা স্নানাগারে। তাই তাদের করা পাথরের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে। এক-রঙা বস্তুর ওপর চড়ে যায় সুষ্ঠু দেহের রক্তিমা, দুলে উঠে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবনের স্পন্দন। রোমানদের না ছিল উন্মুক্ত ব্যায়ামশালা বা সর্বজনীন স্নানাগার, যেখানে হতে পারত সুগঠিত নগ্নদেহের সমারোহ। তারা এই সজীব নগ্নতার প্রদর্শনীকে মনে করত অশ্লীলতা। তাই তাদের রূপকারদের রচনার সাহায্যে দাঁড়াত না নগ্ন জীবন্ত মানুষ। গ্রীসীয় ভাস্কর্যের নগ্নমূর্তি সহায়তা করত রোমক ভাস্করের মূর্তি গঠনে। তাই তারা পেল শুধু পাথর আর ব্রোঞ্জ। উবে গেল তাদের-করা মূর্তি থেকে জীবন ও সজীব

ত্বকের উষ্ণতা। মানুষের গঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরেট পাথরগুলি ও ধাতুময় অবয়ব।

প্রফেসার হেবলরিকের প্রশংসায় মন ভরে গেছে গর্বে, প্রাণ ভরেছে সাফল্যে। হঠাৎ বেজে উঠল বেসুর—রঙ তো বেশ, কিন্তু তোমার মূর্তি দাঁড়িয়েছে বেসামাল। নিলেন তিনি একটি ছুরি। তার তীক্ষ্ণ ফলা কেটে চলল মূর্তির মাঝ দিয়ে, যেখানে হওয়া উচিত ছিল সঙ্গতির মধ্য রেখা। কাঁধটি মাপের অধিক হওয়ায় তাঁর হাতের ছুরি কেটে চলল কাঁধ আর হাত। এইভাবে যখন তাঁর বক্তব্য হল শেষ—পড়ে রইল মূর্তির ছিন্ন অঙ্গাবশেষের স্তূপ আর যে গড়ছিল সেই মূর্তি তার পুঞ্জীভূত হতাশা।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমরা মাটিতে গড়ে চলি, মডেলকে সামনে রেখে, মূর্তি। আর যখন সে মূর্তি হয় পরিপূর্ণ, প্রফেসার হেবল্‌রিক এসে প্রথমেই দেন কিছু কৃতিত্বের প্রশংসা এবং পরে অসংখ্য ভ্রান্তির খেদ। মূর্তিকে ভেঙে মাটির স্তূপে পরিণত করে বলতেন তিনি, 'ফের শুরু কর। এর পরে ঠিক মত গড়তে পারবে।'

মোলায়েম সেই উপদেশ যেন বলির মহিষের গলায় সাদরে ঘি মালিশ। এইভাবে ভেঙেছেন তিনি আমার তিন চারটি মূর্তি। এর পরের মূর্তিটি পেল ভুলের দীর্ঘ তালিকার চেয়ে সাফল্যের বহু প্রশস্তি। কিন্তু সেটাও তাঁর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেল না। হলো খুব রাগ। বলে ফেললাম, 'মঁসিয়ো ম্যঁ প্রফেসর, আজকে আপনার আতলিয়েতে বলা-কওয়া শেষ হলে আপনার সঙ্গে দেখা করে কটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?' আমার গলার আওয়াজে হয়তো ছিল খানিকটা রাগ ও ক্ষোভের সুর তাই একটু ইতস্ততঃ করে শান্তস্বরে বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

সিঁয়াসের শেষে গেলাম তাঁর ঘরে। তিনি সাদরে বললেন, 'বসো'।

বললাম, 'না, আমার যা বক্তব্য তা দাঁড়িয়েই বলতে চাই।

মঁসিয়ো হেবল্রিক আপনিও একদিন আমাদের মতো ছাত্র ছিলেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, আপনার শিক্ষক আপনার মতো নির্মমভাবে ভাঙতেন তাঁর ছাত্রদের প্রাণভরে গড়া কাজ। তা যদি হত তাহলে আপনি জানতেন আমাদের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ এবং যদিও আমাদের হৃদয় দিয়ে গড়া এই মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয় তবুও এগুলিকে ভাঙতে আপনার হাত হয়ত ইতস্তত করত। ভুলভ্রান্তি থাকলেও আমাদের মূর্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখায় আপনার আপত্তি কিসের?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেললাম এবং তাঁর ভর্ৎসনার অপেক্ষমান হয়ে চাইলাম তাঁর দিকে। দেখলাম তিনি হাসছেন। ভাবলাম এ বিদ্রূপের হাসি।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, 'ঠিকই বলেছ, আমার যিনি প্রফেসার ছিলেন তিনি আমার ছাত্রজীবনের কাজগুলিকে এমন করে ভাঙেন নি। কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাঁর কাছ থেকে আমি এ অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়েছি। ভাবছ, আমি বাজে বকছি। মনে রেখ, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ফ্রান্সের বিরাট ভাস্কররথীরা। বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রেঁাদ্যার শিষ্য বিখ্যাত বুর্দেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই একাডেমী। সেই বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বুর্দেলের ছাত্র আমি, আর তোমরা হচ্ছ আমার ছাত্র। আমার আকাঙ্ক্ষা যে তোমরা সকলেই হবে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। কিন্তু বড় হওয়ার দায়িত্ব অনেক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ হলেই আর তোমার নিজের বলতে কিছু থাকবে না, গুণমুগ্ধজন টেনে আনবে তোমার গোপন ও অগোপনকে। তোমার সাফল্য-ভরা কাজের পাশে দাঁড় করিয়ে দেবে তোমার বাঁচিয়ে-রাখা অপরিণত অসম্পূর্ণ কাজগুলি। তখন হবে তুমি অপ্রস্তুত ও লাঞ্ছিত। তাই আমি তোমার এই ভ্রান্তি-ভরা মূর্তিগুলিকে ভেঙে ভবিষ্যতের লজ্জা থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস করছি মাত্র।'

ঘাড় হেঁট করে চলে এলাম আতলিয়েতে, কৌতূহলী সকলের দৃষ্টি

আমার প্রতি। কিন্তু তারা কেউ জানল না যে প্রফেসার হেবল্‌রিক ওই এক কথায় করে দিয়েছেন আমার অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

প্রফেসার হেবল্‌রিক, তিনি 'লিজিওঁদোনর্‌' সম্মানে ভূষিত হওয়ায় যে তাঁর চালচলনে একটা সম্ভ্রান্তের বৈশিষ্ট্য এসেছিল, তা নয়। তাঁকে দেখলে বেশ বোঝা যেত যে তিনি আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে জন্মেছিলেন।

মডেলকে উদ্দেশ্য করে যখন তিনি কিছু বলতেন, তখন মনে হত তিনি যেন একটা সাধারণ নগ্না নারীকে সম্বোধন করছেন না, সে যেন বেদীতে আসীনা দেবী আর তিনি রূপার্চনার পুরোহিত।

এ শুধু আতলিয়েতে নয়, ক্যাফেতে বসে থাকাকালীন তাঁকে কতবার উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে দেখেছি পথচারিণী কোনও চেনা মডেলকে পাশ দিয়ে চলে যেতে দেখে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেককে তাঁর এই ব্যবহারকে শিষ্টাচারের আধিক্য বলে ঠাট্টা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি জানতাম ওই আদব ছাড়া যে শিষ্টাচার অন্যপ্রকার হতে পারে এ জ্ঞান তাঁর ছিল না।

মনে পড়ে, যুদ্ধারম্ভে যখন গিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে, তিনি আমার দুটি হাত ধরে আমার চোখের উপর তাঁর স্থির দৃষ্টি ফেলে সেই অভিনয়ের ভঙ্গিমায় বললেন, 'বন্ধু, তুমি নিজের দেশে ফিরছো, তোমাকে এখানে থাকতে বলার দাবী আমার নেই। ফ্রান্স আজ বিপন্ন। জানি না, ফ্রান্স এই মহাসংগ্রামের পর বেঁচে থাকবে কিনা। তুমি যেখানেই যাও, নিয়ে যেও সঙ্গে করে ফ্রান্সের খানিকটা প্রতীক। ভুলে যেও না, রোদ্যাঁ ছিলেন এক বিরাট ভাস্কর। তাঁর শিষ্য বুর্দেল ছিলেন তাঁরই সমান মহাশিল্পী। আমার ছাত্র হিসাবে তুমি তাঁর প্রশিষ্য। ভুলো না বন্ধু তোমার প্রফেসার হেবল্‌রিককে, তাঁর গুরু এবং বুর্দেলের শিক্ষক রোদ্যাঁকে। কর না অমর্যাদা আমাদের শিক্ষার ও ফ্রান্সের ঐতিহ্যের। বল না বিদায়। আমি এখনি উঠে ফিরে দাঁড়াব, তুমি নিঃশব্দে চলে যেও।'

১৯৪৪ সনে অনেক ঘুরে কোনও শিল্পী বন্ধুর পাঠিয়ে দেওয়া ফরাসী সংবাদপত্রের একটি কাটিং হাতে পৌঁছল। তাতে লেখা ছিল—'যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুঃখে মর্মাহত হেবল্‌রিক' অকালে [illegible] রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।'

মার্থের মডেলিং ষ্ট্যাণ্ড ঠিক আমার পাশেই।

পরের শুক্রবার যখন প্রফেসার হেবল্‌রিক এলেন এবং তার তৈরি মূর্তির বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন, মার্থ তাঁর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে বললে, মঁসিয়ো হেবল্‌রিক, আপনি মূর্তিটার ভুল বলে যান আর আমি যেখানে যেটা কেটে ফেলা প্রয়োজন তা কাটতে শুরু করি।'

তিনি আঙুল দিয়ে যেমন ভুল দেখাতে লাগলেন মার্থও যেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে মূর্তির সেই অংশগুলিকে কাটতে লাগল এবং প্রফেসারের বলা শেষ হলে যখন পড়ে রইল ভাঙা মাটির স্তূপ—গুলি-মারা প্রাণ-দণ্ডিতকে যেমন শেষ গুলির 'কুদ্য গ্রা' দেওয়া হয় তেমনি ছুরিটা সে সজোরে সেই স্তূপে হাতল পর্যন্ত মেরে বসিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

পৈশাচিক সে হাসি।

মনে হল, সে যেন জেনে ফেলেছিল মঁসিয়ো হেবল্‌রিকের সঙ্গে আমার রাগের অভিনয়টুকু এবং তারই একটা পরিহাস সে এই সুযোগে করে নিল।

সবাই যখন চলে গেছে সে আর আমি একা রয়ে গেছি।

মার্থ বলল, 'ওহে অভিমানী, মূর্তিটা আমি কাটলাম তোমাকে আঘাত দিতে নয়, প্রফেসারের যুক্তিটাকে একটু ঘুলিয়ে দিতে।'

আমি তার হেঁয়ালি ঠিক বুঝলাম না।

সে বলে চলল, 'তোমার দগ্ধ মরমের জ্বালাকে যদি শান্ত করতে চাও তো চলো আমার সঙ্গে প্লেইয়েলএ। আমার কাছে দুখানা বিনি পয়সার টিকিট আছে। চলো, বাখ্‌-এর কোরাল শুনে আসি।'

আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে বললে, 'ও, ভুলে গেছি, তোমাদের সেই পোঁ-ধরা প্রাচ্য সঙ্গীত শুনে অভ্যেস, আমাদের সঙ্গীতের ঝঙ্কা রবে তোমাদের কানের পাতলা পর্দা হয়ত ছিঁড়ে যেতে পারে।'

ভাবলাম স্রষ্টা মার্থের জিবটা ভুলে দিয়েছে। ওটা ওর হাতের ছুরিখানা হলে ঠিক হত।

তার নিমন্ত্রণ না নেওয়ায় আরও অপদস্থ হতে পারি ভেবে বললাম, 'না মাদম্যয়জেল, আমাদের কানের পর্দাটা পাতলা নয়—মোলায়েম, যার ওপর সুর লুটোপুটি খেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না। তোমাদের কানের পর্দা মনে হয় অনেক গভীর খাদ আর চড়াইয়ে ভরা। সেখানে সুর ছুটোছুটি করে পড়ে খায় আছাড় ডিগবাজী আর করে আর্তনাদ।'

হঠাৎ দুজনেই বুঝলাম এ নিয়ে বেশি বচসা করলে হয়ে যাবে রাগ ও ঝগড়া। কাজেই এইখানেই সন্ধি করে আমরা চললাম সালপ্লেইয়েলে।

সিঁড়ি বেয়ে ভেসটিবিউলের মধ্যে চলেছে শ্রাবকের দল, বেশির ভাগই কালো সান্ধ্যসজ্জায় ফিটফাট।

নিজের টুইড জ্যাকেট ও ধূসর ট্রাউজারের দিকে তাকিয়ে প্রায় অপ্রস্তুত মনে করার আগেই মার্থ বললে, 'ভয় নেই হে। আমরা বসব গ্যালারিতে। সেখানে টুইড জ্যাকেট কারও আভিজাত্যের স্নায়ুতে ঘা দিয়ে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করবে না।'

স্যালপ্লেইয়েল প্যারীর প্রায় সব চেয়েও সেরা সংগীত-ভবন। বিখ্যাত সঙ্গীত-সুরবিদ হাইডেনের ছাত্র ইগনাৎস জোসেফ প্লেলইয়েস্ ছিলেন অষ্ট্রিয়ার এক কম্পোজার। তিনি প্যারীতে এসে বসবাস করেন এবং বিখ্যাত সঙ্গীতকারদের রচনা ছাপিয়ে ও পিয়ানো বাজানোর শিক্ষকতা করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন।

আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিয়ানো তৈরীর বিপণি প্যারীতে বর্তমান। তাঁরই নাম বহন করে আসছে এই সুবিখ্যাত সুর-মন্দির—যেখানে

কত খ্যাতনামা ও সেরা সুরকুশলীদের সঙ্গীত সুরবাদ্যের সঙ্গতে প্রীত ও মুগ্ধ শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি এর দেওয়ালগুলিতে আছড়ে শিল্পী-প্রাণে তুলেছে আনন্দের জোয়ার।

সিঁড়ি ভেঙে কয়েক তলা উঠে যখন গ্যালারিতে আমাদের আসন নিয়ে নীচে সঙ্গীত-মঞ্চের দিকে তাকালাম তখন দূরত্বের ব্যবধানে ও পারিপার্শ্বিকে কেবল বাদ্যকরদের টাক-মাথা ও ঝকঝকে ভায়োলিন, চেলো, ভিয়োলো, ফ্লুট ও ক্লাভি-কর্ডএর হাইলাইট সবচেয়েও স্পষ্ট দেখাচ্ছিল।

উজ্জ্বল, মসৃণ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে যেন দেখা যায় বেশীর ভাগই বাদ্যকরদের কেশবিহীন মসৃণ মস্তক। যন্ত্রশিল্পীরা স্ব স্ব যন্ত্রকে টুং, টাং, পিপ্, পোঁ, ভোঁ প্রভৃতি শব্দে সুরস্থ করছিলেন এবং তার সঙ্গে জনতার গুঞ্জন-ধ্বনি মিশে আসন্ন সঙ্গীত-সম্ভাবনার এক আবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে কার আগমনে করতালি বেজে উঠল।

আস্তে আমার কানে কানে মার্থ বলল, 'উনি হলেন শ্যেফ্ড্ অর্কেস্ত্র অর্থাৎ বাদ্যকারদের মুখ্য। তারপরেই এলেন কন্‌ডাক্‌টর—বাদ্যবাদনের অধিনায়ক। আবার করতালি-ধ্বনির একটা উচ্ছ্বাস উঠল।

বাদ্যবাদনের অধিনায়ক একবার শ্রোতাদের দিকে ফিরে আবক্ষ মাথা নীচে ঝাঁকিয়ে সকলকে অভিবাদনান্তে ফিরে দাঁড়ালেন মঞ্চের বাদ্যকারদের দিকে। তাঁর হাত দুখানা উঁচু হতেই সমস্ত হলটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেল এবং তাঁর মৃদু হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে যেন ধীরে ভেসে এল সঙ্গীতের ঝর্ণাধারা।

প্রথমার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাখ্-এর ফিউগ রচনা।

কনট্রাপানটিস্ত বাদ্য-সঙ্গীতকে ভাল করে বুঝে উপভোগ করতে গেলে কিছুকাল এই ধরণের রচনা শুনে শুনে কানকে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। অনভ্যস্ত আমার পক্ষে এই প্রথম ফিউগ রচনা কানের সঙ্গে লাগাল বিবাদ। মনে হল বহুবিধ যন্ত্রের বেখাপ্পা আওয়াজ

অযথা দৌড়ঝাঁপ করে একটা সুরের হট্টগোল জাগিয়েছে। অথচ মনে মাঝে মাঝে এই শব্দের জঙ্গল বদলে হয়ে যাচ্ছিল সাজান সুরের উদ্যান।

প্রথমার্ধের প্রোগ্রামান্তে বিরাম শুরু হলে মার্থ জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে, এ মিউজিক সহ্য হচ্ছে, না কানে চোট লেগে আহত হলে?'

সত্যি না বলে উত্তর দিলাম, 'না, না, আমার খুব ভাল লাগছে।'

কিন্তু মার্থকে সত্য বা মিথ্যে কোনটা বলে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল।

সে বললে, 'কি ভালো লাগল, কেন ভাল লাগল, বলো।'

বলতে হল মামুলি কথা, 'চিনি খেয়ে মিষ্টি লাগলে ভাষায় কি বোঝাতে পারো মিষ্টি লাগা কি?'

কিন্তু তাকে কি অত সহজে নিরস্ত করা যায়?

তার জবাব এলো, 'বেশ তো, মিষ্টি না হয় নাই বোঝাতে পারলে কিন্তু চিনি কি বস্তু, তার রঙ কেমন, চেহারা কেমন, সেটা তো বলতে পার।'

বললাম কনর্সার্ট শেষ হলে বলব, আমার বাখ্ কেমন লাগল।

অপরার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাখ্-এর প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ডেনবার্গ কনচারতোর একটি রচনা। এইবার এই সঙ্গীত-ধারায় বেজে উঠল আমার কানে অশ্রুতপূর্ব এক অপূর্ব সুরের ছন্দ। ভায়োলিন সুরের পদগুলিকে যেন জমাট জিনিসের মত একের উপরে অন্যকে সাজিয়ে তৈরি করতে লাগল সঙ্গীতের ইমারত এবং সুরের সোপান বেয়ে অনায়াসে সেই ইমারতের উপরতলা ও নীচতলায় কান আনাগোনা করতে লাগল।

প্রোগ্রাম শেষ হলে উত্তেজিত করতালির ফলে গরম আরক্ত হাতে মার্থের করমর্দনে বিদায় নিলাম এবং তাকে বললাম, 'জানতে চেয়েছিলে বাখ্ শুনে কি রকম লাগল? তোমার বাখ্ সুরের স্তবকের উপর স্তবক দিয়ে গড়েছিলেন তাঁর সুর মন্দির আর আমার সবখানি দিয়ে যেন সেই মন্দিরের সারা ধাপে চড়ে নৃত্য করে এলাম।'

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তোমাদের সুর-বোধ সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই বাখ্‌ আগে শুনেছিলে এবং তাঁর সঙ্গীত সম্বন্ধে বেশ কিছু জান।'

বললাম, 'না মাদময়য়জেল, বাখ্‌-এর সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম। তাঁর সম্বন্ধে জানবার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কোনদিন সময় করে যদি বল, তাহলে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শুনব।'

বাখ্‌-এর সুরসঙ্গীত ও মার্থ

একদিন দুপুরবেলা একাদেমীর কাজ শেষ করে আমি ও মার্থ বসলাম গিয়ে লুক্‌সাম্‌বুর্‌ উদ্যানে।

সেখানে যাবার পথে ন' ইঞ্চি 'তারতিন' রুটির মাঝখানে হ্যাম্‌ভরা বড় স্যাণ্ডুইচ কিনে নিয়েছিলাম মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে।

আমি স্যাণ্ডুইচ খেয়ে যাচ্ছি আর মার্থ বলে চলেছে বাখ্‌-এর কথা।

'সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের সঙ্গীত-নায়ক বাখ্‌-এর জীবন-চরিত উপন্যাসের মতো অসামান্য বা চমক-দেওয়া কোন ঘটনা ভরা ছিল না। বাখ্‌-এর পাঁচ বংশ চর্চা করে গিয়েছিলেন সঙ্গীত।

'ছোট বেলায় বাপ-মা হারিয়ে অষ্টম সন্তান জোহান্‌ সেবাস্তিয়ান বাখ্‌, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোয়ান ক্রিষ্টফ্‌-এর কাছে মানুষ হয়েছিলেন এবং তাঁরই কাছে হয়েছিল তাঁর সঙ্গীতের বর্ণপরিচয় শিক্ষা। সঙ্গীত-শিক্ষায় অদম্য অনুরাগ শুরু হয়েছিল তাঁর বাল্য থেকেই। যেখান থেকে সম্ভব তিনি সংগ্রহ করতেন সঙ্গীতের স্বরলিপি। তাঁর ভ্রাতার সযত্নে তালা-বন্ধ সঙ্গীতের স্বরলিপি, তিনি রাত্তিরে কৌশলে চাবি খুলে নকল করে সকলের অগোচরে কাবার্ডে যেমন রাখা ছিল আবার তেমনি রেখে দিতেন এবং বহু মাসের অধ্যবসায়

সহকারে সেই স্বরলিপির সবটাই গুপ্তভাবে নকল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'তখনকার সঙ্গীত-নায়কদের বাদ্যবাদন শুনবার জন্য তিনি পদব্রজে চলে যেতেন বহু ক্রোশ দূরের শহরে ও গ্রামে। একবার হ্যাম্‌বুর্গে বিখ্যাত সুরশিল্পী রেইন্‌কেন্‌ সেণ্ট ক্যাথারিন গীর্জায় অর্গান বাজাচ্ছেন শুনে তিনি পদব্রজে গেলেন তিরিশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে। পথে ক্ষুধায় কাতর তিনি এক হোটেলের সামনে বিশ্রাম করতে বসলেন। হঠাৎ উপরের এক জানলা খুলে হয়তো তাঁকে ক্ষুধার্ত দেখে, কে ফেলে দিল তাঁর সামনে দুটি মাছের মুড়ো। অনভিমানী বাখ্‌ মুড়ো দুটো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে গিয়ে বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে প্রতিটি মুড়োর মধ্যে আছে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা।

'বাখ্‌-এর সঙ্গীত-জীবন শুরু হয় গীর্জার কোয়ার্‌ গীতকারী কিশোরদের একজন গায়ক হিসাবে। তাই তাঁর রচিত গীর্জার হিম্‌-টিউন-ভরা কোরাল 'পারতিতা'তে যে স্তোত্র-গীতের পবিত্রতা ও মূর্চ্ছনা অনুভব করা যায় তা অন্য কোন সঙ্গীত-রচয়িতার রচনায় উপলব্ধি করা যায় না। পরে কৈশোর শেষে যৌবনের প্রারম্ভে যখন বাখ্‌-এর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হল তখন তাঁকে কোয়ার ছেড়ে খুঁজতে হল অন্যপথ।

'তখনকার যুগে ইউরোপে ছোট বড় ডিউক ও প্রিন্সের ছড়াছড়ি। তাঁদের দরবারে তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করতে নিযুক্ত হত কবি, সাহিত্যিক, গায়ক-গায়িকা, নাট্যকার ও সঙ্গীত-রচয়িতার দল।

'বাখ্‌ও ভাগ্যক্রমে নিযুক্ত হলেন 'ভেইমারের' একটি গীর্জার অর্‌গানিষ্ট ও কোয়ার-মাষ্টার। বাখ-এর অর্গানের প্রতি একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল। কান্‌তাতা তোকাতা ও ফিউগ ধরণের যে প্রায় তিনশত রচনা জগতকে তিনি দিয়েছেন, তার শুরু ওই গীর্জার অর্গানের সুযোগ পাওয়া থেকেই।

'তখনকার দিনের শাসকদের সমাজে দরবারী কবি, সঙ্গীতজ্ঞের

সম্মান বাটলার ও সহিসদের সম্মান ছিল। তাঁদেরও পরতে হত চাকরের উর্দি। স্বাধীনচেতা বাখ্ তাদের এই বিনয়হীনতা ও ধৃষ্টতায় অনেক মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি ক্রমে ভেইমার ছেড়ে ক্যাত্‌ল্-এর শাসকদের দরবারে হাজির হন। এইখানে অবস্থানকালে বাখ্ রচনা করেন কয়েকটি অপূর্ব অর্কেস্ট্রাল সঙ্গীত ও ভায়োলিন্ কন্‌চারতো।

'বাখ্-এর চিরকালের অভ্যাস নানা শহরে গ্রামে সঙ্গীতবেত্তা ও সঙ্গীত-রচয়িতার সন্ধানে ভ্রমণ। এমনি এক যাত্রার পথে পরিচয় হল ব্রাণ্ডেনবার্গের সঙ্গীত-রসিক প্রিন্স মার্কগ্রাফ্-এর সঙ্গে। তিনি বহু সুর-সঙ্গীত-রচয়িতাকে তাঁর জন্যে নূতন সঙ্গীত রচনার অনুজ্ঞা দিতেন এবং বাখ্ পেলেন তাঁর জন্যে কন্‌চারতো রচনার আমন্ত্রণ।

'তিনি প্রিন্সের জন্য যে ছয়টি কন্‌চারতো রচনা করে তাঁকে অতি বিনয় সহকারে উৎসর্গ করে পাঠিয়েছিলেন সেগুলিই আজ বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চারতো নামে সঙ্গীতবেত্তাদের মহলে অতি পরিচিত।

'প্রিন্স মার্কগ্রাফ্ বাখ্-এর অমর রচনার জন্য কি পুরস্কার দিয়েছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু প্রিন্সের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহের তালিকা যখন করা হয় তখন তাঁর নাম-পর্যন্ত উল্লেখ না থাকায় বাখ্-এর অমূল্য রচনার স্বরলিপি অন্যান্য রচনার সঙ্গে একজোট করে তার এক একটির যে মূল্য ধার্য করা হয় তা পায় আট ফ্রাঙ্কেরও কম (পাঁচ আনা)। কাল তো শুনলে ওই ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চারতোর একটি। সমস্ত অর্কেস্ট্রা যেন সুরের এক রম্য-উদ্যান রচনা করল। যার শত শত প্রস্ফুটিত ফুলে ভায়োলিন যেন প্রজাপতির মত উড়ে উড়ে সেই ফুলগুলি থেকে মধু আহরণ করে আমাদের কর্ণকুহরে অমৃতে ভরে দিল। অর্কেস্ট্রার হৃদয় কোন্ যন্ত্র দিয়ে তৈরী জান?'

আমি 'না' বলায়, মার্থ্ বলল, 'ভায়োলিন। এই যন্ত্র যেমন করে আমাদের অন্তরে ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে পারে এবং এমন অন্তরঙ্গ কথা জানাতে পারে তেমন আর কোন যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় না।'

বললাম, 'মার্থ, আতলিয়েতে আরও তো অনেকে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা করে, কনসার্ট শুনতে যায় কিন্তু তারা তো তোমার মত এমন সুর-পাগল নয়। তুমি কোথা থেকে পেলে এই সুরের নেশা?'

সে চোখ ছুটো বুজিয়ে চুপ করে রইল এবং খানিকক্ষণ পরে বলতে শুরু করল ধীরে—যেন হঠাৎ সময়ের পুকুরে ডুব দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল কতদিনের তলিয়ে-যাওয়া হারানো জিনিস।

'আমি যখন খুব ছোট, আমরা থাকতাম একটা ছোট রেলস্টেশনের কটেজে। আমার পিতা ছিলেন সেই স্টেশনের সিগ্‌নালার। সারাদিন ও সন্ধ্যের কাজের পর আর সকলে যখন ডিনার শেষে কাফেতে গিয়ে তাস দাবা খেলত, আমার পিতা তখন খাবার পরে বের করতেন তাঁর বহু পুরোন সঙ্গী একটি ভায়োলিন্। তাঁর বাজনা ছিল একঘেঁয়ে কতকগুলো গ্রাম্য সুর কিন্তু আমার মনে হত সেগুলি যেন তাঁর সারাদিনের ক্লান্তিভরা কাজে যে পুঞ্জীভূত বেদনা তারেই কথা বলত ঝিনিয়ে ঝিনিয়ে। একদিন আমার পিতা অনেক রাত পর্যন্ত ফেরেন নি। গভীর রাত্রে কয়েকজন স্টেশনের কর্মচারী বসবার ঘরে উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষমানা মাকে এসে কি বলল, তখনি একটা বুকভাঙা আর্তনাদ শুনলাম। মনে হল, সেটা যেন আমার মার গলার আওয়াজ নয়, ওই কোণে-রাখা ভায়োলিনটা কেসের মধ্যে থেকে চিরে বের করল ওই শব্দ! কাজের শেষে ক্লান্ত আমার পিতা লাইন পেরিয়ে বাড়ি আসতে লক্ষ্য করেন নি আগত ট্রেণ। বোধহয় জানতেও পারেন নি, তাঁর শরীরটা কখন ছুভাগে কেটে গেল। তারপর যেমন ভোরের জমাট কুয়াশাখণ্ডের মধ্যে পড়লে হাতড়াতে তার বাইরে এসে নজরে পড়ে চেনা পথ ও পরিচিত নিশানা, তেমনি বিগতের সংকার ও তার গণ্ডগোল কেটে গেলে আমার চোখ পড়ল ওই ভায়োলিন-কেসটার উপর। কেসটা খুলে বের করলাম ভায়োলিনখানা, ছড়ি দিয়ে দিলাম কয়েকটি টান তারগুলির উপর কিন্তু বেরুল একটা খস্‌খসে বিকৃত আওয়াজ—যেন আমার পিতার ভর্ৎসনা। তারপর বহু আয়াসে গ্রামের শিক্ষকের

কাছে হাতেখড়ি করে ক্রমে শিখলাম ভায়োলিন থেকে সঠিক সুর বাজাতে। প্যারীতে যখন মা এল কাজের খোঁজে এবং হল ক্যাসিয়ারুজ, আমি অনেক অনুরোধে মাকে রাজী করিয়ে ভর্তি হলাম কন্‌জারভেতোয়ারে। আমার পিতা চলে গেছেন কিন্তু যখনি বাজাই ভায়োলিনটা, মনে হয় যেন আমার পিতার হৃদয় আমার হৃদয়ে এসে মিশে গেছে। আমার মাও স্তব্ধ হয়ে শোনে। সেও বোধহয় ওই ভায়োলিনের সুরের পথ ধরে চলে যায় আমার পিতার সান্নিধ্যে।'

বললাম, 'মার্থ, যদি ধৃষ্টতা না মনে কর তোমায় অনুরোধ করতে পারি কি যে, একদিন তোমার ভায়োলিন বাজনা শুনতে দেবে?'

সে হঠাৎ উঠে বলল, 'চল আভলিয়েতে ফিরবার সময় অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, সে আমার প্রশ্নে রাগ করেছে কি না।

উত্তর এল, 'না, রাগ করি নি। আমি ভায়োলিন বাজানো অনেক বছর হল ছেড়ে দিয়েছি।'

কারণ জানতে চাইলে সে বলল, 'গাব্রিয়েল আমার ভায়োলিনটাকে দেখতে পারত না। শেষে দাঁড়াল হয় ভায়োলিন, নয় তাকে ছাড়তে হয়। তাই দিলাম ভায়োলিনকে ছেড়ে।'

তার কথা এক বিরাট হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াল কিন্তু আর প্রশ্ন করলে সে রুষ্ট হবে ভেবে আর কিছু জানবার চেষ্টা করলাম না।

এরপর একদিন আমরা পরস্পরকে সেন্ নদীর ধারে বেড়াবার আমন্ত্রণ করলাম।

নদীর দুধারে উঁচু পাথরের বাঁধের উপর চলে গেছে ছোট ছোট টিনের বাক্সের সারি। তার মধ্যে আছে পুরোন, নতুন, খ্যাত কিংবা দুর্লভ বই, ছবি, প্রিন্ট, সুরকারদের স্বরলিপি, পুরাতন ঐতিহাসিক মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পোর্সেলিনের প্লেট ও ফুলদানী, ব্রোঞ্জ ও ক্যামিও আরও কত কি।

কত ভাগ্যবান রত্নসন্ধানী এই টিনের বাক্স থেকে খুঁজে পেয়েছে অমূল্য রতন। এই সেদিন একজন পঞ্চাশ টাকার মত ফ্রাঙ্কে ছবি কিনে আবিষ্কার করল যে, সে শিল্পী-মুরিলোর একটি বহুমূল্য চিত্রের অধিকারী এবং প্রায় দুলক্ষ টাকার মত ফ্রাঙ্ক মুনাফা পেল সেটা বিক্রী করে।

মার্থের ও আমার একটি প্রিণ্ট কিনবার মতও অর্থ সামর্থ নেই যে, ভাগ্যের বাজারে দুচার পয়সা ফেলে এ্যান্টিক কেনাবেচার জুয়া খেলি।

আমরা অপরের কেনাবেচা দেখি আর ভাবি, এই অগণিত সওদাগারীদের লব্ধ জাঙ্কের স্তূপে কোথায় লুকিয়ে আছে অমূল্য রত্ন, যা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে দর্শকদের চোখে তাক্ লাগিয়ে দেবে!

চার পাঁচটি টিনের বাক্সের ব্যবধানে ছোট স্টুল বা চেয়ারে বসে বিক্রেতারা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের প্রতি মাঝে মাঝে পড়ে তাদের অলস দৃষ্টি। তাদের আপাদমস্তক দেখে যেন আঁচ করে নেয় কার পকেটে আছে পয়সা এবং কিনবার আগ্রহ। কেউ কোন পণ্যের দাম জানতে চাইলে অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে তা বলে। তাদের ওই নিস্পৃহতার ভাব চলে যায়, যেই কেউ কিনব বলে পকেটে দেয় হাত। অদৃশ্য কোন্ স্প্রিং তাদের সর্বাঙ্গ চাঙ্গা করে দেয় এবং হাত মাথা ও জিহ্বার সঞ্চালন এক সাথে হয় ক্ষিপ্র।

এই রকম ভাবে জীবনের অভিনয় আমরা দেখছি শরতের ঠাণ্ডা দিনে। মেঘে ঢাকা দিনের শেষ কি আরম্ভ বোঝা যায় কেবল ঘড়ির কাঁটা দেখে। নদীর দু কিনারায় সারি সারি প্লেন গাছের লালচে সোনালী পাতায় সবুজের আভাস কমে গেছে আর সেগুলি ঝরে পড়ছে বাতাসের একটু কাঁপন লাগলেই। চওড়া যে রাস্তা নদীর কিনারা বেয়ে চলেছে তার একদিকে এই গাছের থামে ভর-করা সোনালী পাতার আচ্ছাদন। অন্যদিকে পাঁচ ছ তলা বাড়ির সারি এবং মাঝে মাঝে তার জমাটকে তফাৎ করে বড় ফাটলের মত গাঢ় রং-এর রাস্তাগুলি।

সেগুলি দৃষ্টিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয় না ; আরও ধূসর কালো বাড়ির ঠেলাঠেলির মধ্যে লুকিয়ে যায় তাদের স্রোত।

একটি বেঞ্চির উপরে জমা শুক্‌নো পাতার রাশি সরিয়ে মার্থ আর আমি বসে গেলাম শহরের হট্টগোল দেখতে আর শুনতে।

সে বললে, 'তোমাকে একটা কথা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি কিন্তু প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি না জানি না।'

বললাম, 'মাদ্‌ম্যয়জেল্, ওটা শিগ্‌গীর বলে মাথা ঠাণ্ডা করে ফেল। উচিত অনুচিতের বোঝাপড়া পরে করা যাবে।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখ তোমায় আমি পরিচয়ের প্রথমে বলি যে, আমাদের সম্পর্ক পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে রেখে দিতে হবে এবং সে গণ্ডীকে অতিক্রম করার চেষ্টা যদি কোন দিন কর, তাহলে আমাদের বন্ধুত্বের হবে ওইখানেই সমাপ্তি। ওইখানেই আমি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেব বলায়, তুমি বলেছিলে যে তোমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের পরিচিতের গণ্ডী পেরিয়ে নিকট-সম্পর্কের কোন সম্ভাবনা হয় না—এ কি সত্যি?'

বললাম, 'মার্থ, তোমার একটু আশ্চর্য লেগেছে, কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকে একটা বেড়া, যাকে কেউ যদি টপ্‌কে যাবার চেষ্টা করে অমনি সমাজে পড়ে যায় হৈ চৈ।

'তোমাদের যে এই মেয়েপুরুষের স্বচ্ছন্দ খোলাখুলি মেলামেশা এ আমাদের দেশে আসতে অনেক দেরী। তবে এ যে আসবে তার আভাস দেখা যায় একটু আধটু। তোমার সঙ্গে যেমন দিনের পর দিন কথা বলি, বেড়াই, তাতে আমাদের সম্পর্ক যে কেবল পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এ আমাদের সমাজে ঘটলে লোকেরা কেউ বিশ্বাস করবে না। সেখানে মেয়েপুরুষের—সান্নিধ্যের পরিণতির একটা বদ্ধ ধারণা আছে—যার ফলে বয়সের তারতম্য থাক বা না থাক, একজন পুরুষকে কোন মেয়ের সঙ্গে তিনবার ঘুরতে দেখলেই পড়ে যাবে কানাকানি

এবং লোকে মনে করে নেবে তাদের ওই নরনারীর আদিম নৈকট্য ঘটেছে।

'নরনারীর সাহচর্যে আমাদের সমাজে নিছক বন্ধুত্ব কেউ কল্পনা করতে পারে না। কারণ সেখানে জেণ্ডারকে ভুলবার মত ক্ষমতা সমাজ দেয় না। এটা যেমন অস্বাস্থ্যকর ধারণা বলে মনে করি— তেমনি তোমাদের সমাজ যে অবাধ দৈহিক মিলনকে একটা ডিনার খাওয়ার মত সহজ করে নেয়, তাও আমার ভাল লাগে না।

'ধর, সেদিন পিট্‌কিন্‌, ডাগারম্যান ও নানেৎকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটল। নানেৎ ডাগারম্যানের বান্ধবী এবং আজ কতকাল ধরে পিট্‌কিনও ডাগারম্যানের বিশেষ বন্ধু। ডাগারম্যান মাত্র চারদিনের জন্য প্যারীর বাইরে গিয়েছিল কিন্তু একদিন আগেই ফিরে পিটকিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, নানেৎ শয্যায় পিট্‌কিনের আলিঙ্গনবদ্ধা। সে প্রায় পিট্‌কিনকে হত্যা করত, নানেৎ দুজনের মধ্যে না দাঁড়ালে। কিন্তু নানেতের এই ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হচ্ছে এই যে, নানেৎ ডাগারম্যানকে সত্যিকার ভালবাসে আর পিটকিন্‌ তার বন্ধু বলে, তাকেও ভাল লাগে। একলা নিঃসঙ্গ লাগছিল তার, তাই সে পিট্‌কিনের সঙ্গে করেছে একটু মিতালী। কিন্তু তাই বলে কি তার ডাগারম্যানের প্রতি ভালবাসা ক্ষয়ে গেছে? ছেলেমানুষের মত সে এই নিয়ে কেন একটা সীন্‌ করল?

'এই অবাধ স্বচ্ছন্দ প্রণয় দেওয়া-নেওয়াকে তোমাদের অনেকে বলেন—এ্যাডল্‌ট্‌ মনের পরিচয়জ্ঞাপক। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই সোজা বিলি-করা প্রণয়ে নেই ভিত্তি নেই গভীরতা।'

মার্থ চোখ বড় বড় করে বলল, 'তাহলে তোমাদের মেয়েপুরুষে কোনদিন বন্ধুত্ব হয় না? হয় না প্রেম, হয় কেবল বিবাহ?'

বললাম, 'বিবাহ বাদে মেয়ে পুরুষে আমাদের সমাজে বন্ধুত্ব হওয়া দুর্লভ। কারণ তা চাইলেও সমাজ তা সহজে ঘটতে দেবে না। আর বিবাহের বাইরে প্রেম যে একেবারে হয় না তা নয়, তবে তা ঘটে

থাকে অন্তরালে অগোচরে, চুরি করে ফল খাওয়ার মতো এবং এ ভাবে প্রণয়াসক্তরা মনে করে যে, তারা ভালবেসে করেছে পাপ।'

মার্থ বললে, 'কিন্তু তোমাদের দেশের ছেলেরা তো এখানে বেশ প্রেমে পড়ছে এবং আমাদের দেশের ছেলেদের মত বেশ অবাধে সব কিছু করে যায়। আর আমার মনে হয় না তাদের ধরন-ধারন দেখে যে, তারা পাপ করে অনুতপ্ত।'

বললাম, 'ম্যাদ্‌ম্যয়জেল্‌, তাদের বদ্ধ মনটা হঠাৎ তোমাদের সমাজের এত খোলা আবহাওয়ায় এসে একটু উন্মত্ত হয়ে যায় কিন্তু এরা দেশে ফিরলেই এখানের অতিবিস্তৃত মনের জালকে এরা গুটিয়ে একটা শক্ত গ্রন্থি দিয়ে তুলে ফেলে স্মৃতির তাকে।

'বাস্তবে এরা হয়ে যায় চলমান সমাজের একটি অংশ। এদেরই অনেকে আবার দেশে ফিরে সমাজ-ধর্মের ঢাক বাজিয়ে শাসায়, যদি কেউ সাহস করে পড়ে প্রেমে এবং ধরা পড়ে যায় এদের নজরে।'

সে বলল, 'মানলাম তোমার কথা—কিন্তু তোমার দেশের ছেলেরা তো অনেকেই এদেশের মেয়েদের বিবাহ করে ভারতে নিয়ে গেছে। তারা কি সমাজের ওই ব্যবস্থাই মেনে নেয় এবং তোমাদের সমাজও তাদের গ্রহণ করে?'

বললাম, 'সমাজ কেন তাদের গ্রহণ করবে না মাদম্যয়জেল্‌, বিবাহ করলেই পূর্বপ্রণয়ের সকল পাপ থেকে হয়ে যায় আমাদের সমাজে মুক্তি। অবশ্য এই বিবাহের ফল যে সর্বদাই শুভ হয়, তা নয়। তোমাদের সমাজ ও জীবনধারা আমাদের জাতীয় জীবন থেকে ভিন্ন—তাই তোমাদের আমাদের দেশে ঘর সংসার করতে গেলে হয় নিজের দেশীয় সত্তাকে একেবারে ভুলে বিলিয়ে দিতে হবে আপনাকে, পতির সমাজের রীতিতে ও ধর্মে; না হলে করে নিতে হবে ছোট একটা তোমার-দেশীয় সমাজের কাঠামো—যার মধ্যে পতিদেবতা তাঁর সমাজ ও [illegible] পরিত্যাগ করে পত্নীর বানানো খাঁচায় বাস করবেন। বহুক্ষেত্রে এই দুয়ের ব্যতিক্রম হলে হয় দ্বন্দ্ব ও তার শেষ পরিণতি

সেপারেশন ও ডিভোর্স। আমাদের দেশের ছেলেরা, এ সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন নয়—যখন তারা এদেশে প্রেমে পড়ে বা করে বিবাহ। বেশীর ভাগই, তারা এটাকে গ্রহণ করে তোমাদের পোষাক পরার মত। দেশে ফিরলেই কাপড় বদলানোর মতো বদলে ফেলে রুচি ও আচরণ। অনেকে বিবাহ পর্যন্ত করে পত্নীত্যাগী হয়ে দেশে ফিরেছে।

'সেদিন শুনলাম আমার এক বন্ধুর মুখে একটি ঘটনা। তিনি লুক্সাম্বুর বাগানে একটি বেঞ্চে বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসে একটি ফরাসী মহিলা উলের পুলোভার বুনছিলেন আর সামনের বালি-ভরা চত্বরে খেলা করছিল একটি বছর আড়াই কি তিনের মেয়ে। ফরাসীনীর দেহের রং সাধারণ শ্বেতকায়ের চেয়েও সাদা আর চুল ফ্যাকাসে সোনালী হয়ে প্রায় ব্লণ্ডের পর্যায়ে পড়েছে। চোখ দুটি গভীর নীল। কিন্তু শিশুটির রং প্রায় বাদামী আখরোটের মত, কৃষ্ণকাল চুল আর কাককালো চোখ। বন্ধু ভাবলেন, অপর কার মেয়ে মহিলাটির সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। তিনি কয়েকবার পরিচয়-উৎসুক দু একটা দৃষ্টি বন্ধুর দিকে ফেলে আরম্ভ করলেন, 'বেশ দিনটা না? আপনি কি ভারতীয়?·· ইত্যাদি আলাপ করার ছকে ফেলা কথা। তারপর বললেন, 'আমার স্বামীও ভারতীয় আর এটি আমাদেরই কন্যা। এই য়ু্যগেৎ···মঁসিয়োকে বঁzু্র বল।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন আপনার স্বামী কি করেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'ডাক্তার। কিন্তু এখন তিনি ভারতে।' তারপর মহিলাটির চোখে এল জল। তিনি বলে চললেন, 'য়ু্যগেৎ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাঁকে দেশে ফিরতে হল। বলেছিলেন, দু মাসের মধ্যেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর হল ওই একই জবাব আসছে। এখনও তিনি পাথেয় সংস্থান করে উঠতে পারেন নি। তা ছাড়া ওদেশী সমাজে আমাকে গ্রহণ করার ছাড়পত্রও তো পেতে সময় লাগবে। কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি আমার সব আশাকে নির্মূল করে দিয়েছে। তিনি

লিখেছেন, 'তোমাকে যখন বিবাহ করি সে সময়ে আমাদের দেশের সমাজধর্মের নিয়মে ডাক্তারদের বিবাহে নিষেধ ছিল। ভেবেছিলাম, আধুনিক পরিবর্তনের দ্রুততালে হবে এই নিয়মের শেষ এবং তোমাকে গৃহে বরণ করে ধন্য হব। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সে নিয়ম এখনও এখানে সমাজে বিশেষ বলবান, তোমাকে ও য়্যুগেৎ-কে কাছে পাবার জন্য আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিরুপায়।' তারপর মহিলাটি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, দেশের ধর্মের এই বীভৎস ও নির্মম নিয়মের কোনদিন কি সংস্কার হবে না?' বন্ধু বললেন, তিনি এ নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানেন না, কারণ এ নিয়ম ভারতের সর্বত্র ও সর্বজনের নয়। তিনি ভারতের যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে কেউ এই বর্বর প্রথার কথা জানে না বা বলে না। তিনি উঠে গেলেন বেঞ্চি থেকে ভদ্র সম্ভাষণ জানিয়ে এবং মনে মনে পাষণ্ড ব্যক্তিটি —যে এই নীচ প্রতারণা করেছে, তার মুণ্ডপাত করতে করতে।

মার্থ বললে, 'তা হলে কি লোকটা মিথ্যা বলে প্রবঞ্চনা করেছে, আর এরকম নিয়ম তোমাদের দেশে নেই?'

বললাম, 'মাদ্‌ম্যয়জেল্‌, তাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলে এই মহিলাটির পাণিগ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে হবে, তাই সে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠকিয়েছে তাঁকে।'

দেশী বিদেশী প্রেমের খসড়া

'আমাদের দেশের ছেলেরা এদেশে প্রেম করে-করে বিবাহ, কেউ বা করে বন্ধুত্ব। কিন্তু দু একজন আবার এমনও আছে যারা এর কোনটাই করে না—কারণ আমাদের সমাজের আবহাওয়া তাদের গায়ের থেকে নামতে চায় না। অথচ এ দেশী বাতাসও ফাঁকে ফাঁকে ফুৎকার দিয়ে তাদের মনটা দেয় গুলিয়ে।

'আমাদের জানা একটি ছেলে ছিল এই রকমের। তার কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে সংযমে ও স্বামী বিবেকানন্দের নীতির আদর্শে।

'পড়াশুনায় ভাল ছেলে সে, এখানে এল থিসিস্ লিখতে কিন্তু তোমাদের রাস্তায়, বাগানে, ক্যাফে ও কলেজে—সর্বত্র ছেলে-মেয়েদের অবাধ প্রেমাভিনয় দেখে হল তার চিত্ত চঞ্চল। এল বাসনা। একদিকে তার মনের একটা অংশ যেমন সাগ্রহে চায় সঙ্গিনীর সাহচর্য, অন্য অংশ কর্তব্য-কঠোর সংযমের যষ্টি উত্তোলন করে তাকে শাসায় সংযত হতে। তার আর থিসিস্ লিখতে মন বসে না।

'অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে তার হতে লাগল সঙ্কোচ, পাছে কেউ তার এই মনের অতি গোপন বাসনা ও আলোড়ন জেনে ফেলে। সে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে না কারণ তার মনে সন্দেহ হয় যে আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে সে হয়ত আকাঙ্ক্ষা করবে তার দেহের স্পর্শের। তার কাছে এরা সব শুদ্ধা নারী, সে কোন্ সাহসে আনবে তাদের দেহে কলুষ। শেষে বাসনার তাড়না ও যুক্তি দুটোর মধ্যে সন্ধি করার কোন উপায় না দেখে সোজা সে চলে গেল একদিন—বহুজনসেবিকার পণ্যশালায়, ভাড়া করা পীরিতের সন্ধানে।

'নিয়মাভ্যস্ত সে, তাই তার এই বাসনার পরিণতিও পড়ে গেল বাঁধা ধরা নিয়মচক্রের খাদে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যাবেলায় সে কেমন আড়ষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে যেত, কারণ সেই দিন তার ধার্য ছিল দেহবিপণীর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। বেশ বোঝা যেত, সে সারা সন্ধ্যা নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙত তার ধৈর্যের বাঁধ। মদ্যপ যেমন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করবে না শপথ করে পরে ধাবিত হয় পানশালার দিকে আরও উত্তেজিত হয়ে—এও প্রায় সেই ভাবে চলত প্রতিবার, না যাবার শপথ করে—দেহের সাড়াকে ক্রীত

মাংসপিণ্ডের ক্ষণস্পর্শে স্তিমিত করে দেবার উদ্দেশ্যে। সকলেই জানত তার এই দুর্বলতা।

'যখন সাহস করে একজন জিজ্ঞাসা করল, সে কেন বান্ধবীর সঙ্গে সুযোগ না নিয়ে ওই বহুজনের ভোগালয়ে যায়?

'তার উত্তর এল যে, মনের সঙ্গে লড়াই করে হেরে সে যদি পাঁকেই নামল, থাক সে পঙ্কিলতা তার একারই। শুদ্ধা ভদ্রা যুবতী বা নারীকে কলুষিত করতে সে প্রস্তুত নয়। যারা দেহের পণ্য বেচে তাদের সংস্পর্শে তার কোন গ্লানির কারণ নেই। কারণ তারা কেউই নিষ্কলুষ নয়।

'দেশে ফিরে সে নিশ্চয়ই এতদিনে বিবাহ করে ঘর সংসার পেতেছে এবং বোধহয় মনে করে, যারা বিদেশে বান্ধবী নিয়ে করত মাতামাতি তাদের চেয়ে সে চরিত্রবান ও নিষ্পাপ।

'বিবাহের বাইরে নারীর সাহচর্যের যে অন্তরায় আমাদের মনে, তাকে তোমরা ইন্‌হিবিসান্‌ বলে বিদ্রূপ করতে পার কিন্তু আমরা এখানে অস্বাভাবিক সংস্কারবিহীন ভাব দেখিয়ে যতই আস্ফালন করি না কেন, স্বদেশের সামাজিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারি না। এইজন্য অনেক ভারতীয় ছাত্র মনকে সংযত রেখে কোন নারীর হস্ত স্পর্শ পর্যন্ত না করে, আপন ধারণায় নিষ্কলুষ হয়ে দেশে ফিরেছে। এই মনোবৃত্তি কেবল আমাদের দেশের লোকদেরই মধ্যে বলবৎ দেখা দেখা যায়।'

মার্থ হেসে বলল, 'তাহলে তোমাদের দেশের লোকেরা প্রেম কি তা জানে না।'

বললাম, 'না মাদ্‌ম্যয়জেল্‌, এটা তুমি ঠিক বললে না। আমাদের দেশের লোকে প্রেম করে, কেবল তার ধারণা ও রীতি অন্যতর। তোমাদের দেশে কি এখন রোমিও জুলিয়েটের নূতন বাস্তবে প্রেমাভিনয় দেখ? তার স্থান এখন কেবল রঙ্গমঞ্চে, অলীক কাহিনীতে মনোরঞ্জন

মাত্র।* বাস্তবে এই প্রেমাভিনয় দেখলে বলবে এ 'কাফ্-লাভ্'এর চেয়েও ছেলেমানুষী। কিন্তু আজকের দিনেও আমাদের দেশে এই ধরণের প্রেমের দৃষ্টান্ত অবিরল নয়।

'আমার মনে আছে কলেজে পড়তে এক সহপাঠী একদিন এসে বলল, তার মাতুলপুত্র আত্মহত্যা করেছে। সে যে তরুণীকে ভালবাসত তার সঙ্গে বিবাহ হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না তা জেনেও তারা পরস্পরে গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়েছিল, যদিও কোনদিন হাতে হাত পর্যন্ত দেয় নি। যখন তরুণীটির অন্যের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করা হল, সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা হয়ে এক চাঁদিনী রাতে বাড়ির ছাদে ফুলশয্যা রচনা করে গলায় মালা দিয়ে একত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করল।

'তোমাদের আবেলার্ ও এলোয়াস্-এর স্বর্গীয় প্রেম, কি মাদাম বোভারির প্রেমের ভ্রান্তিও দেখতে পাবে আমাদের সমাজে—কেবল তার প্যাটার্ণে কিছুটা তফাৎ।'

মার্থ একবার প্রশ্ন শুরু করলে তা চলত ধারাবাহিক। ছোট ছেলেদের গল্প বললে যেমন ক্রমাগত বলে যায় 'তারপর কি হল'—তার প্রশ্নগুলিও প্রায় সেই রকম।

সে বললে, 'তোমাদের বিবাহ বিনা স্ত্রী পুরুষের আদি প্রেম সম্ভব হয় না কিন্তু বিবাহের পর কি আদি প্রেমের মত প্রণয় ঘটতে পারে না? তোমাদের আবেলার্, এলোয়াস্ ও মাদাম্ বোভারিদের শেষ পরিণতি কি হয়?'

বললাম, 'আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় বলতে পারি না —বিবাহের পর আমাদের দেশে আদি প্রণয়ের মতো সফল চুক্তিহীন প্রেম হয় কিনা। আমাদের আবেলার্ ও এলোয়াসরা বেশীর ভাগই করে আত্মহত্যা আর তা না হলে হয় দেশত্যাগী। আর মাদাম বোভারিরা শুদ্ধ সমাজে টিক্তে পারে না। তাদের বেশীর ভাগই ভীড় করে দেহের পণ্যশালাগুলিতে।

'আমাদের সমাজে বিধিদাতা মনুর নাম শুনেছ? তাঁর বিধানে, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানার্থে স্ত্রী গ্রহণ। তোমাদের দেশে বিবাহ বন্ধনের বাইরে প্রেমের যত ছড়াছড়িই হোক অন্ততঃ সন্তান-কামনায় বিবাহ-বন্ধনে তোমরা আমাদের মনুর বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছ। আমাদের দেশের বিবাহটা হয় শাস্ত্রমতে কিন্তু বিধির উদ্দেশ্যটা মুখ্য করে নয়। সন্তানরা আসে বাঞ্ছনীয় বলে নয়, বেশীর ভাগই অবাঞ্ছিত তারা। পৃথিবীতে আসতেই থাকে কারণ তাদের আসবার পথ লোকে রুদ্ধ করতে পারে না বলে। স্ত্রী পুরুষের মধুর সম্পর্কের কোন্ পথটা উচিত বা অনুচিত তার সর্বজন-সম্মত ধারণা এখনও করা যায় না। আমার মনে হয়, যতক্ষণ যে, যে-সমাজে বাস করছে তারই নীতি ও ধর্ম মেনে চলা উচিত। না হলে সমাজের ভিত্তি আলগা হয়ে 'এনার্কির' সূত্রপাত হবে। জোর করে সমাজের বিরূপ রীতি অন্য সমাজে আমদানী করলে কেবল বিক্ষোভেরই সম্ভাবনা। তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি এখনই বলবে, 'হোক না এনার্কি'। তার জবাবে বলব, এনার্কিতে হবে বহুজনের ক্লেশ ও আক্ষেপ। মানবের স্বভাব-ধর্ম তা চায় না, তাই যা অনেক যুগ ধরে মানুষের সমাজ যাচাই করে চিনে নিয়েছে, মঙ্গলকর প্রবৃত্তি ও পথ বলে, সেগুলিকেই তারা চিরন্তন করে ধরে রাখতে চায়। তার কিছুটা এসেছে ধর্মের বিশ্বাসে ও সমাজের নিয়ম ও নিষেধে কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনের কাঠামোয়। যদি এ নিয়মের কোনটির প্রয়োজন অচল ও শেষ হয়ে যায়, তবেই সমাজ তাকে ত্যাগ করবে কিন্তু তাও বিনা-প্রশ্নে বা প্রতিবাদে নয়। কারণ অভ্যস্ত বিধি অচল হলেও, সহজে তাকে ত্যাগ করা দুরূহ।

মার্থকে নিরস্ত করা যায় না। তার প্রশ্ন এল—এতকাল মঙ্গলকর পথ ও বিধি জেনে ও অবলম্বন করেও আমাদের সমাজে দুঃখ, অশান্তি ও ক্ষতির শেষ কোথায়? আদিমকালের মানব সমাজে মানসিক যে ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল তার পরিমাণ ও অনুভূতি এখন কি কিছু কম?

বললাম, 'মার্থ এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আসেন বুদ্ধ ও

ক্রাইষ্টের মত মহাপ্রাণরা। জান, বুদ্ধকে ক্লেশ ও দুঃখ কি প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, 'যার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই না তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং যাকে ছাড়তে চাই না তার বিচ্ছেদেই হয় দুঃখ ও ক্লেশ। সমাজ মঙ্গলের পথ জানলেও বহু দিনের জমা অমঙ্গলের খাদ ছেড়ে উঠে আসতে পারে না। চেষ্টা করেও তাই সমাজ তৈরী হয় না, সঠিক এই মহামানবদের উপদেশকে অনুসরণ করে। সমাজে তৈরী ফ্রেমে কিছুটা তাঁদের মত ও নীতি ছেঁটে, কেটে, রাঙিয়ে, মানিয়ে, ধরে নেওয়া হলে সেইটুকুই আসে মাত্র। তাই দুঃখের ক্লেশের ও শোকের অন্ত মানবসমাজ কোনদিন দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।'

সূর্যবিহীন দিনের আলো কমতে কমতে কখন যে সন্ধ্যার ঘোলা আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে আমরা লক্ষ্য করি নি। স্যেন নদীর বাঁধের দু পাশের ও সেতুগুলির উপরের আলো জলে পড়ে ছোট্ট ছোট ঢেউ-গুলিকে সোনালী রূপালী রশ্মিতে রাঙিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। দু একটা টাগ্ ঝিক্ ঝিক্ করে আকাশে ধোঁয়ার রেখা ফেলে চলে গেল। নদীর ওপারে লুভ্‌র্ প্রাসাদের আবছা সীমারেখা কুয়াশার যবনিকায় পড়ে যেন বিরাট একটি একোয়া-টিন্‌ট্ প্রিন্টের মতো দেখাচ্ছিল।

আমার বেশ ভাল লাগে এই ঝাপসা ছবি। একে ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড করে আঁকা যায় মনের পটে কত নকশা। সেগুলি টকি ফিল্‌মে ফ্ল্যাশব্যাকের মতন সাজিয়ে দেখা এবং শোনা চলে। পোঁ দেজার— সেতুর ওপারে লুভ্‌র্-এর দোতালায় গ্রাঁ গ্যালারির গবাক্ষগুলি যেন সহস্র বাতিদানের মুক্তাবৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কখনও বা নৃত্যক্লান্ত দম্পতীদের দু একজন বাতায়নদ্বারে এসে দাঁড়াল। তাদের চলবার ও দাঁড়াবার ভঙ্গিতে নেই আধুনিক যুগের ব্যস্ততা। ধীর সে ছন্দ, আকাশে ভেসে যাওয়া শরতের মেঘের মত। কানে এল যেন ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর সুরধ্বনি। সে সঙ্গীতও তাদের গতি-ভঙ্গির ছন্দে সাবলীল। সে সুরধারাকে পার্‌কাসান্ যন্ত্র ঘাত

প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল করে নি। কত যেন প্যালেস্ত্রিনা, ভিভাল্দি, লুলি প্রভৃতি সুরস্রষ্টাদের সঙ্গীত বাঁশরী ও বেহালার বিবিধযন্ত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতি উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে আহ্বান করতে লাগল রসিকজনদের, 'এস, এস' বলে।

মার্থকে বললাম, 'জান মাদ্‌ম্যয়জেল, যবে থেকে পারকাসান্ যন্ত্রগুলি সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তবে থেকে সুর হয়ে গেছে বন্দী। এই যন্ত্রগুলি বংশী ও তন্ত্রীর অব্যাহত সুরধারাকে যেন বন্দীশালার ব্যারাকে পুরে জোর করে কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। পারকাসানের ঢাক, ঝাঁঝর, কাঁসা, করতাল ইত্যাদি যেন সঙ্গীতের তাল ও মাত্রা-গুলিকে স্থূল অবয়ব দিয়ে ফেলে দেয়, তন্ত্রীময় যন্ত্রের এবং কাঠ, বাঁশ ও ধাতুময় বাঁশীর সুর উন্মথিত মোলায়েম সঙ্গীত-ধারার সামনে, বাধা পেয়ে আছড়ে সে সুর-সঙ্গীত ছিটকে পড়ে। যেমন বম্ পড়লে লোকেরা নিজেদের খাদে আড়ালে ফেলে আত্মগোপনের চেষ্টা করে তেমনি, পারকাসানে ঠিক্‌রে-পড়া বাঁশী বা বেহালার সুর যেন কোথায় লুকিয়ে যায়। পারকাসানের ঝনঝনা মিলিয়ে গেলে আবার তারা যেন সাহস পেয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিক্ষিপ্ত সুরের ধারাগুলি আবার এসে মিলে যায় সঙ্গীতের আসল স্রোতে। বহু ক্ষেত্রে তার দৌড় এগোয় না বেশীদূর। দামামা, ঝাঁঝর কি করতাল গড়িয়ে দেয় তার সামনে দু-একটি তাল ও মাত্রার প্রস্তর কি ইঁট। আবার সুর ঠিকরে ছিটিয়ে পড়ে—স্তব্ধ স্তিমিত হয় সঙ্গীতের স্রোত।

'ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সঙ্গীতকার প্যালেস্ত্রিনা, ভিভাল্দি, স্কার্‌লাতি প্রভৃতির সুর-ধারায় পারকাসানের অভ্যুদয় হয় নি বলে বড় প্রাণস্পর্শী সে রচনাগুলি। তখনকার দিনের লোকেদের অনুভূতির গভীরতা ও তীব্রতা যেন মনে হয় এখনকার মানুষের চেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদন-শক্তিতে ভরা ছিল। শতাব্দীর জড় করা, এগিয়ে চলার পথে কুড়োন শিল্প-সম্পদ জমে আজকে শিল্প ও সঙ্গীতকে করে তুলেছে একটি কিউরিও শপ্। সেখানে যেন অতি প্রাচীন

কলসাসের ধাতব ভাঙা মাথার খুলিতে ফুলদানী করে সাজান হয়েছে আজকের কেয়ারি-করা কলমের ডাচ্ টিউলিপ। আর এর সমন্বয়কে বলা হচ্ছে আধুনিকতা। সে যুগের মানুষের স্বভাবে আচার-ব্যবহারে ছিল না এতটা সভ্যতার 'ভিনিয়ার'। তাই তাদের ভালবাসা ও ঘৃণা হাসি ও কান্না, দান ও লুব্ধতা, দয়া ও ক্রুরতায় তফাতের দাঁড়ি বর্তমানের তুলনায় অতিশয় দীর্ঘ। তাদের বাঁচা মরায় বেশ একটা অভিনয় ও রহস্য ছিল—অন্ততঃ ইতিহাসের খাতায় তার যে ছাপ রয়ে গেছে তাতে সেই রকমই মনে হয়।

'আধুনিকতার সোরগোলে সাধারণের স্বকীয়তা হারিয়ে গেছে তাই ভায়োলিনকে ধাক্কা মারে ট্রম্‌বোন্ আর ট্রম্‌বোন্‌কে ধমক দেয় বিগ-ড্রাম—ওবো-র কাঁদুনি ও ফ্লুটের ফুৎকার তলিয়ে যায় কাঁসর আর ট্রায়াঙ্গেলের ঝঞ্ঝায়; মনে হয়—কে যেন সুরের ডাস্টবিন উল্টে ঢেলে দিয়েছে সঙ্গীতের আবর্জনা। মোৎসার্ত্ পর্যন্ত পারকাসান, সুরের কুলীন সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। বিতোফেন তুললেন তাকে জাতে আর ভাগনার তার হাতে যষ্টি দিয়ে করে দিলেন সঙ্গীতের শাসক। তারপর থেকে তার উত্থিত যষ্টি তুলো ধুনছে সঙ্গীতের দেহে। আমাদের দেশের এক বিখ্যাত সুরকার গীতির রচনায় বলেছেন—

'গীত কী সঙ্গীত মান
সঙ্গীত কি সুর মান
তাল মান মৃদঙ্গ
নৃত্য মান রম্ভা॥'

আমার মনে হয় রম্ভাকে নাচাতে গিয়ে মৃদঙ্গের তালে সুর ও সঙ্গীতের পড়ে গেছে হাতে ও পায়ে বেড়ী।'

সে বলল, 'আমাদের চারপাশে ঘোলাটে ও আবছা হাওয়ায় মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা শ্যাম্পেনের গ্লাসে ডুবে গেছি, আর চারপাশে যে অসংখ্য বুদবুদের বিন্দু উঠে চলেছে তাদের পথ অনুসরণ করতে করতে হারিয়ে ফেলেছি সময়ের অগ্রপশ্চাৎ, ভুলে গিয়েছি জমির

সীমানা—দৈর্ঘ ও প্রস্থ। পারকাসানের বিরুদ্ধে তোমার এই তীব্র দোষারোপ শুনলে ভাগনার, বারলিয়স কি হিন্‌ডেমিথ-এর উপাসকরা তোমায় এই সামনের ল্যাম্পপোস্টে 'লিন্‌চ্' করতে দ্বিধা বোধ করবে না।'

বললাম, 'আমাদের দেশের চলিত কথানুযায়ী তারা আমার হাড় খাক, মাস খাক, আর আমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাক কিন্তু তখন আমার কর্ণদ্বয় তো অব্যাহতি পাবে পারকাসানের নির্দয় অত্যাচার থেকে।'

রাস্তার ঠিক ওপারে ছিল একটি গ্রীক রেস্তোরাঁ। সেখান থেকে ভেসে এল সারেঙ্গী জাতীয় যন্ত্রের সঙ্গে অর্ধপ্রাচ্য উদাস সুরের রেশ। শুনে মার্থ বললে, 'ওই নাও, তোমার পারকাসান মর্দিত কর্ণদ্বয়কে স্নিগ্ধ করতে সুরধারা ঢালছে কলসাসের দেশের লোক।'

আমি মনে মনে ইতিহাসের ছবির পর ছবি রাঙিয়ে চলেছি। মার্থ, আমি যে এতক্ষণ নীরব থেকেছি তার জন্যে কোন অনুযোগ করে নি। মনে হল, সেও কোন পুরনো দিনের কাহিনীর চওড়া বুলভার ধরে এগিয়ে গিয়েছে বহুদূর। সেখান থেকে আমার প্রতি তার নজর আর বোধহয় পৌঁছচ্ছে না।

কিন্তু হঠাৎ আমরা দুজনেই চমকে উঠলাম আমাদের জাগ্রত স্বপ্নের থেকে।

দুটি ঘোলাটে রাঙা চোখ আর বিরাট একটি হাঁ-করা মুখ যার মধ্যে হলদে কয়েকটা প্রায় মাড়ি-বিচ্ছিন্ন খারাপ দাঁত; সেগুলিকে কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল এক উৎকট শব্দ। 'বঁসোয়াঁর মাদাম, বঁসোয়াঁর মঁসিয়ো।' আমরা দুজনেই বুঝলাম, এখানে বসে আমাদের আর আলাপ করা চলবে না। আগন্তুক মদ্যপানে বেশ নেশায় বিভোর হয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে আসর জমাতে।

আমাদের উঠতে দেখে লোকটি বলল, 'উঠছ যে? আমি এলাম তোমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করতে।'

আমাদের অন্য কাজ আছে বলতেই সে সামনে হাতটা চিতিয়ে ধরে বললে, 'আচ্ছা, যাবে যাও, তবে তোমাদের শুভ কামনার জন্যে আমি কিছু বকশিশ আশা করি। বেশী কিছু নয়—একপাত্র মদিরার দাম দিলেই চলবে।'

আমরা তাকে এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে ডুবে গেলাম জনস্রোতে। মার্থ অস্ফুট স্বরে দিল লোকটার উদ্দেশ্যে একটা গালাগাল।

বললাম, 'মার্থ, মাতালকে গালাগালি দিয়ে কি হবে ?'

সে বললে, 'মাতলামি করছে কিন্তু পয়সা চাইবার জ্ঞানটা খুব টনটনে আছে।'

হেসে বললাম, 'জান—লোক মাতাল হলেও মগজের খানিকটা অংশ সহজ মানুষের মত সজাগ রেখে দেয়। এর প্রমাণ আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন একবার পেয়েছি।

'আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একটা তাড়ি-খানা। সেখানকার খদ্দের বেশীর ভাগই ছিল বাজারের মাছবিক্রেতারা। তারা যখন পথ দিয়ে নেশায় টং হয়ে আবোল-তাবোল গান গেয়ে চলত, পাড়ার লোকে দু একটা কটূক্তি ছাড়া তাদের এই উপদ্রব মোটামুটি সহ্য করে নিত।

'কিন্তু একদিন দেখা গেল একটি ভদ্র-সন্তান টলতে টলতে বেসুরো বেতালা আবোল-তাবোল গাইতে গাইতে চলেছেন সেই পথ দিয়ে।

'পাড়ায় একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেলুড়ে ছেলের দল জড়ো হয়ে গেলাম তার চারপাশে। লোকটির গলায় ছিল চাদর। পাড়ার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক তার গলার চাদরটি সজোরে ধরে রূঢ় ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ভদ্রসন্তানের এই ইতরজনোচিত আচরণ কেন ?

'নিজেকে এই রুষ্ট জনমণ্ডিত দেখে মুহূর্তে মদ্যপের খামখেয়ালী ভাব ও প্রাণখোলা সুর কোথায় উবে গেল। কিন্তু চকিতের মধ্যেই ফিরে এল তার নেশার ঘোর। সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ভদ্রলোকের চটি

জোড়া পায়ের থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় রাখলে আর বললে, "মশাই, ছিলুম বেচুরাম চাটুজ্জে আজ বড় তুঃখেই হয়ে গেছি শেখ বেচু।"

অবশ্য মার্থকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে হল 'বেচুরাম চাটুজ্জে' ও 'শেখ বেচু'র তফাৎটা কোথায়।

'ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন, 'আপনার "শেখ বেচু" হবার কি দরকার ছিল?

'তখন তার তুই গণ্ডের ধারায় প্লাবন এসে গেছে।

'সে বলল "সাধে কি হয়েছি? আমার একমাত্র ছেলে, যখন সে চলে গেল তখন পারলুম না নিজেকে ধরে রাখতে বেচারাম চাটুজ্জে করে।"

'ভদ্রলোক অতি স্নেহে পাতুকা তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তার মাথার ধুলোটি ঝেড়ে দিলেন। তাঁরও চোখে প্রায় জল এল। বললেন, 'ভাই এ পথ দিয়ে যখনই যাবে তুমি, বেচুরাম চাটুজ্জ্যে কি শেখ বেচু যেভাবেই থাক আমার সঙ্গে বসে তুটো মনের কথা বলে যেও'।

'আমরা ছেলের দল একটু ব্যঙ্গ কৌতুক নাট্যোপভোগের আশা করেছিলাম কিন্তু এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের আধিক্য দেখে কিছুটা ব্যাহত হয়ে চললাম খেলার মাঠে।

'আমি কিছুটা এগিয়েই গিয়েছিলাম। পিছনে আসছিলেন টল্‌তে টল্‌তে, আবার থেমে-যাওয়া-সুরের মহড়া ভাঁজতে ভাঁজতে 'শেখ বেচু'।

'হঠাৎ শুনলাম, তিনি আমায় ডাকছেন, 'ওহে ছোকরা, জলখাবারের পয়সা পেয়েছ'?

'বললাম, 'না'।

'বললেন, তিনি, 'কি রকম বাপ-মার ছেলে হে? জলখাবারের জন্য তুটো করে পয়সা পাও না দিন'?

'বললাম, 'থাকলেই বা দেব কেন ?

'শেখ বেচুর উত্তর এল, 'দাও হে দাও, আজকে আমার রোজকার বাঁধা মাত্রা থেকে কিছু কম পান করেছি। কাজেই মৌতাতটা ঠিক জমছে না'।

'সন্দেহ হল। একটু আগে যে লোকটি কেঁদে ককিয়ে বলল, তার একমাত্র সন্তানের বিয়োগে সে আজ সব কিছু খুইয়ে হয়েছে "শেখ বেচু," ঠিক যেন সেই লোকটির গলার স্বর এ নয়।

'জিগ্যেস করলাম, 'মশাই একটু আগে মরা-ছেলের জন্যে কাঁদছিলেন আর এত শিগ গীর তাকে ভুলে ভাবছেন আপনার মৌতাতের কথা ?

'শেখ বেচু হেসে বলল, 'আরে ওই সময় আমার একমাত্র ছেলে বা মা যদি না মারা যেত তাহলে কি ওইখান থেকে এত সহজে ছাড়া পেতাম ?'

আমরা এসে গেছি প্লাস্ স্যাঁমিশেল-এ। ডান দিকে মাদাম পম্পাদুর্-এর অট্টালিকার শেষ অবশেষ তিনটি পাথরের খিলেন, তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে একটি সরু গলিতে, নামতে হবে ছয়টি ধাপ। তারপরে একটি ডানদিকের রাস্তায় কোণে কয়েক শতাব্দীর পুরনো দুম্‌ড়ে-পড়া ময়লা কালো একটি বাড়ি। তারই মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ছোট্ট একটি ঘরে আছে মার্থের মা, কন্যার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করে। স্টোভে হয়ত চড়িয়েছে সুপ।

আমরা পৌঁছলাম। জানি অনুরোধ করবে একবাটি সুপ খাবার জন্যে। গরম ঘোলাটে সুপ—তাতে কয়েক টুকরো মাংস আর টোস্ট-করা কয়েকখণ্ড রুটি ভাসছে।

তারা গরীব কিন্তু তাদের এই আতিথেয়তার অভিব্যক্তি ধনীর আমন্ত্রণের প্রাচুর্যকে লজ্জা দেবে।

আতলিয়েতে মাদম্ মিউভিল্ একদিন বললেন, 'খোদাই শিখবার জায়গা খুঁজছিলে, তার একটা খবর তুমি পাবে আমার এক বান্ধবীর কাছে। তিনি এখানে আজ দুপুরে আসবেন বলেছেন।'

ঠিক বেলা বারোটায় এক অপরিচিতা ইংরেজ মহিলা এলে তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁর নাম মিস্ হিটন্, পাথরে খোদাই করে ভাস্কর্য রচনায় ইনি বেশ দক্ষ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় এবং কার কাছে তাঁর শিক্ষা আর সেখানে আমার শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কিনা।

তিনি কথা দিলেন যে, আমায় তাঁর শিক্ষক প্রফেসার জিওভানেল্লির কাছে আসছে সোমবার নিয়ে যাবেন।

নির্দ্ধারিত সোমবারে মিস্ হিটন্-এর সঙ্গে উপস্থিত হলাম "রু দিদ"য় প্রফেসর জিওভানেল্লির আতলিয়েতে।

দরজা খোলার আগেই ভিতর থেকে ছেনী ও হাতুড়ির ঘায় পাথর কাটার ঝিক ছিপ শব্দ আসছিল, যেন দূর থেকে ভেসে আসা পার্বত্য নির্ঝরিণীর কল্লোলধ্বনি। ভিতরে ঢুকতে দেখলাম, বেশ মোটাসোটা এবং লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক বিরাট একটা মারবেল পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করছেন। তাঁর শক্ত মাংসপেশীগুলি সাদা ওভারঅলের ভাঁজে ভাঁজে আত্মপ্রকাশ করছিল। তাঁর মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি ছিল আর তার নীচে চওড়া কপালকে পটভূমি করে ঘন ভুরুসংযুক্ত প্রসন্ন দুটি চোখ জিজ্ঞাসু হয়ে আমার দিকে তাকাল।

মিস্ হিটন্ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি নিজের হাত দুটি অঞ্জলি বেঁধে প্রচুর থুথু সংগ্রহ করে তাইতে সাবানের মত হাত কচ্‌লে ট্রাউসারের পশ্চাতদেশে বেশ মুছে সাফ করে আমার ডান হাতে হাত লাগিয়ে করমর্দনের এক প্রচণ্ড টান দিলেন।

সেই মুহূর্তে মনে হল যে আমার সারা হাত খানা কাঁধের সঙ্গে

আর সংযুক্ত নেই। তাঁর মুখামৃতে পরিস্কৃত হাতের ছোঁয়াচে আমার দেহে ও মনে একটা অসোয়াস্তি এসে গেল! কতক্ষণে বাড়ি ফিরে স্নান করে ফের শুদ্ধ হব তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লাম।

প্রফেসর যখন শুনলেন যে, আমি এসেছি তার ছাত্র হতে তিনি আমার কোটের ল্যাপেলছুটি ধরে এক টান দিয়ে বললেন 'এত ভদ্রবেশী লোকেরা যে প্রস্তর-শিল্পী হতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। তোমার মত কত লোক এই আতলিয়েতে এসে আমার ধৈর্য এবং সময় নষ্ট করে চলে গেছে! তারা দুঘণ্টা পাথর পিটে শক্ত ব্যাপার বুঝে দু একদিনের পর আর আসে নি।"

তিনি প্রায় আমাকে অতিলিয়ে থেকে বের করে দিচ্ছিলেন।

সাহস করে বললাম, 'কেবল পোশাক দেখে কোন লোকের কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার মাপ অনুমান করে নেওয়াটা আমার মনে হয় না সর্বক্ষেত্রে ঠিক। আমি আপনার মূল্যবান সময়ের ক্ষতি করতে চাই না। আমাকে কাজ দিয়ে এক দিনের জন্যে পরীক্ষা করুন এবং অনুপযুক্ত বুঝলে না হয় তখন তাড়িয়ে দেবেন।'

মিস্ হিটন্‌ও আমার স্বপক্ষে একটু উপরোধ করতে তিনি শেষে আমায় ছাত্র করে নিতে রাজি হলেন।

পরের দিন ইঞ্জিন-ড্রাইভারদের মত ব্লু ওভারঅল্ কিনে এনে আতলিয়েতে কাপড় বদলে তৈরী হলাম পাথর-কাটার হাতেখড়ির জন্যে।

রু দিদর থেকে বেরুন যে গলির উপর জিওভানেল্লির আতলিয়ে সে রাস্তার দু ধারে আরও নানান শিল্পী ও কারিগরদের কর্মশালা। এই আতলিয়েগুলির সামনে একফালি জমি। এর প্রবেশ-পথের দিকের দেওয়ালটার প্রায় সবটা ঘসা কাচে ঢাকা। ভিতরে কেবল একখানি চৌরশ বড় কামরা এবং একমাত্র সামনের কাচের দেওয়ালে কয়েকটা ছোট ভেনটিলেশন্ জানলা ছাড়া আর তিন নিরেট দেওয়ালে আলো ও বাতাস যাতায়াতের কোন ফাঁক নেই।

প্রত্যেক কর্মশালার সামনের জমিতে দেখা যেত আতলিয়ে সংক্রান্ত কাজের আবর্জনার গাদা। জিওভানেল্লির ঘরের সামনে ছিল ভাঙা পাথর কুচির ছোট বড় কয়েকটি স্তূপ এবং নিকটে সাময়িক শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ অনেকেই ওই স্তূপগুলির আড়ালে সে কাজ সারতেন। ফলে তাঁর কর্মশালার অস্তিত্ব দরজায় পৌঁছনার আগেই নাকের মারফতে লোকে জানতে পারত।

আমি প্রথমে এর কারণ না জানায় এই ঝাঁঝাল গন্ধের উৎস কোথায় বুঝে উঠতে পারি নি। একদিন দেখলাম প্রফেসর ওই স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাথরুমের কাজ সারছেন।

হঠাৎ রাগ সামলাতে না পেরে তাঁকে এই অস্বাস্থ্যকর ও অশিষ্ট অভ্যাস সম্বন্ধে বেশ বড় একটা লেকচার দিযে ফেললাম এবং তাঁর থুথু দিয়ে হাত পরিষ্কার করায় আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও জানিয়ে দিলাম।

তিনি নবাগত ছাত্রের এরকম আক্রমণে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিরামহীন ঝগড়া করে শেষ পর্যন্ত ওই নোংরামী বন্ধ করতে পেরেছিলাম।

মনে আছে, এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে জিওভানেল্লি আমাকে বলেছিলেন, 'বন্ধুদের কামরায় গিয়ে বসে যে আরাম ও খোশগল্প করতাম তার সুখ নষ্ট করেছ তুমি কারণ তাদের ঘরের আশেপাশের পরিচিত গন্ধ আমার নাকে এখন আর সহ্য হয় না। তোমার মত সোফেস্টিকেটেড লোককে ছাত্র করার এই প্রতিফল।'

বললাম 'অস্বাস্থ্যকর জায়গার বাতাসকে পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা ম্যঁাসিয় ম্য প্রফেসর সোফিস্টিকেশন নয়। ভুলে যাবেন না, আমি ছাড়া একজন ভদ্রমহিলাও এখানে কাজ করে থাকেন। অন্ততঃ এইটুকু শিষ্টাচার তাঁর নায্য পাওনা।'

আমাকে কাজের জন্যে তৈরী দেখে জিওভানেল্লি বললেন 'গলির মোড়ে রু দিদর ফুটপাথে একটা মার্বেল পাথর পড়ে আছে সেটা আতলিয়েতে নিয়ে এস—বলেই আমার মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি পরিয়ে দিলেন।

কিছু বলতে যাবার আগে জানিয়ে দিলেন যে চারিদিকে পাথরের মিহি গুঁড়ো উড়ছে তার থেকে মাথা ও চুল বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা।

সেই অদ্ভুত সাজে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা করলাম সকলে আমার এই সঙগিরি দেখে হাসবে কিন্তু কেউই আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। তবুও মনে হতে লাগল যেন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ এবং তারির অসোয়াস্তির অনুভূতি নিয়ে চেষ্টা করলাম পাথরটাকে তুলে ঠেলে গড়িয়ে আনতে। কিন্তু বহু মণ ওজনের সেই পাথরটার এক পাশ একটু উঁচু করে তোলা ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, আমাকে তাড়াবার এ এক ফন্দি।

কিছুক্ষণ পরে জিওভানেল্লি এসে পাথর না এনে দাঁড়িয়ে আছি বলে বেশ ধমক দিতে শুরু করলেন।

বললাম তাঁর মত শক্তিশালী মানুষও ওটাকে স্টুডিয়োতে তুলে নিয়ে যেতে পারবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তিনি বললেন 'তোমায় ওটা উঠিয়ে আনতে তো বলি নি বলেছি কেবল আনতে। যাও আতলিয়ে থেকে তিনটে কাঠের মোটা রোলার নিয়ে এস।'

সেগুলি আনতে তিনি পাথরের এক পাশ উঁচু করে তলায় একটা রোলার লাগাতে বললেন এবং তার অন্য পাশেও তেমনি করে আর একটা রোলার লাগান হল। তারপর পাথরের সামনের দিকে নীচে ক্রমান্বয়ে রোলার লাগিয়ে সেটাকে সহজে আতলিয়েতে গড়িয়ে আনা গেল।

এরপর বড় একটা পাথরের টুকরো একটা স্ট্যাণ্ডের উপর লাগিয়ে বললেন, 'এটাকে কাটতে শুরু কর।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেটে কি তৈরী করব?'

উত্তর এল, 'কিছু না, কেবল পাথরটাকে কেটে শেষ করে দাও।'

আড়াই সের ওজনের হাতুড়ি এবং তারি অনুপাতে ভারি মোটা ছেনী দিয়ে কোনদিন পাথর কাটি নি। কাজেই আনাড়ির মত হাতুড়ি ঠিক ছেনীর উপর পড়ছে কিনা দেখতে গিয়ে তার ফলা পিছলে বাঁ হাতের আঙুল ছড়ে গেল। পরে ছেনীর ফলা ঠিক পাথরের উপর পড়ে কাটছে কিনা লক্ষ্য করতে গিয়ে হাতের উপর হাতুড়ি বসিয়ে দিয়ে দিলাম।

রক্তাক্ত ও জখম হাতে ফুঁ দিয়ে যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করছি দেখে জিওভানেল্লি জমি থেকে এক মুঠো পাথরের গুঁড়ো নিয়ে হাতের ক্ষতের উপর ঢেলে এবং ঘসে তার উপর ছুটো চাপড় দিয়ে বললেন 'বাস্, ঠিক হয়ে গেছে আর রক্ত পড়বে না, এইবার কাজ করে যাও।'

পাছে যন্ত্রণা পাচ্ছি জানালে আমাকে এ কাজে অনুপযুক্ত বলে তাড়িয়ে দেন তার ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহন শক্তিকে যতদূর সম্ভব একত্র করে ফের শুরু করলাম হাত, হাতুড়ি, ছেনী ও পাথরের ঠোকাঠুকি।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় দরজায় টোকা পড়তে প্রফেসর বললেন 'আঁত্রে'। 'বঁজুর' বলে দরজা ঠেলে লম্বা ফরাসী রুটির লাঠিভরা ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে প্রবেশ করল এক প্রৌঢ়া। 'বঁজুর মারি' বলে জিওভানেল্লি তার পশ্চাতদেশে চিমৃটি দিয়ে তার হাত থেকে একটি রুটির লাঠি তুলে নিলেন।

মহিলাটি, 'ওঃ মঁ্যাসিয় তুমি ভারি দুষ্টু'—বলে কপট ভৎর্সনার একটা অভিনয় করে হেসে চলে গেল।

আমি প্রফেসরের এই ইতরজনোচিত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তিনি যেন আমার মনের কথা জেনে বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে আমি একটা গর্হিত কাজ করেছি। বিচলিত হয়ো না। এ পাড়ার সকল শিল্পী ও কারিগরদের রুটি সরবরাহ করে মারি এবং ও মুখে যতই আমাদের এই ব্যবহারে আপত্তির ভাণ করুক সকলেই জানে যে ওকে কেউ চিমটি না দিলে তার ভাগ্যে তাজা ও মচমচে রুটি মিলবে না।'

প্রথমে এই ব্যাপার যেন একটা নিকৃষ্ট রকমের রহস্য মনে হোত কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে এই আপাত অশিষ্টাচারের অন্তরালে কোন নোংরামি লুকান ছিল না। এ কেবল এই কারিগর পল্লীর খেলার ছলে শিশুসুলভ মারির প্রতি স্নেহের এক সরল অভিব্যক্তি মাত্র।

ঠিক বারোটা বাজলে যার আতলিয়ে ছিল রু দিদব সদব রাস্তার মোড়ে সে সামনে বাজারের টাওয়ার-এর ঘড়ি দেখে তার পড়শীর দেওয়ালে টোকা দিয়ে বলত, 'ইল্ এ মিদি'—অর্থাৎ এখন বারোটা বেজেছে। অপরজন আবার তার পড়শীর দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে সময় জানিয়ে দিত। এমনিভাবে গলির শেষ প্রান্তে আতলিয়েতে বারোটা বাজার খবর চলে যেত যদিও সেখানে পৌঁছাতে সময়ের কাঁটা ঘুরে যেত আরো বেশ কয়েক মিনিট। তারপর শিল্পী কারিগররা যে যার কামরায় হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে কেউ কেউ বা ময়লা হাত সাফ করার ভনিতা করে বসে যেত মধ্যাহ্ন-ভোজনে।

এক ডেলা কড়া চীজ-এ কামড় দিয়ে মচ্‌মচে রুটির দু এক টুকরো মুখগহ্বরে ফেলে বোতল থেকে লালমদিরার এক ঢোকের সমন্বয়ে তারা পৌঁছে দিত খাদ্যকে গন্তব্য স্থানে।

আহারান্তে গা এলিয়ে দিয়ে আরম্ভ হোত গল্পসল্প ও ধূমপান। এ পাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই ছিল ইতালিয়ান এবং এদের গল্পের

বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন প্রতিদিন মুসোলিনিকে অন্তত একবার জাহান্নামে পাঠিয়ে তাঁর মুণ্ডপাত না করলে তাদের মধ্যাহ্ন-ভোজন ঠিক পরিপাক হোত না।

দুটো বাজলেই আবার দেওয়ালে সঙ্কেত ধ্বনি বেজে উঠত এবং তাদের আয়াসে এলান দেহ কিসের ছোঁয়ায় যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠত এবং এসে যেত কর্মের ব্যস্ততা ও তৎপরতা।

এমনি করেই পাঁচটা বাজলে সেদিনের মত কাজ শেষ হয়ে যেত ওভারঅল খুলে শার্টের আস্তিন নামিয়ে মুখ হাত ধুয়ে মুছে, টাই লাগিয়ে কোট চাপিয়ে যে যার বাড়ির দিকে ধাবমান হত।

কয়েক মাস পরে একদিন মারি এল কান্নাভরা মুখ নিয়ে। জানাল, সে আর রুটি সরবরাহ করবে না কারণ সে চলে যাচ্ছে মিদিতে (দক্ষিণ ফ্রান্সে) তাঁর এক ভাইঝির কাছে। সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে সে হয়েছে একটি বড় ক্যাফের অধিকারাণী এবং তার পক্ষে একা ব্যবসা চালান সম্ভব হবে না বলে সে অনুরোধ করেছে মারিকে সেখানে যেতে এবং আমৃত্যু তার কাছে থেকে তাকে ব্যবসায়ে সাহায্য করতে। কোন বিস্মৃতির সীমানা থেকে হঠাৎ এই রক্তের-টানে-আহ্বান মারিকে ব্যাকুল করেছে তার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায়।

রু দিদর শিল্পী ও কারিগররা সকলে চাঁদা তুলে মারিকে একটা ভাল গরম কোট বিদায়-স্মৃতি হিসাবে উপহার দিল।

সেটা নিয়ে সে হেসে বলল 'মিদিতে তো শীতে প্যারীর মত ঠাণ্ডা পড়ে না। তবুও এটা পরব এবং তোমাদের স্নেহের কথা মনে করে 'বঁ দিয়ো'-র কাছে প্রার্থনা জানাব যে, তিনি যেন তোমাদের সর্বদা নিরাপদে ও গরমে সুস্থ রাখেন।'

তারপর সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে। আপন ভাইঝির টানের জোর বেশী হলেও রু দিদর এতগুলি স্নেহভরা হৃদয়ের বন্ধনকে ছিন্ন করার সঙ্কল্পে মারিকে মনের সঙ্গে অনেক ব্যাথার লড়াই করতে হয়েছিল।

পাড়ার বাসিন্দারা একে একে তার অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বনে বিদায় সম্ভাষণ জানাল এবং তাদের অনেকেরই চোখ শুকনো ছিল না। তারপর সকলের কণ্ঠে এক কোরাস্ বেজে উঠল—বিদায় মারি—আদিয়ো।

পরের দিন রুটি দিয়ে গেল এক বৃদ্ধ।

বারোটার মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে জিওভানেল্লি রুটিতে দু এক কামড় দিয়ে চিবিয়ে থু থু করে ফেলে বললেন 'কি অখাদ্য রুটি দিয়েছে বুড়োটা।'

রুটি আসলে মোটেই খারাপ ছিল না কেবল মারির হাতের স্পর্শ পাই নি বলে সে রুটির স্বাদে প্রফেসর সুখ পান নি। সেদিন রু দিদর শিল্পী-পাড়ায় অনেকেরই মধ্যাহ্ন-ভোজন গলধঃকরণ করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

জিউসেপি

প্রফেসর জিওভানেল্লির আতলিয়েতে নিয়মিত খোশগল্প করতে আগত পড়শীদের মধ্যে বৃদ্ধ জিউসেপির উপস্থিতি ছিল প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার।

সকাল কি দুপুর বা অপরাহ্নে কিছু একটা জানবার কি বলবার অজুহাতে তিনি পাঁচ মিনিট বসব বলে সারা বেলাটা ওইখানেই কাটিয়ে দিতেন। অন্য কেউ হলে এই বসে বিনা কাজে বকবকানির জন্য জিওভানেল্লির কাছে তাড়া খেয়ে আপন পথ দেখত। বৃদ্ধ জিউসেপির কিন্তু ছিল সাতখুন মাপ। মাঝে মাঝে যদিও তার বিরাম-বিহীন এক-ঘেঁয়ে বাক্যধারায় আমাদের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ধ্বসে যাবার মত হোত প্রফেসর তাঁর বিরক্তির আভাস পর্যন্ত মুখে প্রকাশ করতেন না পাছে বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে মনে আঘাত পায়।

জিউসেপি আতলিয়েতে সকালে এলে প্রফেসারকে 'বঁz র ম্রোন্ ওম' ও আমায় 'বঁz্র মনাফাঁ'—বলে ভদ্রসম্ভাষণ জানাতেন।

যে কোন কারণে জিওভানেল্লি তাঁর কাছে যুবক প্রতিপন্ন হলেও আমি কি কারণে শিশুর পর্যায়ে পড়লাম তা বুঝতে না পারায় একদিন তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলাম।

আমি জানতাম না যে এই বৃদ্ধের অবর্তমানে লোকে তাঁর সম্বন্ধে যে আলোচনা করুক সামনাসামনি তাঁকে প্রশ্ন করবার মত সাহস অনেকেরই ছিল না।

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে থেকে পরে বেশ রুক্ষস্বরে বললেন 'তোমার বয়েস কত হবে হে ছোকরা!'

বললাম, 'তেইশ বছর পার হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছি এবং সেটা কি শিশুর বয়েস?'

তিনি বললেন, 'তোমার প্রফেসরের বয়েস হচ্ছে ছাপান্ন আর আমি চুরাশিটা শীত কাটিয়ে দিয়েছি কাজেই হিসাব করে নাও তোমার শিক্ষককে যুবক ও তোমাকে শিশু বলার অধিকার আমার আছে কিনা।'

বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। প্রায় সাড়ে ছ ফুট দীর্ঘ ও মেদবাহুল্যবিহীন তাঁর দেহযষ্টীতে দাঁড়ান অবস্থায় মাথা থেকে পায়ের গোড়ালির উপর প্লাম লাইন ফেললে বার্দ্ধক্যের বক্রতার আভাস পর্যন্ত দেখা যেত না। ইস্পাতের মত দৃঢ় তাঁর মাংসপেশীগুলি যেন সর্বদা দমে পাক দেওয়া স্প্রীং-এর মত সক্রিয় দেখাত। চুরাশী শীতের ছাপ ছিল কেবল তাঁর চুপ্‌সে পড়া মুখে শত সহস্র কুঞ্চন ও রেখায়। জিউসেপি হাসলে সেগুলি আরো উঁচুনীচু হয়ে লাঙ্গলচষা ক্ষেতের মত দেখাত।

রু দিদর পাড়ায় প্রায় সব প্রস্তর-শিল্পীদের আদিবাস ছিল ইতালির মর্মর-প্রস্তর-প্রধান করারার শহরে বা পল্লীতে। তাদের মধ্যে সক্ষম

অবস্থায় জিউসেপি ছিলেন সেরা কারিগর। পঞ্চাশ বছর আগে প্যারীতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাজে মন প্রাণ ঢেলে তিনি ভুলতে চেষ্টা করতেন বিয়োগের এই মর্মান্তিক দুঃখ শোককে। জিউসেপি ও তাঁর স্ত্রীর প্রণয় শুরু হয়েছিল কৈশোর থেকে এবং পত্নীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের এই প্রেমের জোয়ারে কোনদিন একটুকুও ভাঁটা পড়ে নি।

বিপত্নীকে বৃদ্ধ এখনও জাগিয়ে রেখেছেন সেই প্রেমের স্মৃতিকে সমান ভাবে।

জিওভানেল্লির কাছে শুনলাম যে জিউসেপির ঘরে এখনও তাঁর স্ত্রীর সাজ পোশাক, আসবাবপত্র পরিপাটিভাবে সাজান আছে। তাঁর বন্ধু বান্ধবরা বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি পুনর্বিবাহ করেন। জিউসেপির বাইরেটা রুক্ষ বিরস দেখালেও তাঁর অন্তরটা ছিল দয়া মায়া আর স্নেহের রসে কানায় কানায় পূর্ণ। তাঁর দীর্ঘ সবল ও সক্ষম শরীরে বাহ্যত কোন ভাঙনের চিহ্ন না দেখা গেলেও ভিতরটা সেইম সুস্থ ছিল না। দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত পাথরের মিহিগুঁড়ো নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে পলি ফেলতে ফেলতে সেটাকে জমাট করে প্রায় নিরেট করে দিয়েছে। তাই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে এখন পাথর কাটা ছাড়তে হয়েছে।

চিকিৎসকদের ভ্রমই তাঁর স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর কারণ এই ধারণা হওয়ায় ফরাসী ডাক্তাদের প্রতি জিউসেপির প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল। তাই প্রথমে তাদের বলা কাজ বন্ধ করার নির্দেশকে তিনি গ্রাহ্য না করলেও পরে স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট ও মুখে রক্ত ওঠায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পাথর কাটা থেকে অবসর নিতে হয়েছে।

তাঁর এই অক্ষমতাকে ভুলবার চেষ্টায় বোধ হয় তিনি এত ঘন ঘন আসতেন জিওভানেল্লির কর্ম্মশালায়।

এই সময়ে নিউইয়র্ক থেকে কোন এক অর্থপ্রতিষ্ঠালব্ধ শিল্পী

প্রফেসর জিওভানেল্লিকে প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাস্টারের ছোট মূর্তিকে পাথরে ছ গুণ বড় করে নকল করার বায়না দিয়েছিল।

মূর্তিটি ছিল তারায়-ভরা কাপড়ের উপর শয়ান একটি নগ্না নারী এবং এর নাম লেখা ছিল 'রজনী' বলে। মূর্তিটি পাথরে শেষ হলে নিউইয়র্কের কোন পার্কে শায়িতা থেকে দর্শকদের দৃষ্টি ও মনকে রঞ্জন করবে এই ব্যবস্থা ঠিক ছিল।

জিওভানেল্লি ও তাঁর এক সহকর্মী তিন সেট ক্যালিপার্‌স্ নিয়ে এক বিরাট বোর্ডের উপর মূর্তিটির মাপের ছ গুণ বড় ঘনত্বের পরিমাপকারি এক ত্রিভুজ এঁকে তার সাহায্যে মাপজোপ করে পাথরখণ্ডের উপর আক্রমণ শুরু করে দিলেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক মূর্তির ঘন পরিমাপে ঠিক বহুগুণ বড় বা ছোট মূর্তি নির্মাণ করার পন্থা কবে থেকে ইতালিতে প্রচলিত হয়েছিল বলা শক্ত। দোনাতেল্লো, ঘিবারতি, ও মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ ভাস্কররথারা এইভাবেই পাথর কেটে তাঁদের বিরাট মূর্তির পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানের অগ্রসরে আজ বহুবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবন অতীতের মানুষের বহু পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলিকে সহজ করে তার কর্ম-ক্ষমতার পরিসরকে বিরাট করে তুলেছে। কিন্তু চিত্রণ ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আজও রয়ে গেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত সেই তুলি, রঙ, ছেনী আর হাতুড়ী এবং তাদের সেই একই প্রয়োগ প্রণালী।

মূর্তিটি পাথরে বড় করে নকল করবার সময় জিওভানেল্লি তার গঠনে বহুবিধ ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে তার নবরূপ দিলেন।

তার এই উন্নততর নবরূপান্তর দেখে প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পাথরে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হলে এর স্রষ্টা হিসাবে কার নাম লিখে দেওয়া উচিত?'

তিনি বললেন, 'জান হে, এই শিল্পীর নামটা পর্যন্ত আমাকে পাথরে কেটে লিখে দিতে হবে কারণ তিনি জীবনে কোন দিন ছেনীতে হাত দেন নি।'

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু পার্কে স্মৃতিসৌধে ও শিল্পসংগ্রহশালায় বহু পাথরের মূর্তি নকল ভাস্করের নাম ও যশকে ঘোষণা করছে কিন্তু সেগুলির আসল স্রষ্টারা রুদিদর গরীব ভাস্করদের মত অজ্ঞাত ও অখ্যাত রয়ে গেছে।

যেমন সাহিত্য ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে খেয়ালী ধনীরা কেউ কেউ কুশলী দরিদ্র লেখক ও সুরকারের সাহিত্য ও সুরসৃষ্টিকে অর্থের বিনিময়ে নিয়ে আপন রচনা বলে নাম জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন এবং করে থাকেন, শিল্পের ক্ষেত্রেও চলে এই নীচ প্রতারণা।

রুদিদয় তখন বিদ্যার শিক্ষানবিশি করবার সময় ভাবতে পারি নি যে একদিন অভাবের তাড়নায় আমায়ও নিজের কয়েকটি রচনাকে অপরের নাম এবং খ্যাতির খাতায় সঁপে দিতে হবে।

প্রফেসর জিওভানেল্লি মূর্তিটি কাটতে কাটতে একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খানিকটা বাড়তি পাথর থাকায় তার চারপাশে ছোট ছোট গর্ত কেটে তার মধ্যে সূচ্যগ্র ছোট সাইজের ছেনী কতকগুলি বসিয়ে ক্রমান্বয়ে হাতুড়ির ঘা দিতে দিতে সেটাকে পরিস্কার সমান লাইনে খসিয়ে ফেললেন। সেই দানাবাঁধা কারারা খনির পাথরখণ্ডকে পাঁশের গাদায় আবর্জনা হিসাবে ফেলে দিতে মন চাইল না। কিন্তু তার পাশের পরিসর এমন ছিল না যাতে পুরোপুরি নিরেট একটা কোন মূর্তি কাটা যেত।

এই আতলিয়ের দেওয়ালের চারদিকে লটকান ছিল মানুষের হাত, পা, মুখ, ও শরীরের নানা ভঙ্গিতে ছাঁচে-তোলা প্লাস্টার কাস্ট্। এ ছাড়া বহু বিখ্যাত ভাস্করের গড়া মূর্তির প্লাস্টারের প্রতিরূপের কিছু কিছু টুকরোও এখানে ওখানে লাগান ছিল।

আমার সামনে ছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর 'কারপো'র করা পারীর অপেরাগৃহ অলঙ্কৃত লা দাঁস-এর উদ্দাম নৃত্যকারী মূর্তিগুলির একটির হাসিভরা মুখ। আমি সেই বরানন বাতিলকরা পাথরের টুকরোটা কেটে রূপ দেবার আয়োজন করে ফেললাম।

জিওভানেল্লি আমার তোড়জোড় দেখে কাজ থামিয়ে কিছু একটা মন্তব্য করবার উদ্যোগী হয়ে শেষে কিছু না বলে কেবল ইঙ্গিতপূর্ণ একটা মাথার দোলানি দিলেন অর্থাৎ তাঁর কাছে আমার এই প্রচেষ্টা যেন একটা নিছক পাগলামি।

এই সময়ে বৃদ্ধ জিউসেপি এসে আমার মার্বল কাটার ব্যবস্থা দেখে বললেন, 'ভিক্তর, (জিওভানেল্লি) তোমার এই দিয়াবল্ ছাত্রটি দেখছি কারপোর নর্তকীর মুখের হাসি কেড়ে নেবার মতলবে আছে।'

তারপর আমাকে শাসিয়ে বললেন, 'এটাকে কিন্তু এক সপ্তাহে শেষ করতে হবে এবং তা যদি না কর তা হলে আমি এটাকে ভেঙে ফেলে দেব আর সেই সঙ্গে তোমার মাথায়ও তু'ঘা বসিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারব না। আমার যারা ছাত্র ছিল তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। ভিক্তর নিজে কাজ করে ভাল কিন্তু কি করে ছাত্র তৈরী করতে হয় তা জানে না।'

মনে মনে বললাম, 'আমার বহু সৌভাগ্য যে আপনার ছাত্র হওয়ার যোগাযোগ ঘটে নি।'

ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় আমার প্রতি কিছুটা প্রসন্ন ছিলেন কারণ দিন ছয়েকের মধ্যে মুখটি পাথরে নকল করা শেষ হয়ে গেল।

জিওভানেল্লির প্রশংসার প্রত্যাশী হয়ে যখন পরদিন আতলিয়েতে ঢুকছি বঁzুর-এর প্রত্যাভিবাদন স্বরূপে পেলাম এক প্রচণ্ড ধমক। প্রাচীন শৈলীপন্থী ইতালিয় ভাস্কররা মূর্তির দন্তবিস্ফারিত হাসিমুখে প্রত্যেকটি দাঁত আলাদা করে কাটেন না, কেবল দন্তপঙক্তির স্থান সমান নিরেট কেটে দেন। আমি এ রীতি জানতাম না এবং আরো আমার জানা ছিল না যে জিওভানেল্লি ছিলেন উৎকট রকমের প্রাচীনপন্থী। কাজেই এই মুখটিতে প্রত্যেকটি দাঁতের আকৃতিকে সুস্পষ্ট করে দেখানর ফলে সকালেই তাঁর এই আকস্মিক ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধির প্রকোপ।

এই অশুভক্ষণে জিউসেপির আবির্ভাবে ভাবলাম এতক্ষণ হিটলার-

এর হুমকি হচ্ছিল এইবার হিমলার-এর হামলা হবে অতএব তাঁর আগে চম্পটের ব্যবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু সুযোগ করে নেওয়ার আগেই তাঁর লম্বা পেশীবহুল হাত আমার কাঁধ বজ্রমুষ্টিতে ধরে এক নাড়া দিতেই বুঝলাম পরিত্রাণের চেষ্টা করা বৃথা।

তিনি অধ্যাপককে বললেন, 'কি ব্যাপার, এত চোখমুখ লাল করে চেঁচাচ্ছো কেন, বাড়িতে কি আজ সকালে ঝগড়া করে বেরিয়েছ ?'

তাঁর রাগের কারণ শুনে বৃদ্ধ বললেন, 'মুর্তির দাঁত দেখিয়েছে তো কি এমন গস্‌পেল্ অশুদ্ধ হল। ওকে আগে জানাও নি কেন, ওর কি করা উচিত ছিল। মাইকেল এঞ্জেলোর পথ না ধরে ও যদি বার্নিণির পথে চলতে চায় তো তোমার রুচির গণ্ডি দিয়ে তুমি ওকে রুখতে পারবে কি ? কিন্তু সে হবে পরের কথা, এখন অন্তত ভালভাবে পাথর কাটতে শিখুক।'

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি আজ জিউসেপির এই মধুর রূপান্তরের কারণ কি। কিন্তু এই অবাক কাণ্ড ওইতেই শেষ হল না।

তিনি বললেন, 'তুমি আমার কথা রেখেছ এর জন্য তোমার বড় ইনাম পাওয়া উচিত। অপেক্ষা কর আমি এখুনি আমার বাড়ি হয়ে আসছি।'

অপস্রিয়মান বৃদ্ধের অভিমুখে জিওভানেল্লিও কিছুটা হতবাক হয়ে দেখে বললেন, 'জিউসেপি তোমার জন্যে কি ইনাম আনছে জানি না তবে তোমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার তার প্রশংসা ও স্নেহ অর্জ্জন। এই বৃদ্ধকে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাউকে নরম করে সম্বোধন পর্যন্ত করতে শুনি নি।'

কিছুক্ষণ পরে কাঠের একটি হাতবাক্স নিয়ে জিউসেপি ফিরে এলেন এবং সেটিকে আমায় দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমায় ইনাম। এই বাক্সর মধ্যে পাবে আমার সারাজীবনের কর্মের সহচরগুলি। ভাস্কর্যের প্রতি এবং আমার প্রতি যদি তোমার কিছু শ্রদ্ধা থাকে

তা হলে তারই স্মরণে এগুলিকে অবহেলা করো না, এদের উজ্জ্বল, মসৃণ ও সক্রিয় রেখ এই আমার অনুরোধ।'

বাক্সটি খুলে দেখলাম, বিভিন্ন আকারের ফলাযুক্ত নানান রকমের বহু ছেনী এবং পাথর কাটার দু'টি ভারী হাতুড়ি।

বললাম, 'এগুলি নিশ্চয়ই আপনার আপন কাজের যন্ত্রপাতি, আমাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে দিচ্ছেন কেন!'

তাঁর অলক্ষে জিওভানেল্লি ঘন ঘন অঙ্গভঙ্গি করে ইঙ্গিত করছিলেন যাতে আর বাক্যব্যয় না করে বাক্সটি নিয়ে ফেলি।

আমি মুর্খের মত প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম তিনি যেন এই ছেনীগুলি ও হাতুড়ির দামের অন্তত কিছুটা আমাকে দিতে দেন।

প্রফেসর ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন, 'আর কতক্ষণ ভনিতা করে ক্লান্ত জিউসেপিকে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তোমার মাথায় কি এখনও চেতনা হয় নি যে এই অমূল্য উপহার খুব অল্পলোকের জীবনে মিলে থাকে।'

বাক্সটি নিয়ে বললাম, 'সিনর জিউসেপি, আপনার এই মহান দানে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত। তাকে ভাষায় কেবল ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ব্যক্ত করার বৃথা প্রয়াস করবো না। আপনার আশীর্বাদে একদিন যেন এই সম্মানের যোগ্য অধিকারী হতে পারি।'

এই বাক্সে কেবল জিউসেপির নিজের ব্যবহৃত ছেনী ছিল না তাঁর পিতা ও পিতামহেরও ব্যবহার করা জিনিষও ছিল। বংশ পরম্পরায় এই পরিবার কত শতাব্দি ধরে ধারাবাহিক ভাবে পাথরে মূর্তি গড়ে এসেছে। আজ নিঃসন্তান জিউসেপির জীবনে সেই ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম যে এই দানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কতখানি পুঞ্জিভূত আফসোস।

তিনি চলে গেলে প্রফেসার বললেন, 'তুমি যদি ইচ্ছে কর তা হলে জিউসেপির চিকিৎসার খরচের জন্য কিছু অর্থ আমার হাতে দিও কারণ ওর তো আর কোন সঙ্গতি নেই। আমরাই চাঁদা করে মাঝে

মাঝে ওর চিকিৎসার খরচের ব্যবস্থা করি, তাও ওকে না জানিয়ে, পাছে ওর মনে আঘাত লাগে এই ভেবে যে আমরা ওকে দয়া দেখাচ্ছি।'

দু' একদিন পরে জিউসেপি এসে বললেন, 'জান হে, আজকাল পৃথিবীতে বেশ কিছু আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কাল এক ফরাসী ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল।

'তাকে যখন বললাম, আমি তোমায় ডাকি নি এবং তোমায় ফি দেবার মত আমার সামর্থ নেই আর থাকলেও দিতাম না কারণ ফরাসী ডাক্তারদের অজ্ঞতার ফলে আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। আবার তোমাদের আমার প্রতি সেই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে দেবার কোন ইচ্ছে নেই।

'সে উত্তর দিল যে, আমার অসুস্থতার সংবাদ লোকের কাছে শুনে নিজে থেকেই সে এসেছে এবং আমার মত ভাস্করের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাওয়াটাই তার সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক, তার অন্য কোন ফি-র প্রয়োজন নেই।

'যে জাতের লোকেরা অর্থের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র দেখা যায় তাদেরই একজনের মুখ থেকে এই উক্তি বেশ কিছু বেখাপ্পা শোনাল।'

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জান হে ছোকরা, ফরাসীরা দানের অর্থ বোঝে না। এদের কেউ যদি কিছু এমনি উপহার দেবার চেষ্টা করে তো তার পিছনে কোন ফন্দি আছে ভেবে এরা সহজে গ্রহণ করবে না। তুমি পারমান্তিয়ে-এর গল্প শুনেছ?'

না, বলায় বললেন, 'ফরাসী মেন্যুর অমলেত্ পারমান্তিয়ে নিশ্চয়ই খেয়েছ। এই অমলেত্-এ ভাজা আলু থাকায় তাঁর নামকে উল্লেখ করা হয় কারণ ব্রেজিল থেকে ফরাসীদেশে আলু নিয়ে আসেন প্রথমে এক মঁ্যসিয়ো পারমান্তিয়ে। বহুদিন বিদেশে থাকায় তিনি তাঁর স্বজাতির স্বভাবধর্মকে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই দেশে ফিরে তিনি

সকলকে ডেকে আলু বিতরণ শুরু করে দিলেন যাতে তারা খেয়ে জানতে পারে এর মুখরোচক আস্বাদকে। কিন্তু তাদের কেউই এই যেচে দেওয়া জিনিষকে নিতে প্রস্তুত হল না। সহসা মঁ্যসিয়ো পার্মান্তিয়ে-এর মনে পড়ে গেল কি উপায়ে তাঁর দেশবাসীকে আলুর আস্বাদের বশবর্তী করা যায়। তিনি আলুগুলি নিজের বাগানে পুঁতে চারিদিক তারের জালের বেড়া তুলে নোটিস টাঙিয়ে দিলেন 'বাগানে প্রবেশ নিষেধ। মূল্যবান শব্জী বপন করা হয়েছে।' সেইদিন রাত্রে তাঁর বাগান লুঠ হয়ে সমস্ত আলু চুরি হয়ে গেল। তার পর থেকে ফরাসী জাত আলু খেতে অভ্যস্ত হয়েছে।'

আমরা হেসে উঠলাম শুধু তাঁর রহস্যে নয় জিওভানেল্লির নির্দেশমত চিকিৎসকের নিপুণ অভিনয়ে এবং এর জন্যে তাঁর বরাদ্দ চিকিৎসার পারিশ্রমিক ছাড়া তাঁকে আলাদা আর কোন ফি দিতে হয় নি।

স্মারা

এক শুক্রবারে আতলিয়েতে পৌঁছতে জিওভানেল্লি আমায় দেখেই রোসিনির বারবার্ অফ্ সেভিল্-এর এক আরিয়া ভাঁজতে শুরু করে দিলেন।

বললাম, প্রফেসর-এর আজ দেখছি যে ভারি মেজাজ খুশ্।

তিনি গান থামিয়ে খুব ভাল ভাবে হাত সাফ করার ভনিতা করে পকেট থেকে বের করলেন একটি ভিসিটিং কার্ড। সেটিকে অতি সন্তর্পনে দু আঙুলে ধরে নাকের কাছে নিয়ে একটা আঘ্রানের লম্বা টান দিলেন, যেন কত আতরের সুগন্ধ কার্ড থেকে বেরিয়ে তাঁর নাসারন্ধ্রে সুবাসের সুখানুভূতিতে ভরে দিল। এত অভিনয়ের কারণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল যে মিস্ হিটন তাঁর কার্ডের পিছনে

পরের দিন আমাকে তাঁর আতলিয়েতে চায়ে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রুদে প্লাঁত রাস্তার দু ধারে অনেকগুলি ইমারত যে গুলিতে কেবল শিল্পীদের জন্য তৈরী আতলিয়ে ফ্লাট ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা নেই। সঙ্গতিসম্পন্ন শিল্পী বা শিল্পীর পেশার ভানকারি ধনীদের আবাস এগুলি।

প্রত্যেকটি ফ্লাট-এ একটি ছাদ-উঁচু আতলিয়ে কামরা যার বাইরে-মুখকরা দেওয়ালে আছে বারো কি চোদ্দ ফুট লম্বা-চওড়া কাচের জানলা। এরই মাঝখানে আবার ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো যার সামনে ঝোলা বারান্দায় গেলে প্লেন্‌ গাছে ভরা রাস্তার মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় নকশাদার লেস্‌-এর মত জালি-পর্দায় ঢাকা জানলা দিয়ে জৌলুষ নিঙড়ে ফেলা দিনের আলো ঘোলা হয়ে ভিতরে আসে কিন্তু বাইরে থেকে অন্দরের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না অথচ কামরার ভিতর থেকে বাইরের দৃশ্য বেশ পরিস্কার দেখা চলে। রাত্রে আলো জ্বাললে দিনের বেলায় ঢাকা আব্রু জালি-পর্দায় আর রক্ষা হয় না বলে ভারি ভেল্‌ভেটের মোটা পর্দা টেনে দেবার ব্যবস্থা আছে।

জানলার উল্টো দিকের দেওয়ালের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি, ছাদ আর মেঝের মাঝ বরাবর খানিকটা ঢাকা ছাদের উপর গ্যালারি পর্যন্ত। এই গ্যালারির একটা অংশে বাথরুম ও রান্নার ঘর এবং অপরদিকে শোবার ঘর আর মাঝখানের অংশে বসবার ঘরের কাজ সারা যায়।

ধনীনন্দিনী মিস্‌ হিটন-এর আতলিয়েতে পৌঁছে দেখি চায়ের রীতিমত আয়োজন হয়েছে।

কাচে ঢাকা গোল টেবিলের উপর ফরাসী পেষ্ট্রি ও মিঠাই ভরা প্লেটগুলি ফুলের তোড়ার মত শোভা পাচ্ছিল।

তাঁর অতিথিদের মধ্যে আমি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হিটলার-পীড়িত প্রাচ্য ইউরোপীয় একদেশের ডাঃ লিট্‌না ও তাঁর ইংরাজ স্ত্রী, মাদাম মিউভিল এবং এক চৈনিক অধ্যাপক। ফ্যাসিষ্ট বিরোধী ডাঃ লিট্‌না

দেশত্যাগী এবং তাঁর কথার বিষয়বস্তুতে সর্বদা পলিটিক্স্‌-এর ঝাঁজ ঘুরে ফিরে আসছিল।

চীনা অধ্যাপক নির্বিকার শ্রোতা হয়ে তাঁর সদা প্রসন্নমুখে মাঝে মাঝে হাসির চিড় খাইয়ে দেখাচ্ছিলেন যে তিনি আমাদের সব কথা মন দিয়ে শুনছেন কিন্তু তিনি যাবার আগে বিদায় সম্ভাষণ ছাড়া আর একবারও কথা বলেন নি!

ডাঃ লিটুনা প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস কর যে গান্ধীর অহিংস পন্থায় তোমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?'

বললাম, 'বিশ্বাস না করলে এত শত সহস্র ভারতবাসী তাঁর কথা মত আন্দোলন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ ও উৎপীড়ন সহ্য করছে কেন?'

তিনি শুনে একটি বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, 'অহিংস আন্দোলনে ইংরেজের বিরাট সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তোমরা যদি স্বাধীনতা সত্যি পেতে চাও তা হলে, হয় ইংরাজ-বিরোধী অন্য সামরিক শক্তিময় জাতির সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করে ওদের হটাবার ব্যবস্থা করা উচিত অথবা গোপনে হালকা অথচ ফলদায়ক এমন আধুনিক আয়ুধ অন্যদেশ থেকে সরবরাহ করে দেশের লোককে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী করে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করতে হবে।'

উত্তর দিলাম, 'মহাশয়, আপনার দেশের হিটলার-এর পদলেহী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে এই পন্থায় হটবার ব্যবস্থা করেছেন বুঝি? কিন্তু ফ্যাসিসম তো কেবল অস্ত্রবলে বলীয়ান একটা সামরিক শক্তি নয়, এটা তার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার একটা অঙ্গ মাত্র। ফ্যাসিসম-এর অভিব্যক্তি হয়েছে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারায় যার অবলম্বনে ও বিশ্বাসে জন্মেছে এই শক্তি। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ঐকান্তিক ধারনা থেকে যে শক্তি জন্মগ্রহণ করবে তাকে কামান বন্দুক দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না। জানেন কি গান্ধীজিকে একবার গ্রেপ্তার করলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা শরীরকে কারারুদ্ধ করছো কিন্তু আমার দেশ-

স্বাধীনতার চিন্তাকে তোমরা কোনদিন বন্দী করতে সক্ষম হবে না।' যখন ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রথম বিরাট রোমক সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ধর্মের গভীর বিশ্বাস ছাড়া তাদের আর কোন অস্ত্র ছিল না। সে সময় আমার মনে হয় আপনার মত অনেকে নিশ্চয়ই ওই পাশবিক শক্তিকে অজেয় মনে করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে তার প্রকোপে ক্রিশ্চিযানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দাসত্বের মুক্তিকামী স্পার্টাকাস রোমক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে যদি অহিংস পন্থায় বিবোধিতা করতো তা হলে তার আত্মত্যাগে যে শক্তির সঞ্চার হোত তাকে সহজে রুদ্ধ ও বিনষ্ট করবার মত সামর্থ তদানিন্তন রোমক সামরিক শক্তি বলে বজায় থাকত কিনা সন্দেহ।'

তিনি বললেন, 'হিংসা বা অহিংসা পন্থাই হোক রোমক শক্তির বিরুদ্ধাচরণে স্পার্টাকাস এবং তাব অনুচরবর্গ একবার কেন দশবাব ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাত।'

বললাম, 'না মহাশয়, ফল কিছুটা তফাৎ হোত। অহিংসভাবে আন্দোলন করে স্পার্টাকাস বিফল হলেও ইতিহাস তাকে আজ বলত মাব্টাব্ এবং যুগযুগ ধরে সে মানবধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে পেত সম্মান ও সহানুভূতি। কিন্তু জিঘাংসার পথ নিয়ে মুক্তিকামী স্পার্টাকাসের মৃত্যু ইতিহাসের পাতায় একটা সামান্য বিদ্রোহ-দলন মাত্র।'

লিট্নাপত্নী অন্য মন্তব্য করে আমাদেব তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর মতে আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ জাত। 'ইংরাজ অসভ্য ও অনুন্নত ভারতবাসীদের উপকারার্থে শহর, রাজপথ, সেতু, রেলপথ বড় বড় ইমারত ইত্যাদি নির্মাণ করেছে এবং আমাদের সভ্য করার চেষ্টা করেছে। আমরা তাদের অনুগত থেকে এই উপকারের সুযোগ না নিয়ে অকৃতজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে আন্দোলন করছি এবং এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে। আমাদের না আছে আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার সৎসাহস, সামর্থ ও আশয়। রক্ষক ইংরাজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলে নৃশংস কমুনিস্ট রাশিয়ানরা এদেশ অধিকার

করে ভারতবাসীকে তাদের দাস বানিয়ে উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেবে। আমরা সেকথা একবার ভাবলে এমন মতিচ্ছন্ন হতাম না।'

মাদাম লিট্নাকে এর সঠিক জবাব দিলে জানতাম যে সেখানে বসে চা খাওয়া আর সম্ভব হোত না এবং মিস হিটনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

দুঃখের বিষয় যে, এই ভ্রান্ত ধারণা কেবল লিট্নাপত্নীর একার নয় আজও সারা ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ লোকে এই একই ভাবে চিন্তা করে এবং ভারত সম্বন্ধে অবিচার করে। দুই শতাব্দীর রাষ্ট্রিয় সান্নিধ্য সত্ত্বেও ব্রিটেন আপনার সাম্রাজ্য শাসন পদ্ধতির সাফাই গাইবার একটা কপট অভিমতকে আপন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অভিসন্ধিতে ভারতীয় জন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে কত মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে এবং সেই ভুল ধারণা ব্রিটিশ জনগণের মনে এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে।

নিজেকে সংযত না করতে পেরে বললাম, 'মাদাম, কেবল কিংবদন্তির উপর বিশ্বাস করে আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে এতগুলি কটূক্তি না করে যদি সত্য জানতে ইতিহাসে একটু চোখ ফেলে দেখতেন তা হলে আপনার উপলব্ধি হোত যে আমাদের উপকারার্থে বৃটিশ সরকার রাজপথ, রেলপথ, সেতু, ইমারত ইত্যাদির কোনটাই তৈরী করেন নি। এগুলি করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে অনায়াসলভ্য মোটা রেভিনিউর লোলুপতায় নামমাত্র পারিশ্রমিকজীবি সস্তার জন-মজুরদের খনি ও কারখানায় প্রেরণের সুবিধার জন্য ও প্রায় পড়ে পাওয়া কাঁচামাল ভারত থেকে রপ্তানি করে সহজে পয়সা বানাবার চেষ্টায়। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রেভলিউশান্ সফল করতে যে সোনাদানার প্রয়োজন হয়েছিল তার বেশীর ভাগই চয়ন করা হয়েছিল এই অভাগা দেশ থেকে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রত্যেকটি ষ্টারলিং-এর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ এসেছিল ভারতের ধনভাণ্ডার শোষণ করে। আমাদের দেশের অশিক্ষিতের সংখ্যাধিক্য জ্ঞাপন করতে আপনার

বিস্ময়ে উপরে উঠা ভুরু মাথার চুলের কিনারায় ঠেকে ধাক্কা খেতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষাকল্পে যে ব্যয় বরাদ্ধ করেছে তা শুনলে আপনার বিবেকে যদি বিশ্বাস থাকে তো আড়ষ্ট হয়ে ও ভুরু আর নীচে নামতে চাইবে না। সারা বছরের শিক্ষাকল্পে প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য বৃটিশ সরকার গড়ে দুই পেনির মত অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। বড়ই দুঃখের কথা যে সরকার থেকে এত বড় দান পেয়েও আজ ভারতে শতকরা তিরানব্বই জন নিরক্ষর। আর বৃটিশ-নায্য-বিচারের কথা বলছেন—ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে ভারতবাসী কলিকাতা শহরে ব্যবসা করতে চাইলে তাদের মাশুল দিতে হোত কিন্তু ইউরোপীয় হলে বিনা মাশুলে তাদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। হেস্টিংস যখন বলেছিলেন এ অন্যায় প্রথা এবং এটা বন্ধ হওয়া উচিত তখন তাঁকে অসাধু বলে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছিল। তাঁর সারা জীবনব্যাপী এই মামলায় যখন তাঁকে নির্দোষী প্রতিপন্ন করে নিষ্পত্তি করা হল সুনামহানি ও অর্থহানির জন্য হেস্টিংসকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছুই দেওয়া হয় নি।'

মিস্ হিটন্ বলে উঠলেন, 'অনুরোধ করছি ম্ঁ্যসিয়ো, আর আমাদের হেঁয় করো না। যদি এমনি করে আমাদের কলঙ্কের ফিরিস্তি দিতে থাক তা হলে আমার আতলিয়ের সাদা দেওয়াল কাল হয়ে যাবে।'

তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে হঠাৎ এতগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেলার জন্য তাঁর কাছে মাপ চাইলাম।

ডাঃ লিট্না বললেন, 'যে অবিচার অন্যায় ও পরধন শোষনের কথা বললে সেটা টিউটন জাতির একটা মজ্জাগত দোষ। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই দেখিয়েছে আসুরিক শক্তির দম্ভ ও দুর্বলের পীড়ন। এই জাতের চরম প্রতীক হচ্ছে হিটলার।'

উপস্থিত তিন জন ইংরাজ মহিলা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন,

'আমাদের জাতকে যতখুশী গালাগালি দাও কিন্তু ওই পাষণ্ডের সঙ্গে বা তার স্বজাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তুলে অপমান করো না।'

সমষ্টিগতভাবে কোন জাতির স্বভাবধর্ম নৃশংস ও হীন বলে দোষারোপ করা অন্যায় হবে কিন্তু হিটলার-এর ইহুদীপীড়নে নির্মম অত্যাচার ও হত্যা প্রণালীর অভিনবত্বে সারা জগতে যে মর্মান্তিক গ্লানির সৃষ্টি করেছে তার কালিমাকে মুছে ফেলতে সারা জার্মান জাতিকে বহু যুগ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মধ্য যুগে যে কারণে ইহুদী পীড়ন হয়েছিল বর্তমানের বিদ্বেষ তাকে উপলক্ষ করে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ায় স্বার্থাভিসন্ধি দু'একটি রাষ্ট্রীয় দল রাজনৈতিক মন্দ পরিস্থিতির জন্য ইহুদীদের মিথ্যা দায়ী করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রিন্স বিসমার্ক, প্রিন্স লেইস্‌তেন্‌স্তাইন্‌, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির রক্ষণশীল দল তৎকালীন রুমানীয় সরকার, চার্চের পক্ষাবলম্বীরা এমন কি পোপ পর্যন্ত ইহুদীদের সকল পাপ বহনকারী ছাগের পর্যায়ে ফেলে নিজেদের স্বার্থাভিসন্ধি পুরণের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইহুদীরা ইষ্টার ব্রতের জন্য তৈরী রুটীতে মানুষের রক্ত মিশায় এই মিথ্যা অপবাদ প্রচারে রাশিয়া ও পোলাণ্ড-এ তাদের লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও সহস্র সহস্র ইহুদী রমণীর পাশবিক ধর্ষণ অত্যাচার ও পরিশেষে প্রাণনাশের পিছনে ছিল রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। ফ্রান্সে ঘৃণ্য ড্রাইফুস্‌ কেস-এর উৎস ছিল ওই একই কারণ। সারা ইউরোপে প্রায় দুই শতাব্দীতে জমা ইহুদী পীড়নের নোংরামী রূপ ধরেছে জার্মান ফুরের হিটলার-এর প্রতিষ্ঠায়।

যে লক্ষ কোটি ইহুদী তার কবলে পড়ে পাশবিক নির্যাতন ও পরিশেষে হত্যার বিবিধ ও অভিনব পন্থায় নিহত হয়েছিল তাদেরই একজন ছিল স্যারা। সে ছিল জাতে পোল ও ইহুদী। আর্যরক্ত সংরক্ষণ ও সভ্যতা শুদ্ধিকরণের দাবানলকে এড়িয়ে প্যারীতে এসে সে ভেবেছিল

এবার পরিত্রাণের সীমানায় পৌঁছে আরম্ভ করবে নতুন জীবন। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেল এক বন্ধুর ডেরায়। সে খুঁজছিল তাকে বিনা পারিশ্রমিকে ইংরাজী শেখাতে রাজী এমন কাউকে। বন্ধু প্রস্তাব করলেন যে আমরা যদি দুজন ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শেখার বিনিময় করি, তাকে কেউ পারিশ্রমিক দিচ্ছে না এই দ্বিধা মনে আসার কোন কারণ থাকবে না।

পরিচয় একটু পুরানো হলে স্যারার অনুরোধে তাকে ভারতীয় প্রথায় আঁকা আমার কয়েকখানি ছবি দেখিয়েছিলাম।

তারপর আবার যেদিন আমরা ভাষা শিক্ষার ক্লাস করতে বসলাম সে একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার ওই ছবিগুলি আমার মনকে বেশ রীতিমত আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে আপন দেশ থেকে বিতাড়িতা আমি দরিদ্রা রেফিউজি। আমার এমন সঙ্গতি নেই যে মূল্য দিয়ে তোমার রচনার একটি কিনতে পারি। কিন্তু এর একটি পাওয়ার আর কোন উপায় না দেখে ভেবে ভেবে যে আকাশকুসুমকে চোখের সামনে খাড়া করেছি সেটা তোমাকে বলে ফেলে অন্তত মনকে হাল্কা করে ফেলতে চাই। তোমার ছবির দাম নিশ্চয়ই অনেক এবং আমার সাধ্যাতীত। কাজেই মূল্য জিজ্ঞাসা করার ধৃষ্টতা ছেড়ে তোমায় আমি অনুরোধ করছি যে, আমাকে তোমার কোন কাজ করতে দাও এবং যতদিন না সেই কাজের পারিশ্রমিক তোমার ছবির দামের সমান হয় ততদিন খাটতে প্রস্তুত আছি।'

বললেন, 'মাদমোয়াজেল্ আমি এক গরীব শিল্পশিক্ষার্থী, কি কাজ তোমায় দিতে পারি যার জন্যে পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে।'

সে বলল, 'তোমরা তো শিল্পানুশীলনে মডেল নিযুক্ত কর আমি তোমার মডেলের কাজ করতে প্রস্তুত। অবশ্য বস্ত্রহীনা হয়ে জীবনে কখনও অপরের সামনে দাঁড়াই নি। আজ সে লজ্জাকে ভাঙবার মত সাহসকে আনতে পারব কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

তার প্রস্তাবে হতবাক আমি কি জবাব দেব ভাবছি দেখে ভুল

বুঝে সে বলল, 'ও কি আমার বোকামি! আমার শরীরের গঠন তোমার শিল্পাদর্শের উপযোগী কিনা না দেখে কেমন করে তুমি স্বীকার পাবে যে আমি মডেলের পারিশ্রমিক অর্জনের যোগ্যা। যদি রাজী হও তো আমি চেষ্টা করব আমার শরীরের গঠনকে তোমার সামনে দেখাতে এবং যদি দেখ যে কাজের অযোগ্যা আমি তা হলে যে প্রস্তাব করেছি তা ভুলে যেও। আমি মনকে বোঝাব যে আমার মত দীনার শিল্পরত্নসংগ্রহের লোভ সংবরণ করা উচিত।'

'এ বিষয়ে পরে কথা হবে' বলে পরের ভাষাচর্চার ধার্য দিনে আমার ছবিগুলির একটি এনে তাকে উপহার দিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, কবে থেকে তাকে মডেলের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

তাকে আমার মডেল হতে হবে না বলায়, ভীষণ আপত্তি করে স্যারা বলল, 'বিনামূল্যে আমি কোন্ স্পর্ধায় এ ছবি নিতে পারি! অন্তত তুমি যতদিন প্যারীতে আছ আমায় তোমার ময়লা জামা কাপড় কেচে সাফ করতে দাও এবং ছিঁড়ে যাওয়া মোজাগুলি আমায় রিপু করতে দেবে। এটা ঋণশোধের চেষ্টা বলে মনে করি না, কিন্তু তার একটি ভান করা তৃপ্তির প্রচেষ্টা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।'

বললাম, 'এ সামান্য ছবির দাম দেওয়ার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন? এর বাস্তব মূল্য তো কেবল পঞ্চাশ সাতিম্‌এর (পুরানো ছ'পয়সার সমান) একখানা কাগজ আর সামান্য কয়েক ফ্রাঙ্কের রঙ। কিন্তু মনের জগৎ থেকে আহরণ করে যে রূপকে এই কাগজখানার উপর রাঙানো হয়েছে তার সঠিক মূল্য দিতে পারে এমন মুদ্রা আজও তৈরী হয় নি। ক্রেতা আপনার মন ঠকায় শিল্পীকে তার পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেছে ভেবে, আর শিল্পী সে মূল্য পেয়ে ভাবে এ হল তার দৈনন্দিন তৈল ইন্ধনের সমস্যার সাময়িক সমাধান এবং এর ফলে উদরান্ন সংস্থানের দুশ্চিন্তা থেকে

কিছুকাল অব্যাহতি পেয়ে সে মনের জগতে রূপের খোঁজে বেপরোয়া ঘুরতে পারবে। কাজেই এ ছবির পয়সার দাম নেই মাদম্যয়েল। শিল্পী তার মনের গহনে চিন্তার বনপ্রান্তরে চলতে কোন অভিনবের সাড়া পেয়ে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায় এবং তারই একটা রূপক ভেবে নিয়ে ছকে, রঙে বা গঠনে ফেলে চায় আবার সেই অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে বারে বারে নূতন করে উপলব্ধি করতে। তারপর সে চায় সেই উপলব্ধিকে অপর অনেকের মনে জাগিয়ে তার সৃষ্টির আনন্দের ভাগ দিতে। তাই সে শিল্প সৃজন করেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না, দেখাতে চায় তার সৃষ্টিকে জগৎজনকে। তার শিল্প সার্থক হয় যখন আর কেউ শিল্পীর অনুভূতির অংশীদারী হয়ে এই নবসৃষ্টির তোরণ পেরিয়ে চলতে থাকে তার কল্পরাজ্যের রাজপথে, হাটে বা বাগানে এবং তখনি সে দর্শক দিয়ে ফেলে শিল্পের প্রকৃত মূল্য। মাদম্যয়েল, তুমি বোধ হয় না জেনে দিয়ে ফেলেছ এ ছবির মূল্য, একে পাবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়ে।

স্যারা স্বপ্ন দেখত তার প্রেমে মুগ্ধ ছেলেবন্ধু একদিন হবে তার ফিঁয়াসে এবং তারপর সংসারে ভার নেবার মত অর্থাগম হলে তারা বিবাহ করে বাঁধবে ঘর। তাদের দাম্পত্য নীড়ে সুখদর্শনের স্মারকের একটি হবে এই ছবিখানি। তার বন্ধুকে স্যারা প্রায় দশবার সবিস্তারে জানিয়েছিল কেমন করে সে আমার কাছ থেকে ছবিখানি আদায় করেছে।

যুদ্ধান্তে পারীতে ফিরে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খোঁজে পেলাম স্যারার খবর। হিটলারীয় ইহুদীবিনাশী অনুসন্ধানীদের কবলে পড়ে তার সুখস্বপ্নের শেষ হয়ে যায় গ্যাস চেম্বারে।

ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বেলাভূমিতে স্যারা একটি বালুকণা মাত্র, যার সর্ব অস্তিত্ব হতসমষ্টির রাশিতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ডাগারম্যান, স্ফ্যাঙ্কস্ এবং প্যাটারসন স্মিথ

আতলিয়েতে যে ক'জন ভাস্কর শিক্ষানবিশী করত ডাগারম্যান কেবল তাদের একজন বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে। আমাদের সমষ্টিকে সক্রিয় একটি কলকব্জার মত মনে করলে ডাগারম্যানকে বলতে হবে যেন তার মেন্ স্প্রিং। সকালে সে না আসা পর্যন্ত সকলে মনে মনে তটস্থ হয়ে থাকত এই পাগল কি অদ্ভুত বিস্ময় কি বীভৎসের ঝাঁকা মাথায় বয়ে এনে হঠাৎ সেটা আমাদের মাঝে ফেলে দিয়ে সকলের ধরা-বাঁধা কাজে একটা উলট পালটের ব্যবস্থা করবে।

আতলিয়ের বাইরে তার আড্ডা ছিল বেশীর ভাগ সময় গানবাজনার সরগরমে ভরা কোন ক্যাফেতে বা শরাবখানায় কিংবা কুখ্যাত পল্লীর কোন দেহোপভোগের রঙ্গালয়ে। অনেক সময়ে তার সঙ্গে আসত ওই সব জায়গা থেকে তার পরিচিত দু' একটি সজীব স্মৃতি।

দিনের কাজ শেষ হলে সে বলবে হয়ত, 'চল হে 'স্ফ্যাঙ্কস্'-এ গিয়ে একটু-ফুর্তি করে আসি।' এই প্রস্তাবে আতলিয়ের ইংরেজ মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হোত, যেন তাদের দেশ থেকে আনা মরালিটির ফানুশের কাচে ডাগারম্যান একটা ইট ফেলেছে।

পারীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ছোঁয়াচ পেতে যেমন আসে দলে দলে শিক্ষার্থী ও বিদগ্ধজন সারা জগত থেকে, তার বেশী আসে টুরিষ্ট, উন্মাদভোগের বিপণীভরা এই শহরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের লালসাকে তৃপ্ত করতে। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় যদিও পৃথিবীর সর্বদেশের শহরে বিদ্যমান, সেগুলিকে অন্যত্র লোক-দেখান মরালিটির খোলস ঢাকা দিয়ে, ছদ্মবেশের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ফরাসীরা সেগুলিকে ভব্যভাবে সৌন্দর্যের বেশ সল্মা চুমকি লাগিয়ে খোলাখুলি-ভাবে টুরিষ্টদের সামনে তুলে ধরেছে আর তারা সাময়িক সকল ইন্‌হিবিশানমুক্ত হয়ে এই আদিম ইচ্ছা চরিতার্থের সুখসাগরে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিচ্ছে।

আবার দেশে ফিরে ইন্‌হিবিশান্‌-এর জেলখানায় ঢুকলে তাদের মনের চোরা মণিকোঠায় থেকে যাবে একটা শৌখিন অপরাধের স্মৃতি যাকে মনে মাঝে মাঝে স্মরণ করে পূর্বসুখের স্পর্শকে জাগিয়ে তোলার একটা আনন্দ পাবে।

মোপার্‌নাস্‌ পাড়ায় 'স্ফ্যাঙ্কস্‌' ছিল প্রাচীন মিশরীয় ভোগজীবনের একটা নকল পরিবেশ। একটি বড় বাড়ির 'বেসমেন্ট' অর্থাৎ জমির লেবেল-এর নীচে তৈরী তলায় ছিল এক বিরাট হলঘর যার মাঝখানে বসানো ছিল নারীমুখ ও সিংহদেহের একটি বিরাট স্ফিঙ্কস্‌-মূর্তি।

থামগুলি মিশরীয় স্থাপত্যের ঢঙে গড়া নকশায় রঙীন। পিরামিডের নীচের কামরাগুলিতে যেমন প্রাচীরচিত্র আছে তারই অনুকরণে এই হলের দেওয়ালে ছবি আঁকা। হলে পানকারীদের বসবার চেয়ার এবং টেবিলগুলিও প্রাচীন মিশরীয় আসবাব-এর ছাঁচে গড়া।

পানীয় সরবরাহ করছে প্রাচীন মিশরীয় ক্রীতদাসীদের অনুকরণে স্বল্পমাত্র বাসপরিহিতা প্রায় উলঙ্গ সুন্দরী তরুণীরা।

পানীয়ের দামের একটু বেশী পয়সা দিলে এরা ক্রেতাদের পাশে বসে বকসিসের মাপ অনুযায়ী আলাপ গল্প করবে আর তার চেয়ে গভীর আন্তরিকতার সুখ তাদের পরিবেষণ করবার অনুরোধ জানালে তার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে লিফটে উপরে উঠে প্রাচীন মিশরীয় আবহাওয়া ভরা ছোট ছোট কামরায় ক্রেতা এই ভাড়াকরা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য একলা হতে পারেন।

ডাগারম্যান স্ফ্যাঙ্কস্‌-এ যাবার পয়সা কোন্‌ উপায়ে পেত জানি না কারণ আমাদের আর তিনজনের মত তার পকেটে হাত দিলে খালি বাতাস ছাড়া মুঠোয় আর কিছু আসত না।

সে কিন্তু স্ফাঙ্কস্‌-এ যেত না টুরিষ্টদের মত একটা কেনা আমোদের সুখান্বেষণে। কয়েকটি পুরুষ সঙ্গীর দল নিয়ে সে বসত একটা টেবিল অধিকার করে এবং একটা করে কফি নিয়ে তারা সকলে অন্যদের

রঙ্গলীলা দেখত কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে। প্রেম বেচাকেনায় নিরাসক্ত তাদের এই কড়া দৃষ্টি অন্যদের মনে আনত চাঞ্চল্য। সাধারণ সমাজ-নীতিতে হেয় এই সাময়িক লাম্পট্য ডাগারম্যান ও তার সঙ্গীদের চোখে ধরা পড়ায় টুরিষ্টরা যেন অপরাধী হয়ে পড়ত।

যারা একটু আনন্দের খোঁজে এসেছে তাতে তারা যে দুর্বলতাই দেখাক ডাগারম্যানের কি লাভ হয় তাদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবার চেষ্টায় তা জানতে চাইলে সে বলত, 'আমি তাদের কেবল জানিয়ে দিতে চাই যে যারা ওখানে যায় তারা সকলেই একই উদ্দেশ্যে আসে না বা তাদের প্রবৃত্তি একই নয়। এরা এসেছে তো একটা স্বাভাবিক আদিম ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে তার জন্যে মরালিটিকে বাঁচিয়ে চলার এত ভড়ং কেন।

'জান, একদিন এখানে বসে কফি খাচ্ছিলাম। এমন সময় পানীয় সরবরাহকারিণী একটি মেয়ে এসে আমার পাশে বসে আলাপ করতে চাইলে তাকে বলেছিলাম যদি কোন নিগ্রো মেয়ে থাকে তো তাকে পাঠাও, তার সঙ্গে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ হতে পারব। সে তখনি 'পাত্রঁ'কে গিয়ে নালিশ করে যে আমি তার অপমান করেছি। 'পাত্রঁ' যখন মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ জিজ্ঞাসা করল বললাম, এখানকার সাদা মেয়েদের আমার পছন্দ হয় না। এই উত্তরে সে ধরে নিল আমি সেক্স্‌ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ধরনের লোক এবং বলল যে হোমোসেক্‌সুয়ালদের একটি বিখ্যাত ক্লাব আছে সেখানে না গিয়ে এখানে এসে স্বভাবনির্দিষ্ট লোকগুলির আনন্দের অন্তরায় হই কেন? তাকে বললাম, ম্যঁসিয় একটা নকল মিশরীয় পরিবেশে অপ্রাকৃত মিশর-সুন্দরীর অলীক সংস্করণ ক্রেতাদের কাছে না বিতরণ করে সত্যিকারের প্রাচ্যদেশীয় সুন্দরীদের আমদানী করা উচিত। তা-হলে এই মিথ্যা মায়ার বাজারের অন্তত খানিকটা হবে সত্য। আমার বাইরেটা ভুল করে হয়েছে শ্বেতকায় সুইডিস, অন্তরে আসলে আমি আদিম প্রকৃতির তাই আমার চোখে প্রাচ্যদেশীয় কি আফ্রিকার কালো

মেয়েকে সব চেয়ে সুন্দরী লাগে। এখানকার শ্বেতকায় মেয়েদের দিকে তাকালে মনে হয় এদের চামড়ার বাইরের পর্দাকে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে আর তারা হয়ে গেছে যেন চলমান কাঁচা মাংসপিণ্ড।

'এইসব লম্বাচওড়া কথা শুনে 'পাত্র' ' নিজের মাথার খুলিতে স্ক্রুর প্যাঁচের মত আঙুলের ভঙ্গি করে বললেন, 'ইল্ এ ফুঃ' অর্থাৎ আমার মাথার খুলিটি বেশ আলগা যার ফাঁক দিয়ে প্রচুর বাতাস প্রবেশ করায় এই অভাগার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

'কিন্তু জান হে, শুধু আমি কেন সারা সুইডিস্ জাতটার মধ্যে দেখতে পাবে আমারই মত আদিম প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফুরণের আবেগ যাকে সাদা চামড়ার লেপ্টে থাকা সভ্যতার ভিনিয়ার কেবল চেপে রাখতে গিয়ে এনে দেয় একটা মানসিক অবসাদ। তাই আমোদ আমাদের ঠিক ভাল লাগে না তাকে যে ভাবে পেতে চাই তা পাই না বলে। আমরা খুঁজে বেড়াই বেখাপ্পা, বেরসিক কিছুর সন্ধানে যার সান্নিধ্যে দিনে অন্তত ঘণ্টা তিনেক অবসাদে খুশী হতে পারি। তোমাদের ভারতীয়দের কথা মনে করে আমি তোমায় হিংসে করি কারণ তোমাদের দেশে সেক্স্ সম্বন্ধে মনে হয় ভারতবাসী কোন ইনহিবিশান্-এ পীড়িত নয়।'

জিজ্ঞাসা করলাম, সেক্স সম্বন্ধে আমরা ইনহিবিশানমুক্ত এ ধারণা সে পেল কোথা থেকে।

সে বলল, 'তোমাদের বহুবিবাহকে সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া একটা প্রমাণ আর স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক সঙ্গম যে পাপ ও অপরাধ বা অশ্লালতা নয় এবং এটা একটি প্রয়োজনীয় জৈবধর্ম এই সত্য ধারণার ছাপ দেখতে পাই তোমাদের মন্দিরের ভাস্কর্যে রতিলীলায় উন্মত্ত নরনারীর মিলন মূর্তিতে। এই ভাস্কর্য থেকেই উদ্দীপনা পেয়ে রোদ্যাঁ প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলাকে দেখাবার চেষ্টা পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ানিটির জারি করা অপরাধ ও অশ্লীলতার ভ্রান্ত নিষেধ-যষ্টির প্রকোপকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কাজেই তাঁর করা অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনবদ্ধ স্ত্রীপুরুষের যুগল মূর্তিগুলি যেন ঘোষণা করে যে

তারা সাহস করে পাপ করেছে এবং তাদের উপভোগের মাঝে একেবারে গা ঢালা আনন্দের স্বচ্ছন্দচারিতা নেই যা ভারতীয় যুগ্মমূর্তি-গুলিতে অনুভব করা যায়।

বললাম, 'বন্ধুবর, মিউজিয়াম-এ ভারতীয় ভাস্কর্য দেখে ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়ে ধারণা করে ফেলেছ আমরা কেমন সেক্স ইন্‌হিবিশান্‌মুক্ত জাতি।

'বর্তমানে আমরা কিভাবে চলি ও আমাদের আচার, ব্যবহার ও প্রবৃত্তি কি রকম তার সঠিক বিচারে তুমি কিন্তু মহা ফাঁদে পড়ে যাবে। বহুবিবাহ থেকেও আমাদের দেশে দেহ বেচা-কেনার রঙ্গালয় ছিল এবং এখনও আছে। ইউরোপ থেকে আমদানীকরা ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌-হিবিশান্‌ আমাদের মধ্যেও দেখতে পাবে প্রচুর এবং সে নিষেধের তীব্রতা তোমাদের দেশের থেকে আরও জোরাল যদিও সে ইন্‌হিবিশান্‌-এ অন্ধ সমাজ ভারতে ক্রিশ্চিয়ান নয় হিন্দু।

'স্বীকার করি, এক সময়ে সেক্স্‌ সম্বন্ধে ধারণা ভারতে হয়ত ইন্‌-হিবিশান্‌মুক্ত ছিল যখন স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলন অপরাধ বা অশ্লীলতা ছিল না কিন্তু তার অর্থ নয় যে তা ছিল অবাধ ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভরা।

'আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীলোকদের উল্লেখ করা হয় 'মায়ের জাত' বলে কিন্তু তার মধ্যে আগেকার সম্ভ্রমের আভাস নেই। এখনও কথা-প্রসঙ্গে লোকে বলে তাদের ধর্মসঙ্গিনী কিন্তু বাস্তবে ধর্মে বা জীবনে তারা প্রকৃত সঙ্গিনীর অধিকার পায় না। ইসলাম আসায় ভারতের নারীসমাজ ঘরে বাইরে স্বচ্ছন্দ গতিবিধির অধিকার হারিয়ে বন্দী হল অন্তঃপুরে। ক্রিশ্চিয়ান ভাবধারা তাদের আবার বাইরে আসার দরজা খুলে দিতে সাহায্য করেছে কিন্তু যে সম্মান সঙ্গে নিয়ে তারা অন্তঃপুরে প্রথমে গিয়েছিল আজ বেরিয়ে আসে নি সমাজের কাছে সেই সম্মানের দাবী অধিকার করে।

'সেক্সের যে সুস্থ দৃষ্টি ছিল পূর্বের ভারতে তা আজ নেই। শিল্পী

গড়েছিল এই অপূর্ব মিলনে আত্মহারা মূর্তিগুলি হাজার বছর আগে যে সমাজের জন্য তা আজ বদলে গিয়ে এর মধ্যে দেখে না শৃঙ্গারকে উপলক্ষ্য করে মূর্তির অপূর্ব ছন্দভঙ্গিমার সৌন্দর্য যা আত্মহারা প্রেম-বিকাশই একমাত্র মূর্ত করতে পারে।

'এই মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে যদি দর্শকের দৃষ্টি কেবল দেহের ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রতি আবদ্ধ না হয়ে যায় তা হলে সে দেখতে পাবে শৃঙ্গারের এই যোজনায় স্ত্রী ও পুরুষ সমান সমান অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে জেণ্ডার হিসাবে মুখ্য ও গৌণের বিচার কোথাও দেখা যাবে না।

'ভারত সংস্কৃতির আজ বিকৃত বিচারে সেগুলিতে অশ্লীলতার চুনকালি পড়ে গেছে। ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌হিবিশান্‌-এর দৃষ্টি পেয়ে ভারত-বাসী তার পুর্বপুরুষের এই অপূর্ব দানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে কেবল একটি কথা—জেণ্ডার ও তার ক্রিয়া এবং তা গোপনীয় ও অশ্লীল।

'তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দান মিশনারী ও সিনেমাসিঞ্চিত হয়ে ভারতের অন্দরে বাইরে রমণীকে করেছে একটা অশ্লীল ইচ্ছা চরিতার্থের বিষয়বস্তু মাত্র।'

তাকে বললাম, 'এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর বলা একটি ঘটনা বলি শোন। বেশ কয়েক বছর আগে পারীতে এসেছিলেন কলিকাতার কলেজের এক বহু গণমান্য অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একটি কর্ণধার, যে সমাজ গড়ে উঠেছে প্রায় ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের কাঠামো অবলম্বন করে। বিগত বহু মনীষীদের আত্মা মাঝে মাঝে এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাথায় ভর করতেন।

'পারীতে থাকাকালীন একদিন ভোর ছটায় তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্রের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে আমার কাছে ভিক্তর য়্যুগো এসেছিলেন, শিগগির নিয়ে চল আমাকে তাঁর বাড়িতে।

'কোন যুক্তি বা অনুযোগ চলল না তাঁর সঙ্গে, যেতে হল ছাত্রটিকে

ভিক্তর য়্যুগোর বাড়ি, যদিও সেখানে তাঁকে অপেক্ষা করতে হল দশটায় মিউজিয়াম খোলার সময় পর্যন্ত।

'য়্যুগোর বাসস্থানের সবকিছু দেখে তাঁরা যখন জুলিয়েত-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলা হলো যে এইখানে য়্যুগো তাঁর প্রণয়িনীর সঙ্গে সময় কাটাতেন, তিনি কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'চল চল, শিগগির এ ঘর থেকে বাইরে যাই। এইঘরে য়্যুগোর দেহ কলুষিত হয়েছিল।'

অধ্যক্ষ মহাশয় য়্যুগোর জীবনচরিত পড়েছিলেন কি না জানা নেই এবং এও জানি না জুলিয়েতে-এর য়্যুগোর প্রতি যে অনন্যচিত্ত পরিপূর্ণ প্রেম, যা তাঁর লোক ও ধর্মমতে বিবাহিত স্ত্রী দিতে পারেন নি, তাকে উপলব্ধি করবার মত মন ও হৃদয় এই অধ্যক্ষের ছিল কি না। য়্যুগোর শেষ জীবন পর্যন্ত বহু প্রণয়িনী সম্ভোগের তালিকা বেশ দীর্ঘ কিন্তু তার জন্য সমাজে তাঁর সুনামের হানি হয় নি কিন্তু যে রমণীর ভালবাসার একনিষ্ঠতা তাঁকে আমৃত্যু প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছে তাকে তোমাদের সমাজে খুব সম্মান না দিলেও অন্তত পাপের পর্যায়ে ফেলবে না।

এ ঘটনা আমাদের দেশে হলে পরে য়্যুগো হয়ত কিছুটা পার পেয়ে যেতেন কিন্তু বেচারি জুলিয়েত-এর জন্য আমাদের সমাজ যে শাস্তি বিধান করত তাকে সহ্য করবার শক্তি তার হোত কিনা সন্দেহ। কে জানে হয়ত হাজার বছর আগে য়্যুগো ও জুলিয়েত-এর মত প্রেমিকদের ভারতীয় সমাজ শুধু সমাদর করেই ক্ষান্ত হোত না, হয়ত তাদের যুগল-মূর্তি পাথরে খোদাই করে মন্দিরে সাজাত।'

ডাগারম্যান বলল, 'আমাদের দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের পরিপূর্ণ সম্মান ও আসন দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহ বাদে স্ত্রীপুরুষে দৈহিক মিলন সমাজে অবাধে চলছে কিন্তু তা সত্বেও ভারতীয় ভাস্কর্যের মত প্রেমলীলার ছবি এদেশীয় শিল্পীদের হাত থেকে আজও বের হয় নি কেন?'

বললাম, 'মঁ্যসিয়, তোমরা স্ত্রীপুরুষকে পাপ করার সমান অধিকার দিয়েছ কিন্তু মন থেকে দৈহিক মিলন যে পাপ নয় এ যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দূরীভূত হচ্ছে—এমন কি মগ্নচৈতন্য মন থেকেও, গভীর প্রেমানুভূতির এই ছবিকে তোমরা দেখতে বা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। আমায় কিন্তু ভুল বুঝ না যে স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ মিলনকে আমি সমর্থন করছি। স্ত্রী ও পুরুষকে ধর্ম ও সমাজ জীবনযাত্রায় পরস্পর অংশীদারী হবার অধিকার যে রীতিতে দিক না কেন তাতে যেন বজায় থাকে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আত্মস্ফুরণের মেনে নেওয়া পরিপূর্ণ সমান দাবী।'

দৈহিকভাবে নিগ্রোদের প্রতি আকর্ষণ শুধু ডাগারম্যান নয়, শ্বেতকায় জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

একদিন সে এক লম্বা ও বলিষ্ঠ নিগ্রোকে আতলিয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

থ্রোনে দাঁড়ান উলঙ্গ মেয়েটির রূপাবলম্বনে আমরা মূর্তি গড়ছি দেখে নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন, 'কি অদ্ভুত, কি অদ্ভুত! শিল্পীরা এমনি করে মূর্তিগুলি গড়ে এ ত আমার জানা ছিল না।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তাঁর মূর্তি ওইভাবে করতে ইচ্ছুক কি না। আমরা জানালাম যে তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ শুনেই তিনি কাপড় খুলতে শুরু করে দিলেন। মেয়ে মডেলটি তাড়াতাড়ি থ্রোন থেকে নেমে কাপড় পরে তাঁকে মডেলের জায়গা ছেড়ে দিল। স্যুট ও অন্তরবাস ছেড়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে যেন কালো ব্রঞ্জের এক অ্যাপোলো মূর্তি। পুরুষের এই বলিষ্ঠ সুঠাম মূর্তি একটু আগে আমাদের চোখে ভাসা ভিনাস-এর রূপকে ম্লান করে দিল। আমরা নব উদ্যমে আরম্ভ করলাম তাঁর মূর্তি গড়তে। ভদ্রলোক তাঁর নাম পরিচয় দিলেন 'স্মিথ্' বলে। ডাগারম্যান-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল কোন এক পানশালায়।

সপ্তাহ কয়েক পরে মূর্তিটির পরিসমাপ্তিতে মডেলের পারিশ্রমিক তাঁকে দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনি বাইরে হয়ে আসছি, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।'

তিনি ফিরে এলেন এক ডজন শ্যাম্পেন-এর ভরা বোতল নিয়ে এবং সেগুলি প্রায় আমাদের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'পান কর, আমোদ কর, আমার শুভ সাফল্য কামনা কর।'

জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের সাফল্য কামনায় আমরা পেলাম এতগুলি শ্যাম্পেন যা কিনতে তিনি তাঁর মডেলের পারিশ্রমিকের অন্তত ছগুণ ব্যয় করেছেন।

তিনি বললেন, 'তোমরা দেখছি জান না যে আমি মুষ্টি যোদ্ধা প্যাটারসন্ স্মিথ্, আসছে কাল ফরাসী চ্যাম্পিয়ন-এর সঙ্গে আমার লড়াই হবে।'

আমরা কাগজে এ সংবাদ পড়েছিলাম ঠিক কিন্তু শুধু স্মিথ্ পরিচয় দেওয়ায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ স্মিথ পদবীধারীদের মধ্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় আমাদের মনে চাপা পড়েছিল।

মুষ্টিযোদ্ধা প্যাটারসন্ স্মিথ্ সারা জীবন বহু লড়াই করে প্রায় বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা হবার সম্ভাবনা পেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য তাঁকে কেবল পাশ কাটিয়ে গিয়েছে বহুবার।

কয়েক বছর আগে হঠাৎ কাগজে দেখল্যাম সংবাদ, 'প্যাটারসন্ স্মিথ' প্রায় ভিখারী অবস্থায় নিউইয়র্কের কোন নিগ্রো পল্লীতে অতি দুঃস্থভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন। কালো মিশমিশে ও শক্তিতে তরঙ্গায়িত পেশীভরা সেই সুঠাম দেহ আর ঘরকাঁপান প্রাণখোলা তাঁর হাসি আজও আমি ভুলি নি এবং কখনও ভুলব না।

পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ ও তৃপ্তির উপাদান অন্বেষী টুরিষ্ট যেমন পারীতে আসে ভিড় করে জনপ্রিয় দ্রষ্টব্যের তালিকা হাতে নিয়ে, জ্ঞান অন্বেষী ছাত্র ও গবেষকরাও তেমনি আসেন দলে দলে এই শহরের বিদ্যাকেন্দ্রে পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম, 'সোরবন'-এ।

ইতালির 'সালেরনো' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই ইয়োরোপের প্রাচীনত্বে পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান। মধ্যযুগের গোড়ায় খৃষ্টিয় ধর্মতত্বানুযায়ী তর্ক ও মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ তার্কিক ধর্মযাজকদের বিধান শুনতে দেশদেশান্তর থেকে ছাত্রদের সমাগম হোত এখানের গীর্জার বিদ্যায়তনগুলিতে। দ্বাদশ শতাব্দিতে গিয়োম দ্য শাম্‌পো খৃষ্টিয় ধর্ম সম্পর্কিয় তর্কালোচনার একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। বিখ্যাত আবেলার ছিলেন এই বিদ্যায়তনের ছাত্রদের একজন। তাঁর ভাষণের যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এখানে ছাত্র সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবেলার প্রথম নোতরদাম কাথেড্রাল-এর সংশ্লিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্রে ও পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ম-সাঁ-জেনভিয়েভ্'-এর শিক্ষায়তনে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। এই সাঁ জেনভিয়েভকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে গড়ে উঠল ভবিষ্যত পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাবনা এবং ছাত্রদের বিদ্যা আয়ত্তের পরিমাপকারী তিনটি ক্রমোত্তরমান উপাধির সূত্রপাত হয় এখানেই।

১২৫৬ খৃষ্টাব্দে বেয়াব্ দ্য সোরবন্ একটি বিদ্যায়তনের স্থাপনা করেন। যদিও অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সমষ্টিই পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপনা করেছিল, সোরবনের শিক্ষকদের ছাত্রজনপ্রিয়তা বিশেষ প্রসার লাভ করায় এর পরিবর্দ্ধিত থিওলজির ফাকুলতে প্রদত্ত উপাধির সম্মান সর্বোচ্চ বলে ধরা হোত।

এই সোরবন-এই প্রথম ফ্রান্সে পুস্তক মুদ্রণের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সোরবন্-এ পারীর বিশ্ববিদ্যালয় ও 'একাদেমি দ্য পারী'

স্থাপিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সোরবন পারী নগরীর সম্পত্তিতে পরিণত হলে সম্রাট তৃতীয় নাপেলেয়ঁর আজ্ঞায় বহু নতুন সুঠাম অট্টালিকায় বর্দ্ধিত কলেবর হয়ে পৃথিবীতে সৌন্দর্যে অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি খ্যাতনামা বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন ও ধর্ম এই পাঁচটি ফাকুলতের সমন্বয়ে পারীর বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পিত এবং শিক্ষার ক্রমোচ্চ মান অনুযায়ী ছাত্ররা যে তিন প্রকার উপাধি পেয়ে থাকেন তার নাম হচ্ছে বাকালোরেয়া, লিসঁাস, ও দক্তরাত্। ফ্রান্সের জ্ঞানালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 'এঁ্যাস্তিত্যুত্ দ্য ফ্রঁাস' সরকার দ্বারা পরিচালিত। এর 'আকাদেমি দে সিয়ঁাস,' 'আকাদেমি দে বোzার,' আকাদেমি দে সিয়ঁাস মরাল্ পলিতিক' এবং 'আকাদেমি দেzাস্ক্রিপ্ সিয়ঁএ বেল্ লেতর'—এই পাঁচটি শিক্ষা সমিতি সোরবন-এর বিদ্যাভবনেরই একটি অঙ্গ।

সোরবন-এর মূল বাড়ির সামনে রাস্তার অপরদিকে সম্রাট প্রথম ফ্রঁাসেয়ার প্রতিষ্ঠিত 'কলেজ দ্য ফ্রঁাস'-এর বিরাট অট্টালিকা। এখানে নির্বাচিত বিখ্যাত গুণী অধ্যাপকরা নানা বিষয়ে বিভাগীয় প্রধানরূপে অধিষ্ঠিত।

অন্যান্য বহুবিধ বিভাগের মধ্যে সোরবন্-এ ভারতীয় সংস্কৃতির বিভাগ 'এঁ্যাস্তিতুত্ দ্য লা সিভিলিzাসিয়ঁ এ্যাঁদিয়ান্' ভারতীয় ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ। এখানে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশীয় ছাত্ররা ভারতের কৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন এবং তাঁদের থিসিস্ গৃহীত হলে 'দক্তরাত' উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতে বা অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিষয় গবেষণার বস্তুহিসাবে অনুপযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হলেও এই এ্যাঁস্তিতুত্-এ স্থান লাভ করে বলে সহজে ডিগ্রী পাবার লোভও ছিল ভারতীয় ছাত্রদের সোরবনাসক্তির একটি বিশেষ কারণ।

একদিন এ্যাঁস্তিতুত-এর এক অধিবেশনে যেতে একজন ছাত্র

সমবেত অধ্যাপকদের একজনকে নির্দেশ করে বললেন, 'উনি কে জান ?'

না, বলায় জানালেন যে ইনি বিখ্যাত ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ফুশে। আমার পিতার বয়সী অনেকে তাঁদের বাল্যে অধ্যাপক ফুশের নাম শুনেছিলেন। তাই তাঁকে যে স্বশরীরে এমন সুস্বাস্থ্যে জীবিত দেখব এ আশা করি নি।

বেঁটে দোহারা চেহারায় ফরাসী বৈশিষ্ট্য সুলভ চৌকস মুখে তাঁর যেমন দৃঢ়ত্বের ব্যাঞ্জনা ছিল, ছোট চোখ দুটিতে ছিল তেমনি সহৃদয়তা ও স্নেহ। তিনি চলে গেলে এঁ্যাস্তিতুত্-এর দপ্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, পণ্ডিত ফুশের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা ধৃষ্টতা হবে কিনা। তাঁরা বললেন, তাঁকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলে তিনি নিশ্চয়ই সে অনুরোধ রাখবেন।

সেই উপদেশ অনুযায়ী তাঁকে লিখলাম যে বিখ্যাত পুস্তক 'Beginnings of Buddhist Art' এর গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর নাম অনেকদিন থেকেই জানি এখন তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ দিলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

সরাসরি তাঁর জবাব পেলাম যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখন তাঁর বাসায় আশ্রমীয় আবহাওয়ার দিনগুলি শান্তিতে কাটাচ্ছেন। অতএব আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সাহায্যের সুযোগ অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে গেলে নিরাশ হব। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ভারতের এবং ছাত্রদের শুভানুধ্যায়ী। আমার সঙ্গে এমনি আলাপ পরিচয় করে তারা খুব খুশী হবেন এবং কেমন করে তাঁদের ঠিকানায় পৌঁছান যায় তার এক সবিস্তার বিবরণী দিয়ে এক সোমবারে অপরাহ্ণে তাঁদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

পারীর লুক্সাম্বু মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে বেশ লম্বা কয়েক কিলোমিটার পথ ছাড়িয়ে 'সো' তে পৌঁছালাম। সেখানে নেমে

প্রফেসার ফুশের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫নং রু মার্শাল গ্রোফর্ খুঁজে পেতে বেশী দেরী হল না।

দরজায় ঘণ্টা বাজাতে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা দোর খুলে ভিতরে নিয়ে গেল। প্রফেসর ফুশের বাড়িটি সত্যিই আশ্রমের মত আবহাওয়ায় ভরা। বড় বসবার কামরায় তুদিকের দেওয়ালের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বইভরা তাকে ঢাকা আর একদিকের বড় জানলার লেসের পর্দা ভেদ করে আবছা দিনের আলো অপরদিকে ফায়ার প্লেস-এর আলসেতে রাখা গান্ধার শৈলীর এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্তির উপর পড়ে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃষ্টি করেছিল।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি রাশিয়ান এবং আমার চেয়ে ভাল ইংরাজী বলেন।'

মাদামও বেশ সুপণ্ডিত। প্রফেসর-এর সব বইয়ের অনুক্রমণিকা-গুলি তাঁরই করে দেওয়া।

প্রফেসর ফুশের সর্বপ্রধান গবেষণার দান হচ্ছে বৌদ্ধশিল্প কলা সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বিশদ ব্যাখ্যা পণ্ডিত মহলে তখনও পর্যন্ত শেষ কথা বলে গণ্য করা হোত। তাঁর মতে বুদ্ধের পদ্মাসন বা কায়োৎসর্গ মানবমূর্তির প্রথম পরিকল্পনা ভারতীয়রা করেন নি। এর রূপ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মানুবর্তি গান্ধারের গ্রীকোরোমক শিল্পীরা। এ ধারণা যে ভুল তা আজ বহু প্রমাণে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং যে সময়ে মঁ্যসিয় ফুশের সঙ্গে আলাপ হয় তখন বহু পণ্ডিত এই ভুল নিয়ে বাদবিতণ্ডা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

ফুশের পূর্ববর্তী ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের অনেকে সাব্যস্ত করেছিলেন যে প্রাচীন ভারতীয়েরা শিল্পকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন অথবা তাঁদের শিল্পরচনা অতিশয় নিকৃষ্ট বা বীভৎস ধরনের ছিল এবং এদেশীয় যা কিছু ভাল শিল্পনিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তা গ্রীকোরোমক শিল্পীদের রচনা অথবা তাদের অনুকরণে সৃষ্ট

শিল্প। ফুশে বোধহয় কতকটা এই ভ্রান্ত ধারণায় সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে এই অভিমতকে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু পদ্মাসনে বসা এরূপ মূর্তি পরিকল্পনার নিদর্শন অতি প্রাচীন মোহন জো দারোয় আবিষ্কার হওয়ার পর ফুশে ও তাঁর অনুরূপ পণ্ডিতদের ভ্রমাত্মক অভিমত ইতিহাসের পাতায় আর স্থান পায় না। কিন্তু এই ভ্রান্ত সংস্কারটুকু বাদ দিয়ে প্রফেসর ফুশের গান্ধার বৌদ্ধ শিল্প সম্বন্ধে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা তা ভারতের শিল্প ইতিহাসে এক অমূল্য দান যার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির অনুধাবনকারীরা তাঁর কাছে চির ঋণী থাকবে। গান্ধারীয় বৌদ্ধ মূর্তির পরিচিতি ও সঠিক নামের যে বিবরণী ও তালিকা পণ্ডিত ফুশে দিয়েছেন তা আজও পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।

সমগ্রভাবে ভারতীয় মূর্তিকলায় দেবদেবীর সঠিক পরিচিতি সম্বন্ধে আজও পরিষ্কার কোন মহাকোষ লেখা হয় নি এবং এই সম্বন্ধে প্রফেসর ফুশের সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, 'তোমার এ বিষয়ে যখন এত উৎসাহ আমার মনে হয় এ্যাঁস্তিতুত-এ তোমার এ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত।'

বললাম, 'আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নই অথবা গবেষণার জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তা আমার নেই অতএব কোন্ অধিকারে আমি একাজে ব্রতী হবার সাহস করতে পাবি। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে আসি নি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সাহায্য বা সুবিধার খোঁজ আপনার কাছে পাব বলে। আমি এসেছি কেবলমাত্র আপনার মত পণ্ডিতের দর্শন সুখের আশায়।'

তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি এবিষয়ে গবেষণার যোগ্য কিনা তার বিচার করব আমরা আর আমায় তুমি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কাজের কথা বলবে না বলে যে নিষেধ পাঠিয়েছিলাম তা কেবল অপরিচিতের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু তুমি তো এখন আমাদের

পরিচিত বন্ধু। আসছে শুক্রবার আমি এঁ্যাস্তিতুত-এ যাব এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকবে।'

তারপর আমাকে চায়ে আপ্যায়ন করে তিনি বিদায় দিলেন।

শুক্রবার এ্যাঁস্তিতুত-এ পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রফেসর ফুশে সেখানের বহুগণ্যমান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার গবেষণার এ্যাঁস্ক্রিপসিয়ঁর (প্রবেশাধিকারের) ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন, 'গবেষণার একটা খসড়া করে আমায় পাঠাবে এবং পরে তুমি কোন্ কোন্ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে তার ব্যবস্থা করে দেব।'

খসড়া প্রস্তুত হলে প্রফেসর ম্যাঁস্যুরসেল্ ও লালোর নিকট আমার অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হল এবং যাতে করে ল্যাঁস্তিতুত্ দ্য লার-এ লারসিওলজির বিরাট গ্রন্থাগার-এ নির্বিবাদে পুস্তকালোচনা করতে পারি তার জন্য সেখানে দিরেক্তর প্রফেসর শার্ল্ পিকার-এর নামে এক পরিচয়পত্র পাঠিয়ে ফুশে লিখলেন, 'তুমি এই পরিচয়পত্র নিয়ে প্রফেসর পিকারের সঙ্গে দেখা করবে এবং আমি নিশ্চিত যে তুমি তাঁর স্নেহভাজন হবে যেমন তোমার বিনয় ও আন্তরিকতা আমাদের ভালবাসা অর্জন করেছে।'

জীবনে অনেকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পেয়েছি কিন্তু প্রফেসর ফুশের আন্তরকিতায় ভরা এই চিঠিখানা আমার জীবনে এক বহুমূল্যবান সম্পদ হয়ে আছে। এটি নিছক প্রশংসাবাদ নয় এর মধ্যে সিঞ্চিত হয়ে আছে ফরাসী অধ্যাপকদের ছাত্রদের প্রতি সহজাত অপরিসীম স্নেহ ও শিক্ষার সফল পথে তাদের এগিয়ে দেবার ঐকান্তিক আগ্রহ।

যুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিভরা ভবনে ভবনে ক্রোধ, ঘৃণা ও জিঘাংসার মহামারী সংস্কৃতি ও বিদ্যার পীঠস্থানকে কোন এক বিগতদিনের উপসংহারে ঠেলে দিল। জ্ঞানানুধ্যায়ী সক্ষম শিক্ষক ও ছাত্ররা নাট্যমঞ্চে রূপ পরিবর্তনের মত ত্বরিতে হিংস্র যোদ্ধায় পরিণত হলে আর বৃদ্ধ অধ্যাপকেরা আশঙ্কা ভীতি ও হতাশাকে সঙ্গী

করে গ্রামান্তরে গিয়ে আসন্ন দুর্যোগের অপেক্ষমান হয়ে রইলেন। দেবদেবীর দর্শনলাভ আর ঘটল না—গবেষণার পাতাগুলি শূন্য রয়ে গেল।

যুদ্ধের পর ইয়োরোপে ফিরে প্রফেসর ফুশে জীবিত সংবাদ পেয়ে পারীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তাঁর কি আনন্দ!

Classical Indian Sculpture বইটি ছাপা হলে তাঁকে কপি পাঠাতে তিনি শুধু প্রশংসাবাদ নয় নানারকমের মন্তব্য ও ভ্রম সংশোধনের কথা লিখলেন যাতে পরের সংস্করণে বইটির উন্নতি সাধন হয়।

১৯৫২-তে Indian Metal Sculpture পাঠালে তিনি লিখলেন, 'তোমার নতুন বই মনে হচ্ছে বেশ ভাল হয়েছে, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় ছবিগুলি ভাল করে দেখতে পারি নি। তবে লিখিত অংশটি আমার স্ত্রী পড়ে শুনিয়েছেন। ডাক্তারে বলেছে, চোখ অপারেশন করলে ফের ভাল দেখতে পাব এবং তারপর ছবিগুলি দেখে তোমায় সবিস্তার মন্তব্য পাঠাব।'

এর বহু পূর্বে অধ্যাপক ফুশের বয়স আশীর অনেক উঁচুতে উঠলেও তিনি এই প্রথম জানালেন যে, 'আমার মনে হচ্ছে বোধহয় এইবার বার্দ্ধক্যের শয়তান আমাকে স্পর্শ করতে আরম্ভ করেছে।'

ফুশে মারা গিয়েছেন মাত্র কয়েক বৎসর। শুনলাম তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত এঁ্যাস্তিতুত-এর অধিবেশনে সমানে উপস্থিত থাকতেন। আমার মনে যেন বিশ্বাসই হয় না যে তিনি আর জীবিত নেই। এখনও ভুলে মনে করি যে পারীতে গেলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

এঁ্যাস্তিতুত-এ গবেষণায় ব্যাপৃত অন্তেবাসী ও অধ্যাপকরা ছাড়া দেশান্তর থেকে আগত মনীষী ব্যক্তিদের শুভাগমনে মাঝে মাঝে বিশেষ অধিবেশন করে তাঁদের ভাষণ শোনা যেত।

একবার এক খ্যাতনামা ভারতীয় তথা বাঙালী অধ্যাপক সোরবন্-এ

আসায় তাঁর সম্মানার্থে তাড়াতাড়ি ধারাবাহিক কাজ ভেঙে এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হল। তিনি ভারতীয় দর্শন ও মিস্‌টিসিzম্‌ সম্বন্ধে বলবেন বলে মুখবন্ধে শ্রোতাদের প্রকারান্তরে জানালেন যে ইয়োরোপীয়রা মূলত পার্থিব ভোগসুখপরায়ণ অতএব তাঁদের পক্ষে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুভূতিকে উপলব্ধি করা মুস্কিল হবে।

আমাদের দেশে অনেকেই যাঁরা ওদেশে সফর করেন তাঁদের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কথা বাজারে প্রচার করতে দেখা যায়। আমাদের অধ্যাত্ম দর্শনে দখল না থাকলেও শিক্ষিত ইয়োরোপীয়রা ইয়োগীর দেশের লোকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছুটা অন্যতর হবে আগেই এ ধারণা করে নেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তিটার সঙ্গে আমাদের দেশীয়দের মারফতে তাঁদের যখন সাক্ষাৎ পরিচয় হয় তখন তাঁরা বেশ কিছু বিস্ময়ান্বিত এবং আড়ষ্ট হয়ে যান।

ইয়োরোপীয়দের মধ্যেও যে জীবনের প্রতি অপার্থিব একটি দার্শনিক দৃষ্টি থাকতে পারে এবং তাঁরা তার দ্বারায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন এর দৃষ্টান্ত খুব অবিরল নয় কিন্তু তাকে দেখবার ও চেনবার মত দৃষ্টি বা আগ্রহ আমাদের প্রাচ্য আধ্যাত্মবাদী পর্যটকদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই অধিবেশনে ভারতীয় ছাত্ররা বক্তার এরূপ রূঢ়োক্তিতে বেশ লজ্জিত ও বিচলিত হয়েছিলেন কারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফরাসী অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ।

আগত অধ্যাপক মহাশয়কে পারী দেখানর ভার আমার উপর ভারতীয় ছাত্রদের তরফ থেকে ন্যস্ত করা হল কারণ আমাদের দেশের সাধারণ ধারণায় যে ছাত্র আঁকে বা মূর্তি গড়ে তার হাতে নষ্ট করবার মত অফুরন্ত সময় থাকে।

দেশী সাধারণ টুরিষ্টদের পারী দেখান খুব বিড়ম্বনার ব্যাপার হোত না কারণ তাঁদের ওদেশী আচার ব্যবহারের কি রকম ভব্যতা রক্ষা করা উচিত জানালে তাঁরা সেইমত শুধরে অভ্যাস করে নেবার চেষ্টা করায়

আপত্তি জানাতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের গণ্যমান্য যাঁরা আসতেন তাঁদের যদি বলা হোত যে আমরা দেশে সাধারণত যেমন গলাবাজী করে কথাবার্তা বলি সে রকম ভাবে কথা বললে, এমন নিনাদ বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনতে অনভ্যস্ত এদেশীয় শ্রোতাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, তাহলে তাঁরা এই স্পর্ধাজনক উক্তিতে প্রস্তাবকারীকে বিশেষ ভুরু আর চোখের ভঙ্গিতে প্রায় ভস্ম করবার ব্যবস্থা করতেন। চা, স্যুপ ও স্থূল খাদ্য গ্রহণের সময় ফু-রু-রু-প, চক্ চক্, সপসপ ইত্যাদি শব্দে ভোজনের চোষণ, নিষ্পেষণ ও নিষ্কাষণের ঐকতান আওয়াজ এবং ব্যাঘ্র ও গো মহিষাদিকে লজ্জা দিতে পারে এমন মুখব্যাদনে দন্ত জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের কসরতে ভোক্তব্যের রকমারী ওলটপালট যে এদেশীয়দের অতিশয় দৃষ্টিকটু লাগে তা জানালে বলতেন, 'আমাদের খুশি যে আমরা দেশীয় সামাজিক আচারে চলব, ওরা আমাদের দেশে গিয়ে কি আমাদের আচার অভ্যাস নকল করে?'

এ যুক্তি আমি মেনে নিতে রাজী যে ইয়োরোপীয়রা অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে আমাদের মত পারদর্শী না হলেও আপন জীবনের চারিপাশের পরিবেশকে পরিস্কার ও সুন্দর রাখতে চায় এবং তাদের পক্ষে আপন ঘর, গ্রাম ও শহরকে আঁস্তাকুড় ও আস্তাবলে পরিণত করে সুখ অনুভব করা অসম্ভব হবে বা হাঁচি, কাশি ও অন্যান্য শারীরিক বিষ্ফোরণের আস্বাদ আশেপাশের সকলকে বিতরণ করার অভ্যাসে তাদের রীতিমত বেগ পেতে হবে। পথে চলতে বা বিরামে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে ওয়্যাখ, খ্যাঃ প্রভৃতি নিষ্ঠিবন উদ্গারের বজ্রধ্বনি সহকারে ইমারত ও বাসগৃহের কোণগুলিকে পিকদানীতে পরিণত করা কিংবা নাসিকানিসৃত সর্দিকে কেতাদুরস্ত আঙুলে নিষ্কাষণ ও সেই লালাসিক্ত আঙুল নাগালে পাওয়া দেওয়াল থাম বা আসবাবে ঘষে শুকিয়ে সাফ করে নেওয়া, আমাদের মত দার্শনিক দৃষ্টির অভাবে কোন দিন তারা অভ্যাস করতে পারবে না।

অধ্যাপক মহাশয় আমাদের উপযুক্ত দেশাচারের অনেকগুলি গুণকে

পারীতে থাকাকালীন সযত্নে বজায় রেখেছিলেন এবং জাতীয়চরিত্রবিহীন আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে বেশ বিব্রত বোধ করতাম।

পারীর সুবিখ্যাত রাজপথ সাঁzেলিzে-তে বিগত যুদ্ধের আগে দুটি প্রসিদ্ধ ক্যাফে তিরল ও উঙ্গারিয়া ছিল টুরিষ্টদের আকর্ষণ। এ দু'টি স্থানেই অতি অল্পমুল্যের পানীয় নিয়ে সারাদিন সন্ধ্যা ও গভীর রাত পর্যন্ত সুইস্ গ্রাম্য সঙ্গীত ও নৃত্য বা হাঙ্গেরিয়ান জিপ্সি বাদ্যবাদন যতক্ষণ খুশী শুনে চিত্তবিনোদন করা যেত। অধ্যাপক মহাশয়কে নিয়ে গেলাম উঙ্গারিয়াতে এক সন্ধ্যায়!

তিনি আশেপাশে তাকিয়ে বললেন, 'এখানে সবাই বসে দেখছি মদ খাচ্ছে, জায়গাটিতে বেশীক্ষণ বসাটা কি নিরাপদ হবে?'

জানালাম যে ফ্রান্সে মদ ছাড়া অন্য পানীয় বড় কেউ পান করে না। একমাত্র পরিপাক শক্তি বিকল হলে লোকে এখানে জলপান করে থাকে কিন্তু সে সাধারণ কলের জল নয় ভিসি ও অন্যপ্রকার হজম সাহায্যকারী হাকিমী বারি এবং তা কিনতে শরাবের চেয়ে বেশী দাম লাগে। এত মদ খেয়েও এদেশে কেউ মাতলামি করে না। এখানে লোকে মদিরা পান করে একমাত্র পানীয় হিসাবে আর আমাদের দেশে লোকে মদ খায় মাতাল হবার উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে আমাদের পাশে খালি টেবিলে একটি সুশ্রী তরুণী এসে চেয়ারে বসল। অধ্যাপকের দৃষ্টি তার দিকে ধাবিত হয়ে একেবারে নিষ্পলক নিবদ্ধ হয়ে গেল এবং সে দৃষ্টিতে মিস্টিসিzম্ বা দার্শনিক কিছুর আভাষ ছিল না।

আমাকে বলতে হল যে অমন করে কোন তরুণীকে চোখের চাউনীর মারফতে উচ্ছিষ্ট করার প্রচেষ্টা এদেশে অতি অভদ্র আচরণ বলে গণ্য করা হয়।

তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে বললেন, 'সে কি হে, আমি তো শুনেছি এদেশে মেয়েদের দিকে সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে অগ্রসরে কোন বাদ-বিচারের বালাই নেই আর আমি মেয়েটির দিকে একটু তাকিয়েছি

বলে অভদ্রতা হয়ে গেল! আহা যেন সরস্বতীর মত রূপ, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না।'

বললাম, অচেনা মহিলার সঙ্গে বিনা কারণে ডেকে আলাপ করান এদেশে চলে না।

তিনি বললেন, 'ইয়ংম্যান, তোমার সাহসের অভাব দেখে আমি তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হচ্ছি।'

তারপর তাকে মাদমোয়াজেল, মিস্ বলে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে দিলেন।

আমি তাঁর কাণ্ড দেখে তো হতবাক।

মেয়েটি ভাঙা ইংরাজীতে বলল, 'আপনি কি আমাকে ডাকছেন?'

অধ্যাপক বললেন, 'তুমি ওখানে একা বসে কেন, আমাদের টেবিলে এস।'

সে বললে, 'ধন্যবাদ, আমার ছেলেবন্ধুর অপেক্ষায় আছি, সে এখুনি এসে পৌঁছাবে।'

তিনি বললেন, 'তাতে কি হয়েছে, সে এলেও আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে পারবে।'

ঘটনা অনেকদূর গড়াচ্ছে দেখে ফরাসী ভাষায় তরুণীকে জানালাম, যে আমার সঙ্গীর এই পাগলামীতে যেন কিছু মনে না করেন কারণ তিনি একটু বেশী মাত্রায় পান করায় একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

সে হেসে বলল. 'তা ডাকার ঘটা দেখেই বুঝেছি' এবং উঠে দূরের একটা খালি টেবিলে স্থান পরিবর্তন করল।

অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যাফেতে মা-সরস্বতীদের রূপ দর্শন ছাড়া তাঁর আর কিছু পারীতে দেখবার ইচ্ছে আছে কিনা।

তিনি প্রশ্ন করলেন, কি কি এখানে দেখা উচিত?

প্রস্তাব করলাম, প্রাচীন গীর্জা, প্রাসাদ, বিখ্যাত সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারগুলি দেখা উচিত।

কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব পছন্দ হল না কারণ তিনি তো লণ্ডনে সেন্ট পল্‌স্‌ গীর্জা ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখেছেন। তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই শহরে এসেছেন কাজেই নতুন অন্য কিছু দেখতে চান যাতে তাঁর বিশেষ রকমের চিত্তবিনোদন হতে পারে।

তাঁকে নিয়ে গেলাম ক্যাসিনো দে পারীর রঙ্গালয়ে। সেখানে তিনি সুবেশী স্বল্পবেশী ও উলঙ্গিনী সুন্দরীদের লাস্য নৃত্য ও গীত খুব রসের সঙ্গে উপভোগ করলেন।

কিন্তু বেরিয়ে এসে বললেন, এর চেয়ে নিশ্চয়ই আরো উদ্দীপনাময় কিছু দেখার জিনিস আছে এবং রসিকতা করে জানালেন, 'বুঝছ তো হে, আবার তো ফিরে যাব দেশের সেই রঙতামাশাবিহীন একঘেঁয়ে জীবনে আর ঘরেতে সেই আটপৌরে গৃহিণীর বিরস সাহচর্যে। এতদূর এতকষ্ট করে যখন এলাম একটা বিশেষ কিছু ভোগ করে যাই যা চিরদিন মনে থাকবে।'

বললাম, 'ক্যাসিনো দে পারীর চেয়ে ওই ধরনের আরো উদ্দীপনা-পূর্ণ কিছুর পরিচয় পেতে গেলে তাঁকে যেতে হবে অন্য বিশেষ রঙ্গালয়ে যেখানে এই নগ্না সুন্দরীদের দূরে বসে দূরবীন দিয়ে দেখতে হয় না, হাতের নাগালে তিনি তাদের স্পর্শসুখও উপভোগ করতে পারবেন এবং তার জন্য রাস্তা দেখাতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না কারণ এখানে সর্বত্র সে ভোগালয়গুলির সামনে লাল বর্তিকা দিয়ে চিহ্নিত করা।'

তিনি এই শুনে আমায় প্রচুর গালিবর্ষণ করলেন এবং তার মর্মার্থ হল এই যে আমরা ছাত্ররা যুবকজীবনকে সব রস ও উপাদান দিয়ে ভোগ করার অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছি বলে তারি দম্ভে এক বৃদ্ধের বিরস জীবনকে নিয়ে রহস্য করবার সুযোগ নিলাম।

অধ্যাপক দেশে ফিরবার আগে তাঁর বিরস জীবনে পারী থেকে উদ্দীপনাপূর্ণ কিছুর স্বাদ নিয়ে ফিরেছিলেন কিনা জানি না কারণ তাঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।

কাগজের মারফতে জানলাম যে তাঁর ইয়োরোপে ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করে সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছিলেন চরিত্রনাশের প্রলোভনভরা শহর পারীতে ভারতীয় যুবক ছাত্রদের ব্যাভিচারের এক বিবরণীর।

লুভ্‌র

ইল্‌ দ লা সিতের দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে স্যেন নদীর প্রসারিত বাহুদুটি মিলে গিয়েছে, জলের সেই বিস্তারকে ডিঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোঁদেযার সেতুটি। এই সেতুর বাঁদিকের মুখে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর অপর পারের কিনারা ধরে চলে গিয়েছে লুভ্‌র প্রাসাদের গাঢ় ধোঁয়া রঙের একটানা ইমারত যার স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে ইতিহাসের কত কাহিনী—কত রাজন্য শক্তির উত্থান ও পতনের উচ্ছ্বাস, কত ব্যক্তি ও জনগত আশা ও হতাশায় হৃদয়ের স্পন্দন।

দিনের পর দিন কর্মান্তে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে বেঞ্চে বসে দেখতাম দিনের নিবে-আসা আলোয় ঘোলাটে আকাশের পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে লুভ্‌র। এই সীমারেখা ধরে চোখ যেন দেখত কোন এক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জানোয়ারের শায়িত মূর্তি যা বার্দ্ধক্যের জরায় শক্তিহীন এবং এর শেষ নিঃশ্বাস যেন যে কোন মুহূর্তে নির্গত হয়ে গিয়ে একটা প্রাণহীন জড়ে পরিণত হবে।

রাস্তার আলোগুলি সহসা জ্বলে উঠলে মনে হয় তার গায়ের পুরু পর্দার খাঁজগুলিতে যেন কাঁপন লাগল। প্লেন গাছের চূড়ার উপরে দৃশ্যমান টাওয়ার ও চিমনিগুলি বাতাসে উড়ে যাওয়া কুয়াশার ফাঁকে আলোর আভায় দেখলে মনে হয় যেন দুলছে।

ইল্‌ দ লা সিতের দ্বীপটিতে ছিল পারী শহরের আদি পত্তনী এবং এই ভিটেয় বাস করত 'পারিসাই' জাতি যাদের পরিচয়ে এই নগরীর নামকরণ হয়েছিল। রোমানরা এ অঞ্চলে পৌঁছাবার আগে একে বলা

হত 'লুতেতিয়া'। নরম্যাণ্ডি, রাইন্‌ল্যাণ্ড ও ব্রিটানী থেকে পুবে দক্ষিণে অভিযানকারীদের কিম্বা ইয়োরোপের দক্ষিণ-পূর্বের বাসিন্দাদের উত্তর পশ্চিম সীমানায় পাড়ি দেবার চলতি পথের মাঝে পড়ত এই দ্বীপটি ও এর আশেপাশের এলাকা।

অনেক সময় বন্যায় ডুবে যাওয়ার ফলে বিজয়ী রোমানরা ইল্‌ দ লা সিতের ডাঙা পরিত্যাগ করে নদীর বাঁ দিকে মঁ সাঁ জেনভিয়েভের উঁচু টিলায় প্রাসাদ ও সার্বজনীন স্নানাগার নির্মাণ করে শহর বানিয়েছিলেন। পরে ফ্র্যাঙ্ক সম্রাট ক্লোভিস-এর আমলে (পঞ্চম শতাব্দি) গল রাজ্যে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ওই দ্বীপটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি ক্যাথেড্রাল্‌ ও প্রাসাদের প্রতিষ্ঠায় পারী একাধারে ধর্মসংঘ-শাসিত ও সম্রাটাধীন এক রাজধানীতে পরিণত হল। এর পর পরি-বর্দ্ধিত ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে নির্মিত প্রাসাদ হর্মে সুশোভিত এই ঐশ্বর্যশালী শহরকে লুটে নিতে এল কত দুর্দ্ধর্ষ জাতিরা এবং কেবল স্যেন নদীর আড়াল দিয়ে তাদের ঠেকান ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হওয়ায় কাপেত বংশীয় নৃপতি ফিলিপ অগুস্ত (ত্রয়োদশ শতাব্দি) পারীর চারিদিকে প্রাকার তুলে ঘিরে দিলেন। তিনি এর দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে নদীর ডান দিকে নগর সংরক্ষার প্রহরী স্বরূপ একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিলেন 'লুভ্‌র'। তারপর অগুস্তর এই দুর্গ পরবর্তী রাজাদের রুচি অনুযায়ী রূপান্তরে যোদ্ধা প্রহরীর চেহারা বদলে ক্রমে মনোরম সাজ নিতে শুরু করল।

ষোড়শ শতাব্দি থেকে ফরাসী নৃপতিরা এই প্রাসাদে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। রাজসম্মান উপযোগী রাজপুরী নির্মাণার্থে ফরাসী নৃপতি প্রথম ফ্রাঁশোয়া লুভ্‌র-এর পূর্ব আকারের সংস্করণ ও নূতন অংশ নির্মাণ করেছিলেন। পূর্বদিকের অংশে তাঁর রাজত্বকালিন প্রবর্তিত রেনেসাঁস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শৈলী নমুনা সগর্বে আজও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে।

ফ্রান্সে প্রটেস্ট্যান্ট দলের সূচনা প্রথম ফ্রাঁশোয়ার সময়ে দেখা দেয়

এবং তাকে দমন করে নিশ্চিহ্ন করবার তিনি দৃঢ় ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনের সূত্রে ছিল, পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য ও বিলাস ভরা ক্যাথলিক আরাধনায় কপট ধর্মাচারের তীব্র প্রতিবাদ কিন্তু ধর্মের দোহাই-এ আপন স্বার্থান্বেষী রাজ-পরিবার ও পারিষদবর্গ পরস্পরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামে লিপ্ত থেকে সারা দেশকে এক ভীষণ আলোড়নভরা ধ্বংসের যজ্ঞকুণ্ডে পরিণত করেছিলেন। রাজ্ঞী ক্যাথরিন মেদিচির আমলে লুভ্‌র-এর অপরদিকে তুইলারি প্রাসাদ গড়ে উঠতে থাকে এবং এর ক্রমবর্ধিত কলেবর রাজা চতুর্থ আঁরির সময় লুভ্‌র-এর পাশে ভিড়েছিল।

প্রকাশ্যভাবে চতুর্থ আঁরি প্রটেস্ট্যাণ্টদের প্রথা ছেড়ে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর আসল ধর্মাসক্তি সম্বন্ধে সদা সন্দিহান ক্যাথলিক দলের একজন তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে লুভ্‌র-এর অদূরে।

রাজ্ঞী ক্যথরিন-এর যে বিশেষ প্রবল কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ছিল তা নয়। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে নিজের রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ ও সবল রাখা। তাই তিনি প্রতি বিপক্ষ দলকে পারম্পরিক ভাবে সমর্থন ও বৈরীতায় এককে অন্যের সঙ্গে বিবাদ ও সংগ্রামে লিপ্ত করে তাদের সহজে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

লুভ্‌র-এর প্রাচীন অংশের অদূরে সাঁজেয়ারমাঁ লক্সেরোয়ার সুশোভন গীর্জাটি। প্রাসাদের সামনে এবং গীর্জাটির প্রাঙ্গনে সেণ্ট বারথোলোমিউর দিনে ক্যাথরিনের আশ্বাসে আহূত ইউগোনোদের (প্রটেস্ট্যাণ্ট) তাঁরই আজ্ঞায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। লুভ্‌র-এর বড় বড় থাম লাগান অলিন্দে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিন দ্য মেদিচি উপসংহার পর্যন্ত দেখেছিলেন এই নরমেধ যজ্ঞ।

যদিও এই বিরাট হত্যার পিছনে না ছিল নীতি বা ধর্মের কোন উচিত কৈফিয়ৎ, তদানিন্তন পোপ ক্যাথরিনকে ক্যাথলিক বিরোধীদের বিনাশের এমন নিখুঁত নিপুণ আয়োজনের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন

এবং লোকে যাতে এই ঘটনাকে আনন্দসূচক দিনের স্মৃতি হিসাবে মনে অক্ষুন্ন রাখতে পারে তার জন্য বিশেষ স্মারক চিহ্ন সম্বলিত পদক তৈরী করে তার ব্যাপক বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই বর্বরতায় আপাত বিপক্ষের শ্রেণীতে দোষী বা নির্দোষী কাউকে বাদ দেওয়া হয় নি এবং গ্যাসপার কলিইনির মত স্থির ধর্মী দেশাত্মবোধি বিচক্ষণ বীরকেও আপন চক্রান্ত সিদ্ধিতে বলিদানে ক্যাথরিনের একটুও দ্বিধা ছিল না।

মানুষের এই নীচ নৃশংসতার দ্রষ্টা ছিল লুভ্‌র-এর সামনের দেওয়াল ও থামগুলি, ঘৃণা ও লজ্জায় তাই বুঝি তারা আজও আত্মগোপন করতে চায় বিবর্ণ ও ধূসর আস্তরের অন্তরালে।

রাজা চতুর্দশ লুইয়েয় নাবালক অবস্থায় তাঁর অভিভাবক হওয়ার ক্ষমতালোলুপ রাজ আত্মীয়দের মধ্যে কত ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের গুপ্ত ও প্রকাশ্য আয়োজনের অধিবেশন হয়েছিল এই প্রাসাদের ঘরে ও আঙিনায়।

প্রাপ্ত বয়সে লুই যখন শাসনভার আপন হাতে তুলে নিয়ে বিজয় গর্বে রাজধানীতে ফিরে এলেন সেই উপলক্ষ্যে লুভ্‌র-এর গ্রাঁ গ্যালারীর সুদীর্ঘ হলে যে নাচ গান ও ভোজের মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল তার অনন্দধ্বনির নিনাদে প্রাসাদের দেওয়ালগুলি প্রতিধ্বনির ঐকতানে নিরপেক্ষ ছিল না।

লুভ্‌র প্রাসাদের অন্তরমুখী অংশে বহু থামে ভর করা লম্বা একটানা যে বারান্দা চলে গিয়েছে তার স্রষ্টা ছিলেন চতুর্দশ লুই।

রাজকীয় গৃহ-সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের বিরাট ঘটনা ছাড়াও অনেক ছোটখাট প্রহসন যা রাজা রাণী ও তাঁদের সমগোত্রীয় পারিষদের জীবনকেও এড়িয়ে যায় না তার কত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল এই প্রাসাদের কত কক্ষে ও অলিন্দে।

একদিন এই লুভ্‌র-এ লুই-এর সর্বসেনাধক্ষ্য মার্শাল তুরেন অতি ভোজন ও পানজনিত শ্লথ শরীরকে একটু সজীব ও সবল করে নেবার

উদ্দেশ্যে শয্যাবাসেই এক অলিন্দে দাঁড়িয়ে বায়ু সেবন করছিলেন। পিছন থেকে না চিনতে পেরে এক পরিচারক তুরেনকে তার বন্ধু পাচক ভেবে, 'কি zাঁ কেমন আছিস' বলে তাঁর পিঠে লাগিয়ে দেয় বিরাশী সিক্কার এক কিল। তিনি ফিরে দাঁড়াতে চিনতে পেরে অপ্রস্তুত, অপরাধী ও নতজানু ভৃত্য যখন তুরেন-এর ক্ষমা প্রার্থনা করল তিনি শুধু বলেছিলেন—কিলটি বেচারী zাঁর জন্যে হলেও বেশ শক্ত ও বেদনাদায়ক।

ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক অংশগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় পারী এই প্রথম সম্পূর্ণ সংযোজিত ও পরিপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়েছিল।

সম্রাট নাপলেয়ঁর শাসনাধীনে নিও-ক্লাসিক্যাল রূপায়নে রাজধানী পারী ছদ্ম পুরাতনের এক অভিনব সজ্জায় বিভাসিত হল। এ যেন এক নূতন বিজয়দীপ্ত সিzার-এর উপযুক্ত রাজধানী এক নূতন রোম। নাপলেয়ঁর আওতায় শুধু যে বাইরের সাজে লুভ্‌র-এর পরিবর্তন হল তা নয় বিজিত দেশের শিল্পরত্ন সম্ভারে তিনি ভরিয়ে দিলেন এর সারা ঘরগুলি।

আজ বহুজনে নাপলেয়ঁকে অভিহিত করে পরধন লুণ্ঠনকারী দস্যু বলে কিন্তু তাঁর দেওয়া শিল্প সম্ভারকে লুভ্‌র থেকে বাতিল করে দিলে অবশিষ্ট সংগ্রহ হয়ে যাবে ম্লান।

সম্রাট তৃতীয় নাপলেয়ঁ নূতন প্রাসাদ ও উদ্যানের পরিকল্পনা ও নির্মাণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। লুভ্‌র তাঁর রুচির প্রলেপে আর একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হল। তাঁরই নির্দেশে লুভ্‌র-এর গায়ে লাগা তুইলারি প্রাসাদের প্রসারিত অংশদুটিকে সংলগ্ন করে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছিল।

পারী কমিউন-এর প্রকোপে তুইলারী প্রাসাদ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়ে যায় কিন্তু লুভ্‌র তৃতীয় নাপলেয়ঁর দেওয়া সাজে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে।

লুভ্‌র এর বাইরের সাজে যেমন রেনেসাঁস থেকে আরম্ভ করে

নিও-ক্লাসিক ও পরবর্তী মিশ্রশৈলীর প্রভাব দেখা যায় তার আভ্যন্তরিক অলঙ্করণেও তেমনি বিভিন্ন শৈলী ও রুচির নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে।

অন্যান্য প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারে দর্শকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কামরার গাত্রাভরণ ও অলঙ্করণের রূপ অনেকের নজরে পড়ে না। বেশীর ভাগ টুরিষ্টদের পারী দেখার মেয়াদ এক সপ্তাহ কি তার চেয়ে কম এবং বহু দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যে অসংখ্য অমূল্য শিল্পরত্ন সমারোহময় লুভ্‌র মিউজিয়ামকে দেখতে হয় হয়ত কেবল একদিনে। এই মন-ঠকান শিল্প দেখার অভিজ্ঞতায় দ্রষ্টার মনে থেকে যায় হয়ত কেবল মোনালিসার হাসিমুখ, ভেনাস দ মিলোর মূর্তি ও আরও দু' একটা কিছুর আবছা স্মৃতি।

কত দেশের কত শতাব্দির শিল্প নিদর্শন কত জাতির জীবনের সজীব ছবি দেখে পরিচয় করে নেওয়া যায় এই লুভ্‌র এ যদি দর্শকের থাকে সময়, ধৈর্য ও দেখে আনন্দ পাবার মত দৃষ্টি।

এর এক গ্যালারীতে একদিন কাটালেও মনে জীবন্ত জেগে উঠবে বেশ কয়েকশত বছরের মানব-সভ্যতা ও জীবন, এবং কতযুগের রাজধানীতে রাজপথে, প্রাসাদে, গ্রামে ও কুটিরে ভ্রমণ করা চলবে, সাধারণ গৃহী ও গৃহিণীর অন্তঃপুরে তাঁদের জীবনের গোপন দৃশ্যে উঁকি দেওয়া যাবে অবাধে, কত শিল্পীর কর্মশালায় বসে গুজবে মন প্রমোদা-প্লুত হবে।

লুভ্‌র-এর গ্যালারীতে মধ্য যুগের ফরাসী গীর্জার সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠে কোন রাজন্যের বিবাহে, সন্তানলাভে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধানে। কাঠ ও পাথরে সূক্ষ্ম কাজের ঝিলিমিলি দেওয়া কুলুঙ্গী থেকে ম্যাদোনা, এঞ্জেল বা সেণ্ট-এর সদা প্রসন্ন, শান্ত ও স্বর্গীয় মুখচ্ছবি দর্শককে নিয়ে যায় মর্তের ঊর্দ্ধে কোন আর এক অব্যক্ত জগতে।

কোন মৃত নাইট-এর শায়িত মূর্তি সম্বলিত সমাধির চারিদিকে

শোকাবনত মংক্ ও নান্‌দের প্রার্থনারত রঙিন প্রতিমাগুলি জানিয়ে দেয় কত অভিযান ও বীরত্বের কাহিনী।

অন্য কোন গ্যালারীতে মিশরের গ্রেনাইট্ পাথরে খোদিত অবেলিস্ক, সারকো-ফেগাই, স্ফিঙ্কস্ এবং পশু ও মানবাকৃতির মিশ্রিত রূপে দেবদেবীর নানাবিধ মূর্তি, পত্নী ও পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত ফ্যারাওগণ, প্রাসাদের পারিষদ ও কর্মচারিবৃন্দ, পিরামিড-এর মৃতপুরীর অন্ধকার ছেড়ে এই নূতন জগতের সামনে কত সুদূর অতীতের পুরাতন জীবনের পুনরাভিনয় করে চলেছে।

কান পেতে শুনলে এই মূর্তিগুলি থেকে হয়ত শোনা যায় কত অগণিত বিজিত বন্দী দাসের কশাঘাত নিস্কাষিত আর্তনাদ, ব্যথা ও শ্রমক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ও অস্বাভাবিক আসন্ন মৃত্যুতে হৃদয়ের শেষ আক্ষেপ ধ্বনি।

কোথাও বা স্বর্ণ-রবি-করোজ্জ্বল গ্রীসের অলিভকুঞ্জে ক্রীড়ারত সুঠাম যুবক ও যুবতীরা যেন মায়ায় সহসা থেমে গিয়েছে পাথরের মূর্তিতে, ফাইদিয়াস, প্রাক্‌সিতেলস মাইরন কি পলিক্লিতাস-এর করস্পর্শে। প্যান-এর বাঁশীর সুরে নৃত্যের ছন্দভঙ্গিমা দুলে ওঠে কত ভেনাসের পেলব দেহে। সে বাঁশীর তালের অনুরণন যেন ঝংকৃত হয় এ্যাপো-লোর হাতে লিউট্-এর তন্ত্রীতে আর তাঁর ব্যায়ামপুষ্ট পৌরুষে গর্বিত দেহের পেশাগুলি স্পন্দিত হয় সে সঙ্গীতের তালে মানে। কত রোম্যান রাজ্ঞী নৃপতি, নাগরিক ও নাগরিকারা পাথরে মুর্ত হয়ে ভোগ লালসাময় স্বৈরাচারী জীবনের ছবিকে তুলে ধরেছেন অপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের স্মৃতির পাশে পাশে।

মাইকেল এঞ্জেলোর করা বন্দী দাসের দুমড়ে পড়া মূর্তি-দুটিতে যে বেদনা মূর্ত দেখা যায় কে জানে হয়তো শিল্পীর জীবনে যে বিরাট পরিকল্পনাগুলি প্রকাশের সম্ভাবনা পায় নি এরা তারই এক জমাট ব্যর্থতার অভিব্যক্তি।

আদি খৃষ্টিয় চিত্রাবলীতে চিমাবুয়ে ও জিয়োত্তোর কত ম্যাদোনা ও

জেসাস সোনালী আকাশের দৃশ্য পটে দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার মনকে অভিভূত করেন।

ফ্রাঞ্চেস্কা, বত্তিচেলী, দাভিঞ্চি, এঞ্জেলো, রাফায়েল, কারাভাগ্‌গিয়ো, লাতুর, পুসাঁ্যা, ভাতো, হাল্‌স, রেমব্রাণ্ট, ভারমিয়ের, এল্‌ গ্রেকো, ভেলাথকুয়েথ, গোয়য়া, দাভি, দোলাক্রোয়া, এঁ্যাগ্র, ম্যানে, ম্যনে, সেজান, দোগা, ভ্যান হফ, গগ্যাঁ এবং আরো কত শত ইয়োরোপের শিল্পী-প্রমুখরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের চোখ আর মনের ফাঁদে ধরা দুঃখ, সুখ, ত্যাগ, বিলাস, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্পনা ও জল্পনার কত ছবি ও কত বিচিত্র রূপ।

মার্থ ও গ্যাব্রিয়েল

লুভ্‌র মিউজিয়ামে দর্শকদের জন্য চারটি প্রবেশ দ্বার আছে। পূর্ব প্রান্তের দরজা দিয়ে মিশরীয় বিভাগ থেকে যাত্রা শুরু করা চলে অথবা পশ্চিম প্রান্তে ইয়োরোপীয় মধ্য যুগের ভাস্কর্য-সংগ্রহে আসা যায়। কিন্তু প্রাসাদের মাঝ বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সরাসরি প্রবেশপথ দুটিরই প্রাধান্য বেশী।

এই দুই দরজা দিয়ে প্রত্যহ দর্শকরা আসেন দলে দলে। এর এক থেকে অপর প্রান্তে বিস্তৃত বিরাট ভেসটিবিউল-এ টিকিটের কিওস্ক, হাতের ব্যাগ, পার্সেল, ছাতা ছেড়ে হালকা হবার ব্যবস্থা এবং বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শনের প্রতিলিপি, পোস্টকার্ড, ফটোগ্রাফ, প্লাস্টার ও ব্রোঞ্জ কাস্ট কেনার কাউনটার, সব গ্যালারীর অবস্থান ও সংগ্রহের তালিকা-জ্ঞাপক একটি মডেল ইত্যাদির সমাবেশ দর্শকদের মনকে যেন সংগ্রহশালার বিশিষ্ট আবেষ্টনীতে থাকার জন্যে তৈরী হতে বলে।

লুভ্‌র দেখার আমন্ত্রণে এইখানে দাঁড়াতাম মার্থের অপেক্ষায়।

সে পৌঁছে ভাল দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েই, 'দাঁড়াও, কয়েক মিনিট

এখুনি একটু ঘুরে আসছি' বলে উধাও হয়ে বেশ লম্বা সময় আমাকে অপেক্ষার অসোয়াস্তিতে বিরক্ত করে ফিরত এবং বিশেষ কোন গ্যালারীতে যাবার প্রস্তাবে ও সেখানে গিয়ে ছবি দেখায় ও শিল্পালোচনায় খুব ব্যস্ত হয়ে যেত, যাতে এই সময় নষ্টের জন্য আমি কোন অভিযোগের সুযোগ না পেতে পারি।

পরপর বার দুয়েক এই 'এখুনি আসছি'র পুনরাবৃত্তি হতে রাগত হয়ে বললাম, 'ম্যাদম্যয়জেল্, লুভ্‌র-এ পৌঁছেই তোমার নিত্য এক প্রয়োজনে অতি সম্প্রসারিত যে কয়েক মিনিট কাটিয়ে আসতে হচ্ছে সেটা কি এখানে আসার আগে সেরে এলে ভাল হয় না?'

সে বলল, 'না ম্যঁসিয়, তুমি আমার প্রয়োজনকে আন্দাজ করছ ভুল। লুভ্‌র-এ এলেই সবার আগে একজনের সঙ্গে একটু মোলাকাৎ করবার একটা শর্ত আমার সঙ্গে অনেক বছর ধরে ঠিক হয়ে আছে, সে অভ্যাসটা অকারণে আমি ছাড়তে চাই না। তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে মাপ চাচ্ছি।'

কিন্তু আবার যখন একসঙ্গে লুভ্‌র দেখার ব্যবস্থা হল সে ঠিক আগের মত 'রাগ করো না আমি এখুনি আসছি' বলে উধাও হল।

রাগ ও কৌতুহল এ দুয়ের নির্দেশে তার গতি অনুসরণ করে পৌঁছালাম গ্রীক গ্যালারীতে। চলতে চলতে ভাবছিলাম মার্থের সঙ্গীবিবাগী হওয়ার ঔৎকট্য বোধহয় একটা ভান। তার নিশ্চয়ই আছে সবারই মত এক বিশেষ সঙ্গী যার সঙ্গে রঁাদেভূর ব্যবস্থা হয় এই লুভ্‌র-এর কোন গ্যালারী দেখার অছিলায়।

এই গ্যালারীতে বহুবার তার সঙ্গে এসেছি এবং গ্রাকশিল্প নিয়ে আমাদের তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে প্রচুর। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে গ্রীক কৃষ্টির দেওয়া বুনিয়াদ পেয়ে পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা ধরে নেন যে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ইয়োরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত। মার্থ এই যুক্তিকে এক রকম ঝগড়া করে জারি করবার চেষ্টা করত।

আমি তাকে ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে চাইতাম যে, যে গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারীর বড়াই আজকের ইয়োরোপবাসীরা করতে চান তার উৎপত্তি ও প্রসারকালীন গ্রীকরা কিন্তু ইতালির উপদ্বীপের ওপারের জগৎ সম্বন্ধে জানতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, কারণ ওইসব দেশের লোকেদের সভ্যতায় তখন বলবার বা জানবার মত কিছু ছিল না। সেযুগের গ্রাকদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপনিবেশের এলাকায় পশুপালন ও চাষবাসে ব্যাপৃত গ্রাম্যজীবনে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর পূর্ব আফ্রিকার শক্তি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করা ছিল তাঁদের একটা উচ্চাভিলাষের স্বপ্ন।

এশিয়া ও আফ্রিকার রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করত বহু ভাগ্যান্বেষী ভাড়া করা গ্রাক সৈনিকরা। ধনরত্ন ও সৌভাগ্যের চিন্তায় তাঁদের দৃষ্টি ধাবিত হোত এজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে। শুধু তাঁরা নন গ্রীকের দেবতারা ও পৌরাণিক বীরেরাও পাড়ি দিতেন প্রাচ্যের দিগন্তে।

দ্রাক্ষারসের মদিরার তর্পণে পূজা পাবার উদ্দেশ্যে পানে মত্ত মেনাদ্, ফন্, সাতির্, সেণ্টর ও নিমফদের বাহিনী নিয়ে দেবতা দিওনিস্যুস প্রাচ্যের বহু রাজ্য জয় করে পরিশেষে বিজিত ভারতের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন।

শোনা যায় যে বীর আলেকজাণ্ডার-এর ভারত বিজয়াভিযানের পশ্চাতে ছিল সামর্থে দেবতা দিওনিস্যুস-এর সমকক্ষ হবার স্বপ্ন। বহু অভিযান পীড়িত গ্রীকেরা আপন সত্বাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার শারীরিক চর্চায় দৈহিক শক্তিকে যতখানি বর্দ্ধিত ও কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে তাতে চেষ্টিত থাকতেন এবং এইভাবে অর্জিত অমানুষিক দৈহিক বলে বলীয়ান সংখ্যালঘিষ্ঠ বীরেরা যখন বৈরীর বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করতেন তাঁদের শৌর্যে ও জয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ জনসাধারণ দেখত তাঁদের স্বরূপে দেবতার আবির্ভাব।

তাই কবি হোমার-এর কাব্যে কত স্বর্গের দেবদেবীরা মর্ত্যের মানুষের

রঙে ও খেলায় মিশে কত লীলা-খেলা করে গেলেন। শক্তির উন্মেষে উদ্বেলিত পেশীর ছন্দে লীলায়িত সুন্দর মানবদেহে অবতীর্ণ হলেন জিয়ুস্, এ্যাপোলো, হেরা, আথেনা পোসেইদন, এ্যাফ্রোদাইতে ও অন্যান্য দেবদেবীরা পাথর ও ব্রোঞ্জের মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করে।

কিন্তু গ্রীক ভাস্করের গড়া এই দেবমূর্তিতে মানবাতীত বল ও সৌন্দর্য ফুটে উঠলেও তার মধ্যে বিকাশ পায় নি শক্তিমত্তার দম্ভ বা রূপাভিমান। মানবাকৃতি নিহিত কেবল এক স্বর্গীয় মহিমাভরা এই দেবতারা ভক্ত ও পূজারীদের অর্ঘ্য, আহুতি, পুষ্প, মাল্য, পানে, আহারে, নৃত্যে, সঙ্গীতে মোহিত হয়ে মর্ত্যকে যেন স্বর্গের ভ্রমে গ্রীসের পর্বতশৃঙ্গে, প্রান্তরে নদীতটে, তোরণে, স্তম্ভে, মন্দিরে ও প্রাসাদে আসন পরিগ্রহ করেছিলেন স্থায়ীভাবে।

সেকালের গ্রীসের সেরা ভাস্করশিল্পী ফাইদিয়াস, মাইরন পলিক্লিতাস ও প্রাক্সিতেলস্-এর রচিত অপরূপ সব মূর্তিগুলিই বোধহয় কালের ধ্বংসাবলেপনে অজ্ঞাতের গহ্বরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে আজ কেবল প্রাচীন নকলনবিশী শিল্পীদের করা তাঁদের সৃষ্টির নাম ও স্মৃতি বহনকারী কয়েকটি মূর্তির অনুকরণ মাত্র।

এই নকলকরা মূর্তির রূপ যদি আমাদের মন ও হৃদয়কে সৌন্দর্যের মাধুরী দিয়ে আজ এমন মধুময় করতে পারে, না জানি তাঁদের আসল রচনাগুলিকে দেখবার সুযোগ পেলে রূপভোগানন্দের কোন সাগরে আমরা অবগাহন করে মজে যেতাম। আজ ভেনাস্ দ মিলো কি ভিক্‌ট্রি অফ সামোথ্রাস্ একাধারে মানবদেহের অসীম সৌন্দর্য ও ভাস্কর্য নৈপুণ্যের উচ্চতম উদাহরণ হিসাবে জগতবিখ্যাত হলেও ওই রচনার সমসাময়িক রূপবেত্তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট শিল্প রচনার উদাহরণ হিসাবে এই মূর্তি দুটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আমার ভেঙে হারিয়ে যাওয়া পোরসেলিনের প্লেটটার মত কত মূর্তির খণ্ডিত ভগ্নাংশ স্মৃতির ইঙ্গিতে ভাঙাকে পূর্ণ করে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় কত দেব ও দেবীর জীবন্ত স্বরূপকে।

গ্রীকমূর্তির বহু যুযুধান বীরের আহ্বান, নিম্ফদের হাতছানি, এ্যাপোলোর নিপুণ আঙুলের টানে লায়ার তন্ত্রীতে ধ্বনিত সুরমূর্ছনার মোহ ও এ্যাফ্রোদাইতের উন্মুক্ত রূপের আকর্ষণকে এড়িয়ে আমার চোখ পড়ল মার্থের উপর।

বিরাট জানলা থেকে একফালি রোদ পড়েছিল দুকোণ হয়ে ভাঁজ খাওয়া দেওয়ালের এক কিনারায়। আমার দৃষ্টির আড়ালে পড়া সেই দেওয়ালে রাখা একটা কিছু যেন সম্মোহিত করে মার্থকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

তার স্থির দৃষ্টির কিনারা উপছে অশ্রুধারা দুগণ্ডে প্রবাহিত দেখলাম। আমার অস্তিত্বকে সে দেখলেই না।

তার লক্ষ্যকে অনুসরণ করে দেখলাম সামনে রয়েছে পার্থেনন্-এর মন্দিরে খোদা ঘোড়সোয়ারী বীরদের একটির শুধু প্রায় ভাঙা মুখ যার উপর রোদ্দুরের আভা পড়ে জীবনের স্ফুরণ যেন ঝলকে ঝলকে উদ্ভাসিত হচ্ছিল।

মূর্তিটির সঙ্গে মার্থের অশ্রুধারার সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেই আস্তে আস্তে ফিরে গেলাম ভেস্‌টিবিউল-এ।

সে কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসতে সেদিনের রফা মত ড্যাচ গ্যালারী দেখে দিনটা কাটান গেল।

লুভ্‌র-এ আমার আর এক নিমন্ত্রণে মার্থ ফের 'আসছি বলে' চলল, গ্রীক গ্যালারীতে এবং তাকে অনুসরণ করে দেখলাম সে আবার দাঁড়িয়েছে যৌবনের ব্যঞ্জনায় স্ফুট সেই মুখখানির সামনে। কিন্তু সেদিন অশ্রুধারার বদলে দেখি যে তার চোখদুটিতে হাসির উচ্ছ্বাস আর যেন বাঁধ মানছে না আর কোন প্রচ্ছন্ন কথোপকথনে তার ঠোঁট দুটি ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল।

আমার মনে হল সে নিশ্চয়ই পাগল। এই হেঁয়ালিভরা আচরণ কাউকে ছলনার অভিনয় তো হতে পারে না।

তাকে চমকিয়ে ডাক দিলাম।

কোন বিস্মৃতির ওপার থেকে ধাক্কায় সে বাস্তব জগতে আছড়ে পড়ে বলে উঠল, 'একি তুমি এখানে কেন! ভেস্‌টিবিউলে আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

বললাম, 'মাদম্যয়জেল্‌ অপেক্ষা করতে বলেছ ঠিকই কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করতে তো মানা কর নি। তোমার কোন আপত্তি বা অনুযোগ আজ শুনব না। আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব তোমাকে ঠিকমত দিতেই হবে। এর জন্য যদি আমাদের বন্ধুত্বকে বরাবরের মত ছুটি দিয়ে দিতে হয় তাতেও আমি রাজী আছি। তুমি এই প্রায় ভাঙা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন কাঁদলে এবং একদিন হাসলে কেন? এ কোন রহস্য যে তুমি যেন নীরবে কথা বলছিলে কোন অশরীরীর সঙ্গে।

সে বলল, 'কেঁদেছি, হেসেছি বাগবিতণ্ডা করেছি কার সঙ্গে তুমি তো চিনলে না। ও আমার গ্যাব্রিয়েল্‌। আজ আর গ্যালারী দেখা হবে না। স্যেন-এর ধারে গিয়ে বসি চল, তারপর এ হেঁয়ালির ভাল করে সমাধান করে দেব।'

অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ প্লেন গাছের পাতা ও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে লুকোচুরী খেলে নীচের জমি আর নদীর জলে সোনালী আলোর বুটি ফেলে কত নকশা কাটছিল। এই মেশান আলো ও ছায়ার চাঁদোয়ার নীচে পাতা বেঞ্চে আমরা বসে গেলাম।

মার্থ বলল, 'গ্যাব্রিয়েল আমায় ছেড়ে গিয়েছিল দশবছর আগে এবং এ পর্যন্ত তার কথা আর কাউকে বলি নি।'

সে যে কথা প্রসঙ্গে এই নাম দু' একবার আগে উল্লেখ করেছিল তা স্মরণ করিয়ে তার কথায় বাধা দিলাম না।

সে বলে চলল, 'গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গ্রঁা সালোঁতে এক নাচের সম্মেলনে। আমার পরিচিত এক সখের শিল্পী এই নাচের আসরে যাবার জন্যে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছিলেন কিন্তু

সেখানে পরিচিত ছেলেবন্ধু সঙ্গে কেউ না থাকায় ঠিক পছন্দসই নাচবার সঙ্গী পাচ্ছিলাম না। দু'একজন বৃদ্ধ নৃত্যের নামে আমাকে ধরে জাপটাজাপটিতে প্রায় ভল্লুক নৃত্য করলেন।

'বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে নাচের আসর ছেড়ে চলে আসবার উদ্যোগ করছি এমন সময় 'আমি গ্যাব্রিয়েল্, মাদ্‌ম্যয়জেল তুমি আমাকে নাচবার সম্মতি দিলে ধন্য হব।' বলে সামনে দাঁড়াল ব্লণ্ড ও সুপুরুষ একটি যুবক।

'তার সঙ্গে নাচতে নাচতে ভ্যাল্‌স্‌এর ঘুর্ণিপাকে যে প্রণয় শুরু হয়ে গেল তারি আনন্দস্রোতে আমরা নিজেদের অবাধে ভাসিয়ে দিলাম।

'সে কিন্তু সাধারণ প্রেমান্ধের মত কেবল ভালবেসেই তৃপ্ত ছিল না।

'তার মতে স্ত্রী ও পুরুষের প্রথম ভালবাসার বন্ধনে পরস্পরকে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী দান করার যে নিয়ত নিবেদন চলতে থাকে তার জোয়ারে ভাঁটা না পড়তে দেওয়ার ম্যাজিকটি আবিষ্কার করা প্রেমের সবচেয়ে বড় কথা।

'প্রণয়ের প্রথম জোয়ারে অনেক ব্যক্তিগত মুখ্য রুচিভেদ ও ভিন্ন স্বভাবের স্তর ডুবে যায় সাময়িকভাবে প্রেমের গভীরে। সময়ে ভাল-বাসার উৎসের খরস্রোত থেমে স্থির হলে সেই রুচির ভেদ আর চাপা পড়া স্বভাবের স্তর প্রেমের বন্যার উপরে ভেসে উলট-পালট খেতে থাকে। কারো ভাগ্যে এই ভেসে ওঠা স্তরগুলি যেন বড় বড় আইসবার্গ হয়ে প্রেমের জাহাজ ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে ডুবিয়ে দেয়। তাই সে আমাদের প্রণয়ের গভীরে মনের চেতন ও অবচেতনের তলায় কোন বিবাদী অংশ লুকিয়ে আছে কি না তার আবিষ্কারের চেষ্টা করত।

'যদি বলতাম, এখন সে সবের খোঁজ ছেড়ে দাও যবে সে অংশের উন্মেষ দেখা দেবে তার নিষ্পত্তি তখন করা যাবে। কিন্তু সে নিরস্ত হবার পাত্র ছিল না। সে আমার মুখের দিকে বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যদি বলতাম, 'কি দেখছ।'

'সে জবাব দিত, 'মনে করো না, তোমার মুখের রূপসুধা পান করছি কারণ তুমিও জান আর আমিও জানি যে তোমাকে কেউ সুন্দরী বলবে না। কিন্তু তোমার মুখ চটকদার সুন্দর নয় বলেই এত ভালবাসি কারণ কোন রূপলোভীর চোখ তোমার সৌন্দর্যসুধা অবাধে পান করতে লুব্ধ হবে না বলে। বিধি যদি তোমার মুখের সুচারু ছাঁদ দেবার সময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকেন, গলা থেকে পা পর্যন্ত তোমায় যে সুঠাম মূর্তিতে তিনি গড়েছেন তাতে তাঁর গভীর মনোনিবেশের কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ যে এই সৌন্দর্য অর্ঘ্য পাবে কেবল আমার কাছ থেকে।

'সে আমাকে লজ্জায় রাঙা করে আরও যে কত অন্তরঙ্গ কথা বলতো তা তোমায় আমি বলতে অপারগ।

'গ্যাব্রিয়েলের মতে, প্রাক্সিতেলস্-সৃষ্ট বলে অভিহিত এ্যাফ্রোদাইতের যে টর্‌সো লুভ্‌র-এ আছে আমার দেহ নাকি তারই অনুরূপ।

'সে ছিল এক অদ্ভুত প্রতিভাবান শিল্পী। মূর্তিগড়া আর চিত্রণে তার ছিল সমান দক্ষতা। নিজের দেহকে নিয়মিত ব্যায়ামে সুন্দর সক্রিয় রাখায় তার উদ্যম ছিল প্রচুর। সুপুরুষ সে তা জানলেও তার এ নিয়ে কোন আত্মাভিমান ছিল না। তিন বছরের সান্নিধ্যে আমাদের ভালবাসায় প্রথমে দু একটা আকস্মিক ফাটল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বন্ধ হয়ে ক্রমে একটা নিরেট ও পরিপূর্ণ প্রেমকে আমরা পেয়েছিলাম যার স্বরূপের সবটা সারা অনুভূতি ও আনন্দ দিয়ে নিয়তই ধরা ছোঁয়া যেত।

'এর পর ঠিক হল আমরা বিবাহ করে ঘর বেঁধে হব স্বামী স্ত্রী।

'মূর্তিগড়া ও ছবি আঁকা ছাড়া গ্যাব্রিয়েল্-এর আর এক নেশা ছিল মাঝে মাঝে কোন বিপদসঙ্কুল অভিযানের মাঝে নিজেকে ফেলে দিয়ে তার জয়ের ও উত্তেজনার আনন্দকে উপভোগ করা।

'পরকে তার বাহাদুরী দেখাবার উদ্দেশ্য নয়, এ কেবল নিছক নিজে

একটা উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চলত তার এই দুঃসাহসের সম্মুখীন হওয়া।

'এই সময় শোনা গেল যে এক অধ্যাপক উত্তরমেরুর গবেষণায় কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এক জাহাজে শিগগির পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা একজন শিল্পীকে তাঁর সঙ্গে যেতে আহ্বান জানান যে তাঁদের আবিষ্কারকে চিত্রণে নিপুণভাবে আলেখ্যবদ্ধ করতে পারবে।

'এ অভিযানে বিপদ ছিল, তাই আর কেউ এগিয়ে আসার আগে গ্যাব্রিয়েল্ এ যাত্রায় সাথী হবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

'আমার শত অনুযোগ ও আপত্তি তাকে ঠেকাতে পারল না।

'সে বলে গেল, 'মার্থ, আমার একক জীবনের এই শেষ অভিযান। ফিরে এসে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে সঁপে দেব। জানি এই সাময়িক বিচ্ছেদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার মনে অশেষ কষ্ট দিচ্ছি। এতে আমার হৃদয়ে ও মনে ব্যথা জমেছে প্রচুর তাই অনুযোগে আমার সংকল্পে দুর্বলতা এনে ফেরাতে চেষ্টা করো না। অনুপস্থিত ভালবাসার দিনগুলি যে একেবারে ফাঁকা থেকে যাবে এ ভেবো না, আমার অশরীরী সত্ত্বা তোমাকে ঘিরে থাকবে সর্বদা। সেই সত্ত্বাকে এখনকারমত তোমার জিম্মায় দিয়ে গেলাম, দেখো যেন তোমার সান্নিধ্য থেকে তাকে হারিয়ে ফেল না।'

'সে চলে যাবার পর আমার সামনে থেকে চন্দ্র ও সূর্যের অবসান হয়ে গেল যেন বরাবরের মত, রাত্রি ও দিনের কোন ব্যবধান রইল না। ঘড়ির কাঁটা হয়ে গেল নিশ্চল। তারপর চলে গেল নীরব কয়েক সপ্তাহ।

হঠাৎ একদিন সকালে দেখা সংবাদপত্রের বড় অক্ষরের হেড্‌লাইন আমার চোখে পড়ে ছুরিকাঘাত করল। মুহূর্তে হৃদয়কে মুচড়ে দারুণ নিষ্পেষণে কে যেন আমার নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ করে দিল।

গ্যাব্রিয়েল্‌দের জাহাজ বরফের সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ হয়ে গেছে।

ঊনচল্লিশজন যে যাত্রী ছিল তাদের একজনেরও কোনও হদিস্ পাওয়া যায় নি।

'আমার মন ও হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেল। দু'একদিন পরে যখন এই দারুণ দুর্ঘটনাকে কিছুটা ধারণা করার মত বুদ্ধি ফিরে এল, ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব।

'স্যেন নদীর বিভিন্ন পুলের উপর বসে কতদিন অপেক্ষা করলাম নির্জন ক্ষণের জন্য যখন নিজেকে নামিয়ে দিতে পারব নীরবে সকলের অগোচরে জলের গভীরে এবং একইভাবে জলে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে মিলে যাবে গ্যাব্রিয়েলের শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে।

'কিন্তু যতবার চেষ্টা করলাম মনে হল যেন সব পথচারীরা আমার সংকল্প বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্র করে মুহূর্তের জন্য আমাকে একলা হতে দিল না।

'কিছুদিন পর বুঝবার ও ভাববার শক্তি আর একটু পরিষ্কার হলে জ্ঞান হল যে আমার মত দক্ষ সাঁতারুর পক্ষে সকলের অলক্ষ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ মিললেও একেবারে ডুবে মরা সম্ভব হবে কি না বেশ সন্দেহ আছে।

'বিয়োগে হৃদয়ে প্রজ্জলিত অগ্নিশিখাগুলিকে একে একে নির্বাপিত করে সময়। রয়ে যায় অঙ্গারে আবৃত ক্ষতের খানিকটা যার বেদনার ধার থেকে তীক্ষ্নতা চলে গিয়েছে।

'ভাবলাম, কনভেণ্টে নান্ হয়ে ছারখার হয়ে যাওয়া জীবনটাকে ভগবানের পায়ে অর্পণ করে দেব।

'গীর্জায় মনোবেদনা নিবেদন করে শান্তি পাবার আশায় যে পুরো-হিতের শরণ নিলাম তিনি আমার মনোকষ্টের বেদনার লাঘবে সান্ত্বনা না দিয়ে কন্‌ফেশন্-এ বার বার জানতে চাইলেন আমাদের বাস্তব প্রণয় জীবনে কতবার দৈহিক মিলন ঘটেছিল তার সঠিক সংখ্যাকে।

'বুঝলাম, নিজেকে এমন করে ঠকিয়ে হারাবার চেষ্টা না করে

গ্যাব্রিয়েল্-এর স্মৃতির ছড়ানো টুকরোগুলি কুড়িয়ে একত্রিত করে যদি তার স্বরূপকে খানিকটা ফিরে পেতে পারি তা দিয়ে হয়ত বাকী জীবনটাকে কোনমতে বরদাস্ত করতে পারব।

'সে ছবি আঁকত মূর্তি গড়ত তাই তার কাজের আনন্দের আস্বাদ পেতে গিয়েছি আতলিয়েতে। মনের মানুষ সজীব কাছে থাকলে তার স্থূল উপস্থিতি, দৃষ্টি আর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দেখতে দেয় না তার বাহ্য রূপকে। গ্যাব্রিয়েলকে কাছে পেয়ে তার অঙ্গের প্রতিটি কণাকে অনুভব করেছি কিন্তু সে চেহারার সম্পূর্ণ আদলকে চোখ দেখতে যেন ভুলে গিয়েছিল। তার কণ্ঠস্বরে আনন্দের রোমাঞ্চে উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং তারই আবেগ শুনতে দেয় নি তার বক্তব্যের সবটুকু। বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে পড়া অশরীরী গ্যাব্রিয়েল্-এর চেহারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবার আগ্রহে আমার চোখ দুটি ডুবুরীর মত অতীত স্মৃতির ঘোলাজল কত হাতড়াতে লাগল।

'আধশোনা তার কত কথা মনের আঙিনায় সম্পূর্ণ হয়ে আসবার জন্যে ভিড় করতে লাগল। তারই দু'একটা যেন তার কণ্ঠস্বরকে জীবিত করে বেজে উঠত আমার কানে মাঝে মাঝে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে তার সত্ত্বা চিরতরে আমার সান্নিধ্যের বন্ধন ছেড়ে চলে যাই নি।

একদিন মনে পড়ল গ্যাব্রিয়েল্ বলেছিল তার এক সংস্করণ নাকি লুভ্র্-এ আছে।

'তখুনি ছুটলাম সেখানে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক দেখতে লাগলাম শত শত দর্শকদের আসা যাওয়া কিন্তু তার মধ্যে হারান গ্যাব্রিয়েল্‌কে ফিরে পাওয়া গেল না। ভাবলাম যে একবার দুবারের জন্যে যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের মধ্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব বরং যাঁরা নিত্য এখানে আসেন বহুকাল ধরে, তাঁদের মধ্যে সন্ধান করা উচিত।

'লুভ্র্-এর প্রত্যেক কর্মচারীদের এক এক করে দেখে নিলাম

এমন কি ঝাড়ুদারকে পর্যন্ত। কিন্তু তবু তার সন্ধান মিলল না। তখন তন্নতন্ন করে দেখলাম লুভ্র-এর সব ছবিগুলি, যদি তার একটির মধ্যে রয়ে গিয়ে থাকে তার চেহারার একটা ছাপ। অকৃতকার্য হয়ে মন নৈরাশ্যে ভরে গেল। করলাম চেষ্টা ভাস্কর্যের সব মূর্তিগুলির মধ্যে যদি সে কোথাও লুকিয়ে থাকে।

'সব আশা ছেড়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে একদিন যাচ্ছিলাম গ্রীক গ্যালারী দিয়ে। জানলা দিয়ে এক কোণে বেশ রোদ পড়েছিল। শীতে জমা হাত দুটোকে তাপে একটু সেঁকে নেবার উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছতেই দেখি গ্যাব্রিয়েল্-এর মুখখানি আমার দিকে সারা নয়ন মেলে চেয়ে আছে। শুনলাম যেন সে বলছে "কি মার্থ, কেমন আছ?"

'কেবল মুখখানি দেখা গেলেও আস্তে আস্তে সে যেন তার সবখানি নিয়ে এল আমার সামনে।

'যবে থেকে তাকে ফিরে পেয়েছি আমাদের কত অসমাপ্ত কথাকে বলে পুরো করে নিয়েছি। কিন্তু সে যেন একটু বদলে গিয়েছে। কোনদিন সে নিজে হেসে আমাকে হাসিয়ে আনন্দের হুল্লোড় তোলে আবার কোনদিন অভিমান করে নীরব থেকে পাষাণ হয়ে আমাকে কাঁদিয়ে আকুল করে। তাই তুমি আমাকে কখনও কাঁদতে বা হাসতে দেখেছ।'

দেখতে দেখতে কখনও শুকনো কখনও ভেজা অটাম্ এর দিনগুলি ছোট হতে হতে শীতের আগমন বার্তা জানিয়ে দিল। সব পাতা ঝরে বুলভার ও নদীর পাশের গাছগুলি কঙ্কালসার হয়ে ঠাণ্ডায় যেন ঠক্ ঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করল। বৃষ্টির বদলে ঝরতে থাকে সাদা পালকের মত তুষারের কণারাশি এবং ক্ষণকালের মধ্যে সারা দৃশ্যকে শবাচ্ছাদনের সাদা কাপড়ে ঢেকে মৃতের মত করে দেয় চারিদিক নিস্তব্ধ ও নীরব।

বেশ কয়েক সপ্তাহ কাজের চাপে মার্থ-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা

সম্ভব হয় নি। একদিন শীতে জড়ান আলসেমিতে লেপ ছেড়ে উঠব কিনা তার বাজি কসছি এমন সময় দরজায় পড়ল কার করাঘাত।

দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি মার্থ দাঁড়িয়ে।

সে আগে কখনও হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি। ভাবলাম কোন নতুন বিপদ বা হেঁয়ালির তাড়নায় সে এসেছে এত ভোরে আলোচনা করতে।

সে শুধু বললে, 'এসেছি বিদায় নিতে। যদি চাও তো এইখানে সেটা সেরে ফেলে চলে যাব আর যদি স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে রাজি হও তো তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।'

আমাকে সে কোন প্রশ্ন করতে দিল না। পথে শুনলাম গ্যাব্রিয়েল্‌-এর সঙ্গে তার নাকি কয়েকদিন ধরে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তাই তাকে অনুপস্থিতির সাজা দিতে সে চলেছে হল্যাণ্ড-এ।

সে জানাল কয়েক মাস তাকে না দেখতে পেলে গ্যাব্রিয়েল্‌ এর অহঙ্কারটা বেশ কিছু কমে যাবে।'

এর পর আমি আর কোন উত্তর দেবার চেষ্টা করি নি। মনে মনে বিচার করার চেষ্টা করছিলাম আমাদের মধ্যে কে পাগল।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজাতে সে কামরায় উঠে বললে, 'তোমায় আমি কোন ঠিকানা দেব না, কারণ অনুপস্থিতিতে বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চিঠি লেখার ভানে আমি বিশ্বাস করি না।

'প্রথম মাসে হয়ত ঘন ঘন চিঠিপত্রের আদান প্রদান হবে তারপর চিঠি দিতে ভুলে গিয়ে কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে যাবে এ অভ্যাস, শেষে সে কর্তব্য ভুলতে ভুলতে একদিন চিঠি লেখায় অবহেলা, অনিচ্ছুক অপরাধ হয়ে দাঁড়াবে এবং এই অপরাধকে চাপা দেবার সমর্থনে পত্রের স্রোত একেবারে শুকিয়ে যাবে।

'কি হবে বন্ধু এসব বৃথা ছলনায়।

'আমাদের মনের খাতায় জমা থাক তোমার আর আমার স্বল্প দিনের সান্নিধ্য। গ্যাব্রিয়েল্‌-এর মত তো আমার কোন দ্বিতীয় সংস্করণ নেই

আর থাকলেও বা তা হয়ত তোমার কাছে আমার আদলের প্রাণহীন এক ছবি বা মূর্তি ছাড়া আর বেশী কিছু হবে না।

'গ্যাব্রিয়েলকে দেখো মাঝে মাঝে যদি সময় পাও এবং যদি মনে করো যে আমার বিচ্ছেদের ব্যথায় সে পীড়িত তা হলে তাকে জানিয়ে দিয়ো যে সে ব্যথার বেশীটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

রুমাল উড়িয়ে বা হাত দুলিয়ে বিদায়কে দীর্ঘ করবার কোন প্রয়োজন ছিল না।

সর্পিল গতিতে ট্রেন প্লাটফরম্ অতিক্রান্ত হয়ে সকালের ঝাপসা আলোয় খানিকক্ষণ চোখের সামনে রেখে দিল তার পশ্চাতের গাঢ় ধোঁয়া রঙের স্বল্প পরিসরটুকু। সেটুকুও ক্রমে মিলিয়ে রয়ে গেল কেবল একটা ছোট্ট লাল আলোর বিন্দু এবং কয়েক মুহূর্ত পরে তাকে একটা কুয়াশার পর্দা মুছে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিল।

